রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

উত্তর-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন—ষষ্ঠ অধিবেশন

সভাপতির অভিভাষণ।

প্রাচীন ঋষিরাও সভা-সমিতিকে প্রজাপতি-দুহিতা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এই সভা তাঁহাদিগের স্তুতি চ্ছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যদিচ আমি তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি, তবে আজ পরিষদের অনুগ্রহে সভাপতি পদে বৃত হইয়াছি বলিয়া, সেই দ্যুতিমতী ভাষায় আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে।

"সভা চ সমিতিশ্চ অবতাম্ প্রজাপতে দুহিতরৌ সম্বিদানে।
যেনা সংগচ্ছে উপমা স শিক্ষাং চারুবদানি পিতর সঙ্গতেষু॥
বিদ্মাতে সভানাম্ নরিষ্টা নামবৈ অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে তে মে সন্ত সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসীনাং বর্চ্চো বিজ্ঞানমাদদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামইন্দ্র ভগিনং কৃনু॥
যদ্বো মনাঃ পরাগতং যদবদ্ধং ইহ বেহবা।
তদাবর্ত্তয়ামাস ময়ি বো রমতাং মনঃ॥"

এই সভা আমার উপর সুপ্রসন্ন হউন। আমি যেন উপস্থিত পিতৃদিগের আশীর্ব্বাদে উপস্থিত সভাস্থলে চারুবাদী হইতে পারি।

এই সভার অর্থ, আমি জ্ঞাত আছি, ইহার অন্যতর নাম অক্ষুণ্ণা।

সভাসদেরা যেন আমার সহবাচী হয়েন।

আমি যেন তাঁহাদিগের তেজ ও জ্ঞানের গৌরব প্রাপ্ত হই।

এই সংসর্গের সৌভাগ্য আমি যেন লাভ করিতে পারি।

যদি এই সভায় কাহারও মন পরাগত হইয়া থাকে, কিংবা ইতস্ততঃ আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবর্ত্তিত হইয়া আমার মনেতে অনুরক্ত হয়।

যে দেবভাষায় আপনাদিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমার অধিকার নাই, স্বীকার করি। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ভাষা, আদি-কবিদিগের হৃদয়ের ভাষা, সকলের তাহাতে অধিকার নাই। অধিকার সত্বেও আমরা অধিকার-ভ্রষ্ট। পূর্ব্বের অধিকার কিসে যে রক্ষা করিয়াছি,

তাহা জানি না। নিজের ভিটা ছাড়িয়া, আবর্জ্জনাস্তূপের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছি। উচ্ছৃঙ্খল জীবন অবলম্বন করিয়াছি। ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, সমাজের বন্ধন অবজ্ঞা করি, প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ে অনার্য্যভাব জিহ্বাগ্রে অনার্য্যভাষা। গ্রামে গৃহস্থ নাই, দেবমন্দিরে জাগ্রত দেবতা নাই; নিজের ঘর ছাড়িয়া, পরের দ্বারে উপযাচক আমরা। আমাদের কিসের অধিকার আছে? নির্ম্মল হৃদয় নির্ব্বাক্, অথচ আমরা বহুবাচী, অতএব সত্যের প্রতি লক্ষ্যশূন্য। নির্ভীক আত্মা হিরণ্যবর্ম্মিনী, পঙ্কিল পদে সে পথে চলা যায় না। অথচ "মুস্কিল আশান" সাজিয়া, পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বেড়াইতেছি। যদি তাহাতেই কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। শূন্য হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে শিখিয়াছি। ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি। সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে, আমরা পরাঙ্মুখ হইয়া আছি।

হে ইন্দ্র আমাদিগকে জ্ঞান দাও, পিতা যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান করে। এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন সূর্য্যকে দেখিতে পাই। হে পুরুহূত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

"ইদং ধাতুং ন আভর পিতা পুত্রভ্যো যথা।
শিক্ষা নো অস্মিন্ পুরুহূতয়ামনি, জীবা জ্যোতিরসীমহি॥"

যদি আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম, ঈশ্বরও আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন।

সচন্দ্র জ্যোতিঃ-প্রকাশিতনেত্রা উষা আকাশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন। দীপ্তিমতী আলোক বিকাশিতাঙ্গী দেবী উষা প্রত্যহ সেই দ্বারে দণ্ডায়মানা; আমরা নিদ্রাতুর, কখনও তাঁহাকে দেখি না। এই বিচিত্রা বিস্তীর্ণা দেবীকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্তুতি দেবলোকে গ্রাহ্য হইত। আমরাও বিনীতভাবে আজ স্তুতি করিতেছি। আমাদের আঁধার হৃদয়ে আলোক আনিয়া দাও, প্রাণে বল আনিয়া দাও। অনাবৃত আকাশের নীচে, স্বাধীনচেতা কবি গুরু ছিলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা আমরা তাঁহাদিগের মত মনের সাহস আমাদিগের হইবে কিসে?

তাঁহাদিগের এক একটি শব্দ, এক একখানি আলেখ্য।

উষা জ্বলন্ত বলিয়া "ভাস্বতী", আলোকের উৎস বলিয়া "ওদতী", অন্যকে আলোকিত করেন বলিয়া "দ্যোতনা", রক্তিম বলিয়া "অরুষী", শ্রেষ্ঠ বলিয়া "মঘোনী", শুদ্ধ বলিয়া "ঋতাবরী", জাজ্বল্যমান বলিয়া "বিভাবরী" যাহা আমাদের ভাষায় আজকাল রাত্রি, সঞ্চারিণী বলিয়া "সূনৃতা"।

দেবতা কি, না বুঝিলে তাঁহার উপযুক্ত নাম ধরিয়া ডাকিতে পারি না। বৈদিক কবি উষাকে অনাবৃতা-বক্ষা নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। 'যে কণ্ঠে তাঁহাকে মঘোনী ও ঋতাবরী সম্বোধন করিয়াছেন, সেই কণ্ঠে, দেবী তুমি কন্যার ন্যায় শরীর বিকাশ করিয়া, দীপ্তিমান্ সূর্য্যের নিকট গমন কর; যুবতীর ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তি-বিশিষ্টা হইয়া, হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

মনে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেরূপ অবতারণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তাঁহাকে কখনও বালিকা, কখনও জরামৃতা, কখনও সূর্য্য-পত্নী, কখনও বা সূর্য্য-জনয়িত্রী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নির্ভীক কবি সহস্র ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন—দ্বিধাশূন্যা, সংশয়শূন্যা, অপরের অবলম্বনরহিত। বীর্য্যশালী মহাপুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, তোমার আমার সে চেষ্টায় পাপ স্পর্শে। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহারা কি বলিতেছেন শুন:—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাম॥"

R. V. 10, 129.

Nor aught no'naught existed; You bright sky was not, no heaven broad woof out streched above, what covered all? what sheltered? what concealed?

Was it the waters' fathomless abyss?

Ther was not death—There was naught immortal.

Maxmuller, p. 290.

দাম্ভিক কবি গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন—

আমরা সতবাদী—মিথ্যা কহিনা।

নূনমৃতা বদংতো অনৃতং রপেম।

R. V. 10, 10, 4.

এই সত্যের তেজোবলেই তাঁহাদিগের কাব্য তেজোময়। আমাদিগের হৃদয়ে যে দিন এইরূপ বল আসিবে, আমাদিগের কবিতাও ওজস্বিনী হইবে। সাহিত্যের মূলে সত্য ও সাহস চাই। এ বল আসিবে কিসে? ধর্ম্মের পথ অবলম্বন না করিলে, সামাজিক গ্রন্থি দৃঢ় না হইলে, অসত্য উপেক্ষী না হইলে, এ শক্তির কখনও সঞ্চার হইবে না। আপনার পারিচর্য্যে আপনাহারা হইয়া চিরদিন রহিতে হইবে। একদিন ঘরের দিকে চোখ পড়িয়াছিল, অবসন্ন আত্মা গৃহ-দেবতাকে জাগ্রত দেখিতে পাইয়াছিল, নূতন আলোকে আপনার হৃদয় দেখিতে পাইয়াছিলাম, বহু দিনের কথা নহে, কিন্তু আলোক স্তিমিতপ্রায়, সে অঙ্কুর বিকাশের পূর্ব্বেই তাহা যেন শুকাইয়া গেল, দেবতা শিলাখণ্ডে পরিণত হইল, দৃষ্টি আবার বাহিরের জঞ্জালের উপর নিক্ষিপ্ত হইল—ভাগ্যের দোষ দেই না, বালকত্ব না ঘুচিতেই আমরা পিতা, শিক্ষা সম্পূর্ণ না থাকিতেই আমরা শিক্ষক, মাত্রা শুদ্ধ না হইতেই আমরা লেখক। সাধ্যাতীতের সাধনা অপচয় মাত্র, তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়ত্তাধীন, তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকার যতই আমরা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িব। জাতীয়তার অবতারণা রাজসূয় যজ্ঞ, সহজে সে যজ্ঞের

অধিকারী হওয়া যায় না। শুদ্ধ, সংযমী, প্রশান্তচেতা হওয়া চাই। আমার হৃদয় আমারই রাজ্য অনুভব করা চাই, আমি আছি না বুঝিলে, আপনার কি অপরের চিনিয়া লইবে কি প্রকারে? আদর্শভ্রষ্ট আমরা পণ্যস্ত্রী বারবনিতার অঞ্চল ধরিয়া মার অনুসন্ধানে চলিয়াছিলাম। প্রথমে আপনার ঘরের ভিতর আপনার স্থান কর, পরে পৃথিবীর কোন্ খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিবে, বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ তখন উপলব্ধি হইবে। ঋত্বিকেরাই আহুতি দিতে সক্ষম; আহুতি-ভেদে দেব কি দানব, যজ্ঞক্ষেত্র অধিকার করে।

আদিকবিই আর্য্যাবর্ত্তে আদি পুরোহিত, গুরু, শিক্ষক ছিলেন, সে স্থান আজ কে অধিকার করিতে পারে? আমরা নিজের খেয়ালে, আপন আপন ধর্ম্ম গড়িয়া লইতে শিখিয়াছি। কখনও বা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, কিংবা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমরা বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শিখিয়াছি, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ মাপ জোক করিতে পারি, জগৎকারণ অপরিমেয় বলিয়া তাঁহার ধ্যান করা নিষ্ফল মনে করি। আমরা দেবতার ধার ধারি না, দেবালয়ের পাশ দিয়া চলি না—আমরা কি বলের উপর নির্ভর করিয়া অপরকে বল দান করিতে পারি। তুমি আপনি অবলম্বন রহিত? কি ভরসায় তোমায় অবলম্বন করিব? তাই বলি চিত্ত শুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর, নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লও। ঘরের আঁধার অনুভব করা সহজ, কিন্তু অবারিত দ্বারে না দাঁড়াইলে জগতের বিস্তীর্ণ আলোক দেখা যায় না। তাই বলি হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত কর। বিশ্বের প্রাণের ভিতর স্থান না পাইলে বায়ু-বিতাড়িত বাষ্পের ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। সমাজে প্রাণ নাই, বিশ্বের প্রাণ অনুসন্ধান নিষ্ফল।

স্বাধীনচেতারই হস্তে লেখনী জ্বালামুখী হয়। দেবীতমা সরস্বতী সূর্য্যালোকাবৃতা। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ভিন্ন স্থূল দৃষ্টিগোচর নহেন। এই দৃষ্টি সাধনায় মেলে। যখন বলিতে পারিবে, My mind to me a Kingdom is, তখন সে রাজ্যে দেবীতমার পূর্ণোপচারে পূজা সম্ভব। মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া যায় না। দেবীর পূজা সোলার ফুল দিয়া হয় না। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানবহৃদয়ের সাহস। ধর্ম্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। সমাজে লুকোচুরি করিতে করিতে মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে যাহা, কাজে তাহা যে জাতি করিতে অশক্ত, কোন্ আশা তাহার ফলবতী হইবে? বক্তা বাঙ্গালী বাহিরে বীর, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই মার্জ্জার হইয়া পড়েন। ধর্ম্মাচার্য্য বাঙ্গালী আপনার গৃহমধ্যে অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হ'ন না, পরের কোষ্ঠি কাটিতে অনুমাত্র সঙ্কোচ করে না। কাণাকাণি করিয়া গালাগালি দিতে ছাড়ি না, সকলেই প্রায় অনাচারী, কিন্তু সকলেই আচারের গণ্ডীর ভিতর আছি বলিয়া বুঝাইতে চাই। মিথ্যার হাটে মূর্ত্তি কেনা-বেচা চলিতে পারে, দেবী পাওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি, Beranger, Napoleonএর সমসাময়িক ছিলেন। Napoleonএর পতনের পর ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছিল। Beranger সাহিত্য-

সমাজের কাছে এই বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন, "আর লিখিব না বলিতে পারি না, কিন্তু লেখা প্রকাশ করিব না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু আর দেখিতে চাহি না। জীবনের শেষ সন্ধ্যাতে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা নাই। সময় আসিয়াছে, মনে হইলে অকাতরে ধরাশায়ী হইয়া চিরনিদ্রা লাভ করিব। প্রাণের কথা লইয়া হাটের মধ্যে দাঁড়াইতে পারি না, সে কথা যদি বেচা-কেনা চলে চলুক—ঘরে যে ক্ষুদ কুঁড়া আছে, তাহাতেই আমার চলিবে। আতুরের পায়ের ধূলি চক্ষুতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা নাই—আমি বিদায় লইলাম, সহজেই সে স্থান আপনারা পূরাইয়া লইতে পারিবেন।" অনেকেই এ কথার সত্যতা বোধ হয় অনুভব করেন, আমিও করিলাম বলিয়া আমাকে মাপ করিবেন। কারণ আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলি, আমি সত্য যাহা ভাবি, তাহাই বলিতেছি। হাটের মধ্যে বাস করিবার অনিচ্ছা সত্বেও বাস করিতে বাধ্য মনে করি। হাটে বারওয়ারি হইতে পারে, উহা পূজার স্থান নহে।

কথা সত্য, তাহার অন্যতর প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা নাটক সাধারণতঃ বলিতে গেলে নাট্য-জগতে উচ্চ স্থান পায় নাই। আমাদিগের সামাজিক অবস্থায় পাইতে পারে না। পৃথিবীর কোন স্থানে পারে নাই। নাটক সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। জাতীয় ধীশক্তির প্রধান পরিচয় নাটকেই পাওয়া যায়। অন্য কবিতা কবির মানস-জাত, গাথা নিজের প্রাণের গান, মহাকাব্য পৌরাণিক ইতিহাসের অবতারণা—যাহারা আর জগতে নাই, কল্পনার সাহায্যে তাহা সাজাইয়া ল'ন, কঙ্কালে পুনর্জ্জীবন দেন। তাঁহারা রচনার মধ্যে দেবদেবী মানব যেখানে উপযুক্ত মনে করেন, সেইখানে বসাইয়া ল'ন। কিন্তু যথার্থ নাটকে সামাজিক চিত্র যাহা আছে, কবি তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। যাহা প্রত্যহ দেখি, তাহার ভিতরে প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণী সকল কি সূত্রে গ্রথিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে কোথায় তাহার ছেদ হইয়াছে তাহাই আবিষ্কার করা—তাহাই সেই সমাজের লোকের যাহাতে উপলব্ধি হয়, সে শিক্ষা নাটক হইতে হয়।

যোগ-বিয়োগ শুদ্ধমাত্র গণিতের ভাষা নহে, মানব-হৃদয়ের ভাষা। এক এক জনের আশা মনোভাব লইয়া সমাজ সৃষ্ট নহে—অথচ মানুষের নিজত্ব যতদিন আছে, আমার হৃদয়ের আশা আমারই, আমার স্নেহ মমতা আমারই, কিন্তু সমাজের শৃঙ্খলা কোথায় তাহা অবরোধ করিয়াছে—কোথায় তাহার বিস্তৃতি সাধনা করিতেছে, কোথায় তাহা বিশ্বজগতের প্রাণের ভিতর আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই যথার্থ নাটকে প্রতিভাত। সুন্দর, কুৎসিত, সত্য, মিথ্যা, অনুরাগ, বিরাগ সকলেরই স্থান আছে। নাটক মানব-সমাজের প্রতিরূপ মনুষ্য-হৃদয়ের জ্বলন্ত, জীবন্ত আখ্যান—পয়ারে তাহারে আবদ্ধ করা কঠিন, গদ্যে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় না; তাহার ভাষা, তাহার ছন্দ কবিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তাহা নিয়মবদ্ধ করা যায় না। বহির্জ্জগৎ কিম্বা অন্তর্জ্জগৎ বিশ্লেষণ করা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়।

সম্ভাবিতের বিস্তৃতি আর সুদূর আশাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, অর্থাৎ অসম্ভাবিতকে সম্ভবপর করার সাধনা, বিরাগ হইতে নূতন-রাগের মূর্তি অবতারণা করা, অকল্পিতকে কল্পনার আয়ত্ত মধ্যে আনা, সকল প্রকার কাব্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই আশা, সেই রাগ, সে আদর্শ সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত করা নাটকের শিক্ষা। নাটকেই কবি শিক্ষক।

ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস দেখ, এই কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে। এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ড চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করে। সে সময় ইংলণ্ডে নূতন প্রাণ আসিয়াছিল, নূতন আশা নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী জগতের রাজ্য অধিকার-প্রয়াসী হইয়াছিল। সেই সময়ে ইংরাজী ভাষাতেও নূতন তেজের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক সময় আমাদের দেশে বাঙ্গালা লেখা পড়ার অনাদর ছিল, ইংলণ্ডেও এই সময়ের পূর্ব্বে ঠিক তাহাই হয়। লাটিন এবং গ্রীকের চর্চ্চা ভিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা লজ্জাকর মনে করিতেন। আমাদিগের পণ্ডিতেরাও সংস্কৃত ভাষা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার অনাদর বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; আর আমাদের ইংরাজী-ভাষামুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করা, অনেক দিন ধরিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন। Rogen Ascham ইংরাজী ভাষায় বই লিখিবার সময় এইরূপ ভূমিকা করিয়াছিলেন "a though to have written this book either in Latin or Greek had been more easier and fit for my trade in study, yet I have written this English matter in English tongue for Englishmen" তাহার পর কিছুকাল ধরিয়া লেখকেরা লাটিন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এক অদ্ভুত রচনা-রীতি সৃজন করেন যথন I trust the learned poets will give me leave and vouchsafe my book passage as being for the rudeness thereof no prejudice to their noble studies but even (as my intent is) an instax cotes to stir up some other of mutability to listen travail in this matter. আমাদের দেশেও তাহা ঘটিয়াছিল, 'নবজলধরপটলসংযোগে' প্রভৃতি সমাসের ও অনুপ্রাসের বেড়ায় বাঙ্গলা ভাষা সোণার হাতকাড় ও বেড়ী পাড়িয়াছিল। পুস্তকের নাম 'Hecatompathia' ও 'প্রত্নকম্রতত্ত্বনন্দিনী' প্রায় এক জাতীয়। তখন ইংরাজী ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন জ্ঞান জন্মায় নাই, more easier প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমরাও তাই করিয়াছি, বাঙ্গলায় ব্যাকরণ নাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা বলা হইয়াছে। 'রাজা' সতী অসতী, 'শনি' ভানুতনুজা প্রভৃতি অনেক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ করিতে করিতে সহজ সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা জন্মিতে থাকে। ল্যাটিন দেবদেবী ছাড়িয়া, সাদাসিধা মানুষের জীবনের উপর ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। morality plays, Interludes, Senecan Tragedies, Chronicle Plays একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শূন্যপুরাণ, মাণিকচাঁদের গান, রামযাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি রচনা আমাদের মধ্যে আজকাল নাই। নিজের ঘরের ছেলে মেয়ের উপর যখন চোক পড়ে, তখন নিজের শক্তির তেজও অনুভূত হয়।

সেই সময় ইংলণ্ডে জাতীয় জীবন উদ্ভাসিত হয়। এই সময়ের কাব্য নাটক অদ্ভুত বীর্য্যশালী, তাহার প্রত্যেক ছত্রে নবজাত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়! ভাষার প্রতিভা নূতন ছন্দে আবিষ্কৃত হয়। Sackville ও Shirleyর মধ্যবিৎ সময়ে এই বলের উদ্ভাস প্রত্যক্ষ হয়। দেখিতে দেখিতে সেক্সপীয়র সাহিত্য জগতে সূর্য্যের মত উদিত হইলেন। এই নাটক-গুলি পড়িয়া দেখিলে অনেক কুৎসিত কথা, কুশ্রীভাব দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কুৎসিত কথা মানুষের মুখে আছে, কুৎসিত ভাব মানবের মনে আছে। পাপ অপ্রচ্ছন্ন ভাবে সমাজে আছে, পুণ্যই অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে। পাপ-পুণ্যে মানুষের হৃদয়, পাপপুণ্যে আমাদের জগৎ, অপাপবিদ্ধ জগৎ মানুষের নহে, দেবতার। এ জগতে ঈশ্বরের স্বরূপ রাহুগ্রস্ত, আমরাই ; তাহার সম্যক্ উপলব্ধি এ জগতে সম্ভবপর নহে।

সত্য যদিচ বলের কারণ, তাহাতে অহং এর অধিকার নাই, তাহা সার্ব্বজনীন। সত্য যেমন মানব-আত্মার ভাষা, মিথ্যা তেমনি মানব-হৃদয়ের দরদ-দিয়া-মাখা—এই সত্য-মিথ্যা জড়িত মানব সমাজের চিত্র নাটকে প্রতিফলিত। সব সময়ে জীবনে মিথ্যা পরাজিত হয় না। Renan এক স্থানে বলিয়াছেন, জগদীশ্বর তোমার রহস্য বুঝিতে পারি না, তুমি যে আমাদের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখ, সেটা আমাদের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ! সত্য যদি সর্ব্বত্র বিকাশিত হইত, তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকিত না।

যথা ইচ্ছা মন যায়, পৃথিবীতে মানব যথা ইচ্ছা বিচরণ করে। নাটক এই যথেচ্ছাচারী মানব-সমাজের অন্তর্নিহিত, রহস্য উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সেক্সপীয়রের পূর্ব্বে যেমন জন-কতক ইংরাজ কবি তাঁহার জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাঁহার পরেও জনকতক কবি, সে স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যত দিন ইংলণ্ডে সেই নব জীবনের স্রোত বহিয়াছিল, ততদিন ধরিয়া ইংরাজী নাটকের প্রতিপত্তি ছিল। যে সময় হইতে সে আবেগ মন্দীভূত হইল, সেই সময় হইতে ইংরাজী নাটকের গৌরবহ্রাস হইয়াছে। বড় গাছে যেমন পরগাছা আশ্রয় করে, সেইরূপ তাঁহাদিগের আধুনিক নাটক পরগাছা স্বরূপ। নাট্যশালায় তাঁহারা ফরাসী নাটক অনুবাদ করিয়া চালাইতেছেন। বিলাতের জীবনের বৈচিত্র্য গিয়াছে, উৎসাহ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল বহুদেশের সংসর্গে তাহাদের সহিত মিলিয়া চলিতে হইতেছে। যাহা আছে, তাহা বজায় রাখিতে যত্নবান্ হইতে হইয়াছে। সমাজের প্রাণী আর এক ছাঁচে ঢালা। মানসিক তেজ বহু ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া ঘরে কোঁদল বাঁধিয়াছে। গৃহের ভিতর কচ্‌কচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত - নাটক লিখিবার অবসর কোথায় ? যেমন ইংরাজী-সাহিত্যে নাটকের উদ্ভাসের কথা বলিলাম, ফরাসী দেশেও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। ফ্রান্সের চারিদিকে অন্য অন্য দেশ, কাজেই তাহাকে নিজের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। যখন রোমান্ সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যায়, ফরাসী ভাষার তখন জন্ম– ল্যাটিন ভাষা হইতেই তাহার উৎপত্তি। রোমান-দিগের পূর্ব্বের কেল্‌টদিগের প্রভাবের ছায়া তাহাতে পড়ে নাই। Conquering Frankরাও সেই ভাষার

মধ্যে নূতন ভাষা চালাইতে পারে নাই। ক্রমে এই ভাষার তেজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে Civil war গৃহবিচ্ছেদের দরুণ ফ্রান্সের সাহিত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের শেষভাগে বিশৃঙ্খল ফরাসী সমাজের নূতন ভাবের আভাস পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্খল সমাজে এক মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই কবি দস্যু ছিলেন, বহু দিন ধরিয়া কারাবদ্ধ ছিলেন, একবার তাঁহার উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া কোন রূপে পরিত্রাণ পান, কিন্তু এই অসাধারণ পুরুষ, অসাধারণ কাব্যশক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম Villon, সেই সময় হইতে Ronsard পর্য্যন্ত দিন দিন ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় Byzantine রাজত্ব ধ্বংস হয় এবং নূতনতেজ ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ইংলণ্ডে উদ্ভূত হয়। ফ্রান্সে এই সময় Ronsard বলিয়া একজন মহাকবির অভ্যুত্থান হয় এবং নাট্যজগতে Corneille. Racine পরে Moliere এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে Voltaire এক এক যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সের ইতিহাস এক মহাকাব্য—ফ্রান্সের সাহিত্য তাহারই পথবর্ত্তী, ফ্রান্সে কবি, শিক্ষক চিরদিনই সমাদৃত। Plieads দিগের সময় হইতেই ফরাসী দেশে সাহিত্যের একটি বিশেষ সমাজ সৃষ্টি হয়। সে সমাজে রাজা প্রজা ছিল না, গুরু শিষ্য ছিল না, ধনী নির্ধন ছিল না। সকলেরই সেই সমাজে সমান অধিকার। ফ্রান্স যেমন দিন দিন প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে, তাহার সাহিত্য সমাজ দিন দিন নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। French Revolution এর সময় দেখ, জাতীয় তেজের কি আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাইবে। এই সময়ের একটি চিত্র আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই।

ফরাসী-সমাজে যেমন এক সময়ে অভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের মধ্যে একটি ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সাহিত্য বিশেষ কাব্যের ভাষাতেও সেইরূপ Noble এবং Base, মহৎ ও নীচ জাতীয় কথার ভাগ হইয়াছিল। যাহা সাধারণের ভাষা তাহা নীচ বলিয়া অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহার্য্য ছিল। নীচের ভাষা নীচ ভাবে কলুষিত মনে করা হইত। গাছ বলা অসঙ্গত বিটপী কিংবা পাদপ না বলিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইত। Racine তাঁহার একখানি নাটকে Chien কুক্কুর কথাটি ব্যবহার করেন, তাহা লইয়া কতই না আন্দোলন চলিয়াছিল। Moncheir রুমাল কথা এক স্থানে ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া, নাট্যশালায় খুনোখুনি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ চলিত কথা ব্যবহার করিতে কাতর হ'ন। কথার মধ্যেও আমরা ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ন্যায় জাতিভেদ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে জাতিতে বড় ছোটর মধ্যে ভেদ অবহেলে উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাতির কবিই বা কতদিন ধরিয়া কথার জাতিভেদ সহ্য করিতে পারে? এই বিষয় লইয়া সাহিত্য-জগৎ Victor Hugoর কিছু পূর্ব্ব হইতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদল লেখক Romantic School নামে পরিজ্ঞাত সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের Classic school এর সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়াগেল। যাঁহারা

আধুনিক তাঁহাদের বয়স কম, সাহস অধিক, তাঁহারা উন্মাদের মত এই বিবাদে যোগ দিলেন। এমন কি অনেকে নিজের পারিবারিক নাম পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলেন। তাহার স্থানে Dick, Tom, Harry যাহা মনে আসিল, তাহাই ডাকনাম করিয়া লইলেন। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাহাই হইল। তাঁহারা শুদ্ধমাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী ভদ্রসমাজের কালো Hat, Coat ছাড়িয়া— বিবিধ রকমের কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ লম্বা চুল রাখিলেন, কেহ মাথা মুড়াইয়া লইলেন, পারিসের রাস্তায় যেখানে সেখানে এই অদ্ভুত বেশধারী, অভিনবের দল দেখা যাইতে লাগিল। ইহার প্রায় সকলেই সাহিত্য-সেবক, অপর দলের মধ্যে কতিপয় যুবক, Jupiter, Neptune, Mars প্রভৃতি দেবতাদিগের সাজে সজ্জিত হইয়া পথে চলিতে লাগিলেন। দুই দলে কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইলে লাঠালাঠিতে পরিণত হইত। এই সময় Victor Hugo র কাব্যের অভ্যুদয় হয়। সময় থাকিলে তাহার প্রথম নাটক Cromwell এর উপক্রমণিকা পড়িয়া শুনাইতাম। Theophile Gautier এই উপক্রমণিকাকে সাহিত্যে Mount Sinai এর Ten Commandments বলিয়া গিয়াছেন।

Cromwell লইয়া অনেক বাদ-বিসংবাদ চলিল। তাহার পরেই তিনি Hernani বলিয়া নাটকখানি লেখেন। ফরাসী সাহিত্য-সমাজে, 25th Feb. 1830, যে দিন Hernani অভিনীত হয়, 14th July এর মত তাহা পূজার দিন বলিয়া গণ্য। Hernani পৌরাণিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফ্রান্সের কাব্য-জগতকে নূতন আলোকে আলোকিত করিলেন। পুরাতন ছন্দের নিয়ম অনায়াসে ওলট-পালট করিয়া নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম অভিনয়ের দিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সহস্রাধিক সেবকের দল রঙ্গালয় দখল করিয়া লইলেন। পৌরাণিকদলও স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে ছাড়িলেন না। অদ্ভুত বেশধারী শত শত যুবকবৃন্দ সারাদিনের খাদ্য দ্রব্য লইয়া রঙ্গালয়ে সারাদিন যাপন করিবার যোগাড় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দাঙ্গা হইবার আরম্ভ জানিয়া, ভিতরে পুলিশ বাহিরে সৈনিকের দল রঙ্গালয়-রক্ষার্থে নিয়োজিত হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় উপস্থিত হইল। পটোত্তোলনমাত্র অভিনবের দলের হুঙ্কারে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। পৌরাণিকেরাও গর্জ্জন করিতে ছাড়িল না। একটু অবসর পাইবামাত্র অভিনয় আরম্ভ হইল। সূত্রপাতেই Escalier Derobe (বিবস্ত্র সোপানাবলি) উচ্চারিত হইবামাত্র, বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গেল। Derobe নূতন রকমের বিশেষণ আবার তাহার উপর একচ্ছত্রের শেষ ভাগে বিশেষ্য Escalier, তার পর ছত্রে তাহার বিশেষণ derobe, ভাষার উপর একি ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলিয়া পৌরাণিক গালাগালি আরম্ভ করিলেন। অভি-নবেরা তাঁহাদিগকে বাপান্ত করিতে ছাড়িলেন না, তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। গোলমাল কিছু কমিয়া গেলে আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। সাপেও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়, এই অসা-ধারণ কবির ভাষা ও ছন্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্রমে সকলে ধীরভাবে কতকটা শুনিলেন, মধ্যে মধ্যে তর্জ্জন-গর্জ্জনও চলিতে লাগিল। একজন প্রকাশক চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ের পূর্ব্বেই Victor Hugo র নিকট গিয়া নাটকখানি প্রকাশের সত্ত্বের জন্য ৬ হাজার Franc দিবেন বলিয়া

হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন ; বলিলেন, ১ম অঙ্ক শেষ হইতেই দুই হাজার ফ্রাঙ্ক দিব ঠিক করেন, ২য় অঙ্কের শেষে ৪০০০, তৃতীয় অঙ্কের পর ৬০০০ দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, অভিনয় স্থগিত থাকুক, কথাবার্ত্তা শেষ করা না হইলে পঞ্চম পর্য্যন্ত শুনিলে ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক দিতে ইচ্ছা হইবে,কিন্তু দিবার সাধ্য নাই। Hugoর তখন দুই পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঘরে সম্বল ছিলনা; তিনি ৬হাজার ফ্রাঙ্ক আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন ও অভিনবেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সজোরে গান ধরিয়া দিলেন। অন্য পক্ষও ছড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। এইরূপে অভিনয় শেষ হইল। কোনরূপে পুলিশ ও সৈনিক শান্তি রক্ষা করিল। কিছু দিন ধরিয়া এইরূপ ঝগড়াঝাটি চলিয়াছিল —পরে সকলেই নতমস্তকে কবির শিক্ষা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। ভাষায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই স্বীকার করিয়া লইলেন। Hernani নাটক কল্পনায় উচ্চ স্থান অধিকারের উপযুক্ত নহে, কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ইহা নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া এখনও পূজিত। আমি তাই বলি, মাতৃভাষার আদর না জানিলে, নিজ সমাদর করিতে না শিখিলে, মিথ্যার মধ্যে সত্যের রূপ না দেখিতে পাইলে, সাহিত্য-সেবা বৃথা। আমাদের ভাষার আদর করা কি এতই কঠিন ? যে ভাষায় মাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছি, তাহার যদি সম্মান করিতে না জানি, নরকেও আমাদের স্থান হইবে না। আজকাল মনে হয়, এ কথাটি আমরা বুঝিয়াছি। তবে দুটি কথা বলিতে পারি কি ? নিজের মা থাকিতে পরের গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী জামা-জোড়া পরাইও না। প্রথমটি স্বতঃসিদ্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি ?

এক স্থানে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার পায়ে এক সময় সোণার শৃঙ্খলে ভূষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আমরা দেব প্রতিমা জর্ম্মান ডাকের সাজে সাজাই, দেবীর পূজায় হোটেলের খানা দিয়া দেবের ভোগ দিই। আর্য্যসঙ্গীত হার্ম্মোনিয়ামের সাহায্য ভিন্ন চলে না। তেমনই ঘরের কথাগুলিকে বিদেশী রূপ না দিলে আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গলাভাষায় তেজ হয় না। তাই আজকাল দেখি বর্ণসঙ্কর ও জারজ কথার ছাড়াছাড়ি। জিজ্ঞাসা বাঙ্গালা, লিখিয়া যদি তাহার পার্শ্বে ইংরেজী phraseএ, কি sentenceএ তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়, সেটা কি উচিত ? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা লিখিয়া বুঝাইতে পারিলাম না, ইহা লজ্জার কথা। যে ইংরেজি ভাবটি (চৌর্য্যবৃত্তিলব্ধ) বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হয়, করুন, কিন্তু এমন কথা প্রয়োগ করিয়া অনুবাদ কবিবেন না, যাহার পাশাপাশি ইংরেজি কথাগুলি না বসাইয়া দিলে বোধগম্য হয় না। আজ কাল দেখিতে পাই, ইংরেজি এক আধটি কথা মাত্র নহে, সমগ্র পদ এবং sentence পর্য্যন্ত না বসাইয়া দিলে অর্থ বোধ সঙ্কট। সংস্কৃত যে ভাষার মাতা তাহার অভাব কি ? তবে সংস্কৃত পড়ি না, জোর করিয়া শব্দ গড়াইতে বসি। ইংরেজি ভাব, সংস্কৃত ধাতু অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা সহজ নহে, কিন্তু আমারা এ কথাটি যেন ভুলিয়া না যাই যে, শব্দ মাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে Geological periods আছে, শব্দেরও সেইরূপ। সুব্যবহারেই শব্দ গৌরবান্বিত, অসাধু প্রয়োগে তাহার

অগৌরব। শব্দের প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ করা কঠিন। সে একের নহে, কোটী প্রাণের ধন, অগণ্য কণ্ঠে উচ্চারিত। তবে যিনি মৃত কথায় জীবন দান করিতে পারেন, কিম্বা নূতন কথা সৃজন করিতে পারেন, তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্রজ্ঞ ঋষিপুরুষ, তিনি দেবতুল্য তবে আমরা নাকি সকলেই গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া শিব গড়িতে বসিয়াছি, তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। কি গড়িয়া তুলিতে গিয়া কি গড়িয়া বসি। ভাস্কর হস্তে দেবমূর্ত্তি বিকশিত হয়। হাতুড়ীপেটা কথা সহজে চলে না।

বাঙ্গালা সাহিত্য জটিল হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজি না জানিলে অনেক সময় লেখকের মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরেজি ভাষা জারজ, Froude বলেন Mongrel, তাহার শব্দার্থে অনেক বৈচিত্র্য আছে। পরের ঘর হইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়া লইতে সময় লাগে। অনেক সময় একেবারেই নিজের ঘরের হয় না। হৃদয়ে অনুরাগ না জন্মাইলে একপ্রাণ হইতে পারে না। ক্ষেত্রতত্ত্ব না বলিয়া জ্যামিতি বলা, রসায়ন শাস্ত্রকে কিমিতিনিমিতি বলাতে পাগলামি আছে। জোর করিয়া Geometry ও Chemistryর জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করা বিধেয় মনে করি না। কুল ভাঙ্গামিতে গৌরব নাই। এক সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী-সম্প্রদায় নিজের নামেও বিদেশীয় রূপ দিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে হাসি পায়। হিন্দু দেবীর "কালী" নামের পরিবর্ত্তে collie স্কচ্ কুকুরের নামে আনন্দ বহন করিতে দেখা গিয়াছে। সেইরূপ নিজের দেশের কথাকেও বিলাতি চেহারা দেওয়া হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট-বাজারে পরের জিনিষ লইয়া বেচা-কেনা করে, তাহাদের পক্ষে ভাড়ানই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য পণ্য জগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাহ, বিলাতি সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর ; বুঝি কথার অভাব প'ড়ে ভাষাতে নূতন ভাববিকাশের সহিত নূতন কথার প্রয়োজন। Franceএর Academy যেমন নূতন কথার উপর, কথার নূতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, আমাদিগের পরিষদের সেইরূপ কর্ত্তব্য। একবার বসিয়া বাঙ্গালার অভিধান ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সহ্য করিতে পারি না, আধ আধ-ভাষা, সে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজকাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই—মুখানি, আলো, জোছনা, দিঠি, ইত্যাদি। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইব ? তরু, লতা জাতিযূথি, সোণার আলা, সাঁজের বেলা, জোছনা রাতি, সবই অতি সুন্দর, কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ক্লান্তি কি কখনও হয় না ? স্বীকার করি, বাঙ্গালী কবি এই সৌখীন কাব্য-জগতে অদ্বিতীয়। বাঙ্গলা ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্য জগতে নাই, বাঙ্গালীর মুক্তার হার গাঁথা সহজ। তবে "জোছনা" দেখিতে দেখিতে মনে হয়, বলি, "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে ?" রাহুর পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদি চন্দ্র গ্রাস করিলেন, তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না। আমরা এই অবসরে গঙ্গা-স্নান করিয়া লই—আঁধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় না কি—মনে হয় না কি, কি

কারণে "মহাকাব্য" লিখিতে বসিয়া বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন না। তোড়, জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে, বাঙ্গালী ঢাল-তলওয়ার লইয়া বেহাত হইয়া পড়েন। মাতৃদুগ্ধ-পিপাসু বালিকার হৃদয়ের দুলাল, দুধে আল্‌তা দেওয়া সরস ভাষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেই রাইরাজা। আমাদের কবি শৈশব যৌবনের মিলনের সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ, সন্ধিস্থলে মোহ-মুগ্ধ হইয়া কত দিন যাপন করিবে? তোমার মদন-মনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না; বেশে তুমি অতি সুন্দর কবি, আমার বিশ্বাসে ত তুমি অন্য বেশেও সুন্দর। তোমার মত ধীশক্তি জগতে বিরল, তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে, তুমি সরস্বতীর বরপুত্র, তবে রতি-মন্দিরে দিন যাপন করিও না। সহস্র নির্ঝর-প্রসূত মন্দাকিনী-বারিবিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে। আমি একস্থানে বলিয়াছি সত্য জগতে "অহং"-এর স্থান নাই। ইহাতে প্রকৃত আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা, তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। সত্যে কাহারও বিশেষ অসম্মতি নাই। একজনের মনে সত্য আবিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু সত্য আবিষ্কার হইবা-মাত্র সমগ্র জগতের ধন হইয়া যায়। সত্যে কোন ব্যক্তি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অধিকার নাই। সাহিত্য ও ধর্ম্ম, বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের যে সম্বন্ধ আছে, ভিন্ন পথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাকে, সেইজন্য কবি ও ঋষি সময়ে একই ছিলেন। Prophet, Poet, Vates and Seer অনেক ভাষাতেই একই নাম। সাহিত্য সেই জন্য "সাধনা"। সত্যের অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের শক্তি।

জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস একই। এই জীবন পরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যেও তেজ ও বল দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লেখক জন্মাইতে পারে, কিন্তু যথার্থ যাহাকে সাহিত্য বলে, তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাসে এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হয়, এবং এই দুই সাহিত্য দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, জাতীয় ইতিহাস কতকটা সাহিত্যের সহায়।

সুকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে সুকুমার সাহিত্যে যে "সাধনার" কথা আমি বলিলাম, তাহার উপযোগী নয়। যেমন চন্দ্রালোক সুন্দর, প্রচণ্ড সূর্য্যালোকও সুন্দর। চন্দ্রালোকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উদ্ভাসের জন্য রৌদ্রতেজের প্রয়োজন।

আমি পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি যে জাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন জাতি কখন গঠিত হয় না। নিজের হৃদয়ে নিজের দেশের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষারই স্থান সঙ্কীর্ণ। সাহিত্যকে বিদেশী সাজে সাজাইলে কখনই সুন্দর হইতে পারে না। যেমন ভাষা জারজ হয়, সেই রকম বিভিন্ন ভাব মিশ্রণে ভাবের বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। Burns আপনারা সকলেই জানেন Scotlandএর মহাকবি, তিনি ইংরাজীতেও অল্পস্বল্প কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার সবগুলিই প্রায় অপাঠ্য। French কবি Musset, Italianএ কবিতা লিখিয়াছিলেন, Heine Frenchএ

সেইগুলিও প্রায়ই অপাঠ্য। এ কথাটি বিশেষ করিয়া বলার আমার উদ্দেশ্য আছে। বাঙ্গলায় বিদেশী ভাষার ছাঁদ আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত মনে হয়। আমি ইংরেজ-নবীশ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অমুকে আমার উপর ডাকিয়া-ছিলেন' অর্থাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ইংরাজীতে (called on me)র অনুবাদে এ ভাষা কি নিতান্ত ঘৃণাজনক নয়? তাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না বলিয়া আমাদের ডাকিয়াছেন বলিতে শুনিয়াছি, অর্থাৎ (They have asked me) এইরূপ ভাষা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরই এই দোষ দিই বা কি করিয়া? মাতৃদুগ্ধ-পালিত শিশু ও Mellin's food প্রভৃতিপায়ী শিশুতে প্রভেদ আছে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গলা না শিখিয়া অন্য ভাষা শিখিবার জন্য আমরা সকলেই প্রাণপণ প্রয়াসী হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তি কত অপচয় হয়; আমাদের শিক্ষার এইটি মৌলিক দোষ। এই দোষ যত দিন পর্য্যন্ত রহিবে, ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশা স্বল্পমাত্র। নিজের দেশের ভাষার অর্থ যতখানি বুঝাইব, পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। বিমাতা মাতা হইয়াও মাতা নহে। সৌভাগ্যের বলে আমরা এখনও পর্য্যন্ত বিপিতা প্রাপ্ত হই নাই, তবে কপালে কি আছে বলিতে পারি না। কথার রূপ আছে। সেই রূপ সম্যক্ উপলব্ধি না হইলে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন ও তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া কঠিন। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের মানসিক অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের সাহিত্যও বলীয়ান্ হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে ইউরোপীয় সাহিত্য ইহুদীয় আদর্শ ও গ্রীক্ মনোবিজ্ঞানের আদর্শের উপর সংগঠিত। এই ইহুদীয় প্রভাবটুকু আমরা পাশ্চাত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেইখানেই যাহা কিছু সামঞ্জস্য আছে। বাইবেলের ভাষা ও ভাবে অনেক স্থলে আমাদের আর্য্য ঋষিদের ভাষা ও ভাবের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্যের কারণ বহুতর। তাহাদিগের সমাজ একেবারে স্বতন্ত্র। তবে মানুষের হৃদয়মাত্রই এক এবং সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান। একজন ফ্রেঞ্চ মহাকবি বলিয়াছেন, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া থাকে, কিন্তু অমর জগতের ভাষা একই। এ বিষয় উল্লেখ করিবার এই উদ্দেশ্য যে, একভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ একপক্ষে উন্নতির কারণ হইতে পারে; তেমনই অপরপক্ষে সাহিত্যের প্রাণ যাহা তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়; অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেই জন্য সাহিত্যে আমি অনুবাদের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। যতদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে, Russian. কিম্বা Danish উপন্যাস অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে ততদিন হইতে ইংলণ্ডে কোন বিশেষ বড় নভেল প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহাদিগের জীবনের বৈচিত্র্য এবং সকলে নিয়ত বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার দরুন আজকাল ইংলণ্ডে চিন্তার সময় কম হইয়া পড়িয়াছে। দেশ-বিদেশের কথা এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজনোদ্ভূত নূতন উত্তেজনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ সাদাসিধা কথায় ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মনের উত্তেজনা পায় না বলিয়া বাহিরের উত্তেজনার জন্য

মন ব্যাকুল হইয়া থাকে। তাহার জন্য আজকালকার ইংরাজী সাহিত্যে ইংরাজ-জাতীয় বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশের সাহিত্যের প্রথম উল্লাসের সময় Les Chansens de geste এবং পরে Chante Fables এর দরুণ অর্থাৎ জাতীয় গীতিকবিতার বলে সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশেরও সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় মাণিকচাঁদের গীত প্রভৃতি, গম্ভীরা, চণ্ডী ইত্যাদির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল কিসের বলে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবেন ? বাঙ্গলার ইতিহাসের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ইতিহাস যদি উদ্ধার করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদিগের সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আমার বিশ্বাস। সেই জন্য আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য এখানে উল্লেখ করিতেছি। যাঁহাদের যত্নে এবং চেষ্টায় এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে, তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া উপসংহারে বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালের কথা দুএকটি বলিতে চাই। তাঁহার বিয়োগে আমার মনে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়া আমরা একত্রে ছিলাম, চিরকাল তাঁহাকে আমার নিজের ভাইয়ের মত দেখিয়া আসিয়াছি এবং সেও আমাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। অতি বাল্যকালে তাহার সুমধুর সংগীত শুনিয়াছি ; তাহাও অদ্য মনে পড়িতেছে। সে যদি "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটি গান মাত্র রচনা করিয়া রাখিয়া যাইত তাহার কীর্ত্তি চিরদিন অক্ষয় রহিত। সে যেখানে গিয়াছে সেখানে অনেকের স্থান নাই, অনেকের স্থান কখন হবেও না। তাহার পার্শ্বে বসিবার আমাদের মধ্যে অনেকের স্থান হবে না। কিন্তু তাহার স্মৃতি চিরদিন আদরের সহিত রক্ষা করিব। এই প্রার্থনা করি আমাদের ছেলে মেয়েরা—সে যে চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিল—তাহারাও যেন সেইরূপ সুন্দর দেখে এবং তাহারাও সেই দেশের ছেলে মেয়ে বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করে। স্বর্গ হইতে হে দ্বিজেন্দ্র! তুমিও তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিও।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী

ভারতীয় নাট্য

নাট্য শব্দে নৃত্য, গীত ও বাদ্য বুঝায়, পক্ষান্তরে অভিনয়ও নাট্য শব্দের বাচ্য; বর্ত্তমান প্রবন্ধে শেষোক্ত বিষয়েরই অবতারণা করা হইবে।

অভিনয় শব্দের অর্থ - অবস্থার অনুকরণ। উহা চারি প্রকার—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্বিক। অঙ্গভঙ্গি দ্বারা যে সকল ভাব ব্যক্ত করা হয়, তাহাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে। বাক্য দ্বারা ভাবব্যক্তির নাম বাচিক; বেশভূষাদি দ্বারা অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধন আহার্য্য; স্তম্ভ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রুপাত ইত্যাদি সাত্বিক বলিয়া খ্যাত।

প্রকৃতরূপে নাটকের অভিনয় আরব্ধ হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় নাট্যের কতিপয় পূর্ব্বানুষ্ঠান দেখা যায়, যথা—পূর্ব্বরঙ্গ, সভাপূজা, কবি ও নাটকের নাম ও গুণকীর্ত্তন—অনন্তর নাটকের প্রস্তাবনা। পূর্ব্বরঙ্গের অনেকগুলি অঙ্গ আছে, কালক্রমে সে সকল অঙ্গের প্রচলন রহিত হইয়া যায় ও কেবল 'নান্দী' অবশ্য কর্ত্তব্য অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয়। পূর্ব্বরঙ্গ রঙ্গস্থলের বিঘ্ন-নাশের জন্য। অভিনয় আরব্ধ হইবার পূর্ব্বে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়,তাহাই পূর্ব্বরঙ্গ নামে খ্যাত। দেবদ্বিজনৃপাদির আশীর্ব্বাদযুক্ত যে স্তুতি, তাহাকে নান্দী বলে; এই নান্দীতে শঙ্খ, চন্দ্র, অব্জ ইত্যাদি মঙ্গলসূচক পদ থাকা আবশ্যক। যেস্থলে নাটকের অভিনয় হইত তত্রত্য দর্শকবৃন্দকে সভ্য ও তাদৃশ সম্মিলনকে সভা বলা হইত ও তন্মধ্যে একজন সভাপতি, থাকিতেন। পূর্ব্বরঙ্গের কার্য্য সূত্রধারের কর্ত্তব্য; পূর্ব্বরঙ্গ শেষ করিয়া সূত্রধার নিবৃত্ত হইলে স্থাপক প্রবেশ করিয়া কাব্যের স্থাপনা করেন।

স্থাপকের কার্য্য সভাপূজা, কবি ও নাটকের নাম-গুণকীর্ত্তন ও তদনন্তর নাটকের প্রস্তাবনা।

প্রশংসাদ্বারা সভ্যগণের মন অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ করা অযৌক্তিক কার্য্য নহে, কবি ও কাব্যের নামগুণকীর্ত্তনও অপ্রাসঙ্গিক নহে, কালক্রমে অভিনয়ের এই সকল পূর্ব্বানুষ্ঠান লোকের তত প্রীতিকর হইত না; এই সকল ইতিকর্ত্তব্যতার দ্বারা কালক্ষেপের পরিবর্ত্তে প্রকৃত অভিনয় আরম্ভ লোকের বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিত; তজ্জন্য ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বরঙ্গের দ্বাবিংশতি অঙ্গ কেবল নান্দীর অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যখন পূর্ব্বরঙ্গের এই প্রকার সংক্ষেপ হইল, তখন সূত্রধারই স্থাপকের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন; পূর্ব্বে দীর্ঘ পূর্ব্বরঙ্গ থাকাতে সূত্রধার সেই সকল কার্য্য করিয়া অবসৃত হইতেন ও স্থাপক আসিয়া প্রস্তাবনা করিতেন; পরে একমাত্র নান্দী শ্লোক পাঠ করিয়া অবসৃত না হইয়া সূত্রধারই স্থাপকের কার্য্য করিতে লাগিলেন; সম্প্রতি বাঙ্গলা নাটকে ও পাশ্চাত্য দেশীয় নাটকে নান্দীও নাই, এবং প্রস্তাবনাও নাই।

পূর্ব্বকালে যখন ভারতবর্ষের লোকসমূহ প্রভাতে দুর্গা দুর্গা, ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ইত্যাদি নাম স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন ও ভোজনকালে জনার্দ্দনকে স্মরণ করিতেন

ও পদ্মনাভের স্মৃতি মনোমধ্যে নিহিত করিয়া শয়ন করিতেন, সে সময়ে বহু গুণিগণ-সমীপে ত্রিবর্গসাধন নাট্যের অবতারণা করিতে যাইয়া যে দেবাদির স্তুতি তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে স্বতঃই উদিত হইবে ও সভ্যগণের পরম প্রীতির সম্পদ্ হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। বর্ত্তমান কালে অন্যান্য গুরুতর কার্য্যে দেবতার স্মরণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে নাটক অভিনয়ে যে অভীষ্ট দেবতার নাম কীর্ত্তন পরিত্যক্ত হইবে, তাহাতেই বা বৈচিত্র্য কি !

প্রস্তাবনা—নাটকীয় পাত্র,প্রবেশের অনুকূলভাবে সূত্রধারের সহিত নটী, বিদূষক বা পারি-পার্শ্বিকের যে বিচিত্র আলাপ, তাহাকে প্রস্তাবনা বলে। ভারতীয় নট সূত্রের মত "নাসূচিতস্য পাত্রস্য প্রবেশো নির্গমোঽপি চ" ; অর্থাৎ সূচনা ব্যতীত পাত্রের প্রবেশ বা নির্গম হয় না। এই অনুশাসনের জন্যও প্রস্তাবনার আবশ্যক। সূত্রধার ও নটীর পরস্পর সম্ভাষণ এমত ভাবে সম্পন্ন করা হয় যে, কথার পর কথার কৌশলে পাত্র প্রবেশ সম্পন্ন হয় ও সঙ্গে অদ্ভুত বাগ্‌বিন্যাস দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় করিয়া দেওয়া হয়।

মুদ্রারাক্ষস ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রস্তাবনা যে অপূর্ব্ব কৌশলে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা সেই প্রস্তাবনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে প্রস্তাবনা ব্যতীত অভিনয় আরব্ধ হইয়া থাকে, আজ কাল বাঙ্গলা নাটকেও সেই রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে নূতন শ্রোতা সহসা একটু অসুবিধাতে পতিত হন ; যিনি পূর্ব্বে ঐ অভিনয় দর্শন করেন নাই বা অভিনেয় নাটক পাঠ করেন নাই, তিনি সহসা রঙ্গস্থলে কে উপনীত হইলেন না বুঝিতে পারিয়া কিছু বিড়ম্বিত হন ; তবে ইদানীং পাত্রগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়যুক্ত দৃশ্যাবলীর বিবরণী শ্রোতৃবৃন্দের হস্তে ন্যস্ত হয় বলিয়া কিছু রক্ষা। দৈবাৎ তাদৃশ লিপি বিতরিত না হইলে অথবা তাহা পাঠ করার অসুবিধা হইলে নূতন শ্রোতা অভিনয়ের আদ্যোপান্ত কেবল বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রাচীন রীতি অনুসারে সূচনা দ্বারা পাত্র প্রবেশ নিষ্পন্ন হইলে কথিত অসুবিধার মাত্রার কিছু লাঘব হইতে পারে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যরীতির সহসা পাত্র প্রবেশ দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের মনে অভিনেয় বস্তুর যাথার্থ্য অধিকতর রূপে প্রতিফলিত হইতে পারে। সূচিত পাত্রের প্রবেশ দ্বারা প্রথমতই যেন কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এই যুক্তিবলে সহসা পাত্র-প্রবেশ সমর্থিত হইতে পারে, কিন্তু অভিনয়স্থলে অভিনেয় বস্তুজাত অকৃত্রিমরূপে আয়োজিত হইলেও শ্রোতার আত্মবিস্মৃতি ব্যতীত কৃত্রিমতার হস্ত হইতে রক্ষা নাই। এমত অবস্থায় প্রাচ্য দেশীয় প্রস্তাবনার অপূর্ব্ব কৌশল নাট্যসাহি-ত্যের অঙ্গের শোভাবর্দ্ধক ব্যতীত শ্রীহানিকর নহে।

প্রস্তাবনান্তে পাত্রপ্রবেশ সিদ্ধ হইলে মূল অভিনয় আরম্ভ হইল। আঙ্গিক, বাচিক আহার্য্য ও সাত্ত্বিক, অভিনয়ের এই চারি অবস্থা ; তন্মধ্যে বাচিক অভিনয়ই প্রধান। অভি-নয়ের এই অবস্থার উৎকর্ষ নাটকের কবির কৃতিত্বের প্রতি নির্ভর করে। চতুরবস্থার মধ্যে বাচিক সম্বন্ধেই আমরা প্রথমতঃ আলোচনা করিব। বাচিকের আলোচনা করিতে হইলে নাটকের রচনার আলোচনা আবশ্যক।

প্রথমতঃ কাব্য দুইভাগে বিভক্ত—দৃশ্য ও শ্রব্য। যাহা দেখা যায় অর্থাৎ যাহার অভিনয় হয়, তাহাকে দৃশ্য ও যাহা কেবল পাঠ করা যায় ও শ্রবণ করা যায়, তাহাকে শ্রব্য বলে। প্রথমোক্ত দৃশ্য কাব্যকে রূপকও বলে; রূপক দশ শ্রেণীতে বিভক্ত; নাটক তন্মধ্যে অন্যতম; দশবিধ রূপকের মধ্যে নাটকই প্রধান, তৎসম্বন্ধেই আমরা কিছু আলোচনা করিব। প্রকরণ, ভাগ, ব্যাযোগ, সমবকার, ডিম, ইহামৃগ, অঙ্ক, বীথি প্রহসন সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। আজ কাল বাঙ্গলাতে সাধারণতঃ দৃশ্য কাব্য মাত্রকেই নাটক বলা হয়; সংস্কৃত নাটকের লক্ষণে যে সকল বিশেষত্ব আছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। সচরাচর প্রাচ্য দেশীয় নাটক ও প্রতীচ্য রাজ্যের (Drama) তুল্য বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয়। Drama ও নাটকের সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আনুষঙ্গিক আলোচনা যথাস্থানে করিতে চেষ্টা করিব।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, রূপকের এই দশ প্রকার ভেদ ও তাহাদিগের লক্ষণ-নির্ণয় প্রাচ্য দেশীয় পূর্ব্বসূরিগণের বৃথা কল্পনা-প্রসূত অনাবশ্যকীয় অকিঞ্চিৎকর বস্তু ও ভাবী লেখকগণের দিগন্ত-প্রসারী কল্পনাজালের নিয়ত পরিপন্থী। সূত্র ও নিয়মরূপ শৃঙ্খলে নিয়ত শৃঙ্খলিতা নব্য কবিগণের কল্পনা কামিনী স্বেচ্ছায় এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিলে কি প্রকারে স্বদেশীয়-বিদেশীয়, পার্থিব-অপার্থিব পদার্থচয়ের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে অভূতপূর্ব্ব নাটকের সৃষ্টি দ্বারা নাট্য-জগতের উৎকর্ষ সাধিত হইবে। তজ্জন্যই ইদানীন্তন কালের অনেকের মত যে, নাটকের লক্ষণ ইত্যাদি থাকা উচিত নহে; স্বপ্রতিভা বলে যিনি যে প্রকারে ভাল বোধ করেন কাব্য-নাটক রচনা করিবেন ও ভাষার পুষ্টি-সাধন করিবেন। এত বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিলে ভাবের স্ফূর্ত্তি হইবে কেন? নাটক রচনায় সূত্রাদি লক্ষ্য করিয়া নাটক-রচনা বিড়ম্বনা মাত্র; সূত্রাদির বিরোধী এই সকল উক্তি শ্রবণমাত্র যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইলেও এতৎসম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি করিলে আমরা ঐ সমুদয় উক্তির অলীকতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

প্রথমতঃ প্রসিদ্ধ কবিগণ নাটক রচনা করিয়াছেন। এই প্রকার বহু নাটক রচিত হইলে তৎসমূহের সম্যক্ সমালোচনা করিয়া নাটকের সূত্র ও নিয়ম প্রণীত হইয়াছে। এই প্রকার সূত্র-প্রণয়নের দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য নাটকসমূহের গূঢ় ভাবের ব্যাখ্যার সহায়তা করা। এই সমুদয় সূত্রাদির সহায়তা ব্যতীত নাটক পাঠ করিলে নাটকের অভিসন্ধি যথোপযুক্তরূপে কখনই হৃদয়ঙ্গম হইবে না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণকে নাটক রচনা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান।

সকল প্রকার কলা বিদ্যা সম্বন্ধেই আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমতঃ কোন অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্বীয় মণীষা-প্রভাবে অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক বস্তুজাত রচনা করিয়া লোকনয়নকে বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত করেন; জগতে প্রতিভার বিকাশ সচরাচর দেখা যায় না, তাই কেবল অপূর্ব্ব প্রতিভা দ্বারা সকল বস্তু রচিত হইতে হইলে উহাদের সংখ্যা এত ন্যূন হইত যে, তদ্দ্বারা জগতের তদ্বিষয়ের অভাবের সহস্রাংশের একাংশেরও পূরণ হইত না। তজ্জন্য অপূর্ব্ব প্রতি-

ভার ফলস্বরূপ অলৌকিক উপহার প্রাপ্ত হইলে তাহার বিশ্লেষণ দ্বারা কি উপায়ে তাদৃশ বস্তু সৃষ্ট হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মানবের স্বভাবতঃ চেষ্টা হইয়া থাকে, এই প্রকার চেষ্টার ফল তত্তৎ-কলাবিজ্ঞার সূত্র। এই সকল সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অল্প মণীষাসম্পন্ন জনগণও সেই অলৌকিক সৃষ্টির অনুকরণে অগ্রসর হয় ও তাহার ফলে সেই অলৌকিক সৃষ্টির অনুরূপ না হউক অনেকাংশে তৎসদৃশ সৃষ্টি দ্বারা তত্তৎ কলার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। যে সকল ব্যক্তি সেই অলৌকিক বস্তুর বিশ্লেষণ দ্বারা সূত্র প্রণয়ন করেন, তাঁহারাও সাধারণ লোক নহেন, তাঁহাদের প্রতিভা অনুরূপ। প্রতিভা জগতে নানা আকারে বিচরণ করে। নাটক-রচয়িতা ও নাটকের সূত্রকার, চিত্রকর ও চিত্রকার্য্যের সূত্র-প্রবর্ত্তয়িতা ইহারা উভয়েই প্রতিভাশালী। একের প্রতিভা রচনায়--সৃষ্টিতে, অপরের প্রতিভা ব্যাখ্যায়—বিশ্লেষণে। এই উভয় শ্রেণীর প্রতিভার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণের ফল অপেক্ষাকৃত হীনপ্রতিভজনগণে প্রতিভার বিকাশ। যে ব্যক্তি স্বয়ং অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী, অদ্ভূত উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন সে সূত্রের সাহায্যব্যতীত নিজে অপূর্ব্ব কলার সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার জন্য সূত্র নহে—কিন্তু যে ব্যক্তির তাদৃশ প্রতিভা নাই অথচ প্রতিভার বীজ আছে, তাহার পক্ষে সূত্রের আবশ্যক।

বিষয়টি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদ করিতে চেষ্টা করা যাউক। কোন কৃতী চিত্রকর একখানি অপূর্ব্ব চিত্র প্রস্তুত করিলেন, চিত্রের অপরূপ সৌন্দর্য্য-দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইল। কিন্তু এরূপ মোহের অসাধারণত্ব কিছু নাই। সকলেই বলিতে লাগিল, চিত্রখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এমন আর দেখা যায় নাই ইত্যাদি; কিন্তু যিনি ঐ চিত্রের বিশ্লেষণ দ্বারা চিত্রের সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপ উপলব্ধি করেন, তিনি ঐ চিত্রের সৌন্দর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারেন ও চিত্ররচনা সম্বন্ধে সূত্ররচনা করিতে পারেন। বস্ত্রাচ্ছাদিত বেশভূষাদি দ্বারা অলঙ্কৃত কোন চিত্র দর্শন করিয়া তাদৃশ অপর চিত্র রচনা করা যায় না; কারণ বস্ত্র দ্বারা অবয়ব আচ্ছাদিত থাকিলে কি ভাবে কোন অবয়ব হইতে চিত্র রচনা আরম্ভ করিতে হইবে, প্রচ্ছন্ন অবয়ব গুলির পরিমাণ ও বিন্যাস কি প্রকার হইবে তাহা স্থির করা যায় না, কিন্তু এতৎসম্বন্ধে নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ হইলে অপর ব্যক্তি তাদৃশ লেখ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি স্বয়ং লিপিকুশল তাহার পক্ষে লিপিসূত্র অনাবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞের পক্ষে উহা একান্ত প্রয়োজনীয়; যাঁহার স্বতঃ উদ্ভিন্ন অপূর্ব্ব প্রতিভা আছে, তিনি ঐ সকল সূত্রের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বয়ং স্বীয় প্রতিভার বিকাশ দেখাইতে পারেন, সূত্রগুলি তাঁহার সহায় হইবে ব্যতীত তাঁহার প্রতিভার পথের কণ্টক হইবে না।

এক্ষণে আমরা প্রস্তুত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা রূপকের মধ্যে নাটক সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা করিব।

কোন নাটক পাঠ করিলে অথবা অভিনয় দর্শন করিলে সাধারণ পাঠক বা দর্শক মনে করিবেন যে, নাটক প্রকৃত ঘটনার বা কার্য্যাবলীর অনুকরণ মাত্র; কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে অথবা বিশ্লেষক, প্রদর্শক গ্রন্থের সাহায্যে বুঝিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, নাটক প্রকৃত

ঘটনার যথাযথ অনুকরণ নহে ; প্রকৃত ঘটনার অনুকরণে নাটক লিখিত ও অভিনীত হয় সত্য, কিন্তু কবি প্রয়োজনানুসারে প্রকৃত ঘটনার অপলাপ ও অপ্রকৃত ঘটনার সমাবেশ করিয়া নাটক প্রণয়ন করেন, এই অংশেই কবির কৃতিত্ব ; প্রকৃত ঘটনার যথাযথ সমাবেশ দ্বারা নাটক রচিত হইতে পারিলে নাটকরচনা অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিত। ভাষায় অধিকার থাকিলে কোন সংঘটনের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা উক্তিপ্রত্যুক্তিক্রমে লিপিবদ্ধ করিলেই নাটক হইত ; প্রতিদিন আমরা যে সকল ঘটনা দর্শন করি, তাহা নাটকীয় উপাদান বটে, কিন্তু ঐ সকল ঘটনার অপূর্ব্ব সমাবেশে নাটক গ্রথিত হয় ; এই অপূর্ব্ব সমাবেশের উপর নাটকের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে। ইষ্টক, প্রস্তর ইত্যাদি গৃহোপকরণ সর্ব্বত্র একই থাকে, কিন্তু সেই সকল উপকরণের সমাবেশের তারতম্যে গৃহের যেমন উৎকর্ষাপকর্ষ হয়, সেই প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ, জন্ম-মৃত্যু, কলহ-বিবাদ, প্রেম-ভক্তি ইত্যাদি মূলক ঘটনাবলী সর্ব্বত্র এক হইলেও সমাবেশের তারতম্যে নাটকেরও উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে যদিও অতি প্রাচীনকালে অনেক বিষয়ে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল বিষয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষ, সাহিত্য ইত্যাদি সকল বিষয়েরই প্রাচীন গ্রন্থ আছে সত্য, কিন্তু সকলগুলিই অবৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ ঐ সকল গ্রন্থ যাদৃচ্ছিক কতকগুলি শ্লোক বা সূত্রের সমষ্টি মাত্র, উহার সহিত তত্তৎশাস্ত্রের বিজ্ঞানের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। আমরা এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, উক্ত উক্তি ভারতীয় শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলনাসমর্থ ব্যক্তির স্বকপোলকল্পিত প্রলপিত মাত্র।

নাটক সম্বন্ধে আর্য্যমনীষিগণ যে সকল সূত্র বা নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা যে কেবল যাদৃচ্ছিক অসম্বদ্ধ প্রলাপ নহে, পরন্তু সুপ্রণালীসিদ্ধ যুক্তিযুক্ত অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক নিয়মাবলী তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করা আমাদের পাঠ্য প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সাহিত্যদর্পণকার নাটকের যে লক্ষণ লিখিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা আলোচ্য বিষয়ে অগ্রসর হইতেছি।

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ" ইত্যাদি—নাটকের ঘটনাটি বিখ্যাত হওয়া উচিত ; দশবিধ রূপকের মধ্যে নাটককে শ্রেষ্ঠ আসন দিবার জন্য উহার ঘটনাটি বিখ্যাত হওয়া আবশ্যক। বিখ্যাত ঘটনা অর্থে রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি পুরাণপ্রসিদ্ধ ঘটনা গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে নাটক ভারতবর্ষের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। বাল্মীকি ও বেদ-ব্যাসের মুখারবিন্দনিঃসৃত পুরাণমকরন্দ পানে ভারতীয় নরনারীর চিত্তভৃঙ্গ নিয়তই লোলুপ ; যেখানে সেই মকরন্দের সংস্রব আছে, তাহা যে ভারতীয়গণের অপূর্ব্ব প্রীতির আকর হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ? দ্বিতীয়তঃ পুরাণপ্রসিদ্ধ নরনারীগণ দেবতানির্ব্বিশেষে ভারতীয়গণের নিকট পূজিত, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্রযুক্ত নাটক তাহাদিগের নিকট সমধিক আদরণীয় হইবে ইহাতে আর কথা কি ?

প্রবন্ধের অতি বিস্তারভয়ে সর্ব্বত্র সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সমালোচন-সহ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে আমরা নিরস্ত রহিলাম, কেবল সংক্ষেপতঃ বিষয়গুলির প্রতি শ্রোতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিব।

ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত কোন একটি কার্য্য করিতে হইলে ঐ কার্য্যটি পাঁচটি অবস্থা অতিক্রম করে,—আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি অর্থাৎ নিয়ত প্রাপ্তি ও ফলাগম। কোন একটি কার্য্য করিবার জন্য প্রথমতঃ কর্ত্তার মনে ঔৎসুক্যের উদয় হয়, উহাই কার্য্যের আরম্ভ, তৎপরে সেই কার্য্য করিবার জন্য যে চেষ্টা তাহাই যত্ন; কার্য্যের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়গুলি কর্ত্তার মনোমধ্যে উদিত হয়। এই সময় যদি প্রতিকূল বিষয়গুলির উপর অনুকূল বিষয়গুলির আধিপত্য স্থাপিত না হয়, অর্থাৎ কর্ত্তার অন্তরে যদি কার্য্যের প্রতিকূল চিন্তা বলবতী হয়, তবে আর কর্ত্তা কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন না। তাই নাটকের নায়ক এই সঙ্কটে পতিত হইলে কবি সাবধানতার সহিত প্রতিকূল বিষয়গুলির বিরুদ্ধে নায়কের মনে যুক্তি স্বতঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা দেখাইয়া নায়ককে কার্য্যে অগ্রসর করিবেন; কার্য্যের এই অবস্থার নাম প্রাপ্ত্যাশা; ইহার পরবর্ত্তী অবস্থার নাম নিয়তাপ্তি। কার্য্যের পরিপন্থী বিষয়গুলি তিরোহিত করিয়া নায়ক এইখানে নিশ্চয় কার্য্যসিদ্ধি জানিয়া কার্য্যে অধিকতর আগ্রহান্বিত হন। তৎপর ফলাগম অর্থাৎ মুখ্য ও আনুষঙ্গিক ফলপ্রাপ্তি। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কার্য্যের এই পাঁচ অবস্থা কল্পনাবিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক। এই পাঁচ অবস্থার সামঞ্জস্যে বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য্য এই পাঁচটি প্রয়োজন সিদ্ধির হেতু কল্পিত হইয়াছে। ফলের প্রথম হেতু, যাহা প্রথমতঃ অতি সূক্ষ্মভাবে দেখা যায়, কিন্তু পরে বহু বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহাকেই বীজ বলে। ক্ষুদ্র বীজ হইতে কালে যে প্রকার বহুশাখাপল্লবসমন্বিত ফলপুষ্পশোভিত বিশাল তরুর উদ্ভব হয়, ঠিক সেই প্রকার ক্ষুদ্র বীজ কারণ হইতে বিশাল কার্য্যের উৎপত্তি হয়। নাটকে নায়কের যে সকল কার্য্য প্রদর্শিত হয়, তাহা দীর্ঘকালব্যাপী ও নানা প্রকারের বলিয়া প্রতীত হয়, উহার কিন্তু একটি সূক্ষ্ম বীজ আছে।

কার্য্যের পূর্ব্বকথিত পঞ্চ অবস্থা ও পঞ্চ প্রয়োজন-সিদ্ধির হেতু দ্বারা নাটকের পঞ্চ সন্ধি কল্পিত হয়। সমুদয় নাটকখানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ভাগ বিভিন্ন প্রকারের বিষয়ে গ্রথিত হইলেও সকল অংশই এক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া নাটকীয় বস্তুর যে কার্য্যকারণভাব সাধন করে, তাহাকেই সন্ধি বলে। পাশ্চাত্য দেশে নাটকের যে unityর কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই সন্ধির ছায়ামাত্র। পাশ্চাত্য দেশে নাটকের unity বলিতে প্রথমতঃ ইহাই বুঝাইত যে, নাটকের বিষয় একটি হইবে, নাটকের ঘটনাগুলি একই স্থানে হইবে ও সমস্ত ঘটনা এক কারণ-সম্ভূত হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে পাশ্চাত্য দেশেও এই unityর পরিবর্ত্তন হয়; সমস্ত ঘটনা একদিনে একই স্থানে হওয়া আবশ্যক, এই নিয়ম পরে উপেক্ষিত হইতে লাগিল, কেবল ঘটনাবলীর কার্য্যকারণভাবরূপ ঐকমত্য আদৃত হইতে লাগিল।

পূর্ব্ব কথিত সন্ধির সংখ্যা পাঁচ, যথা —মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি। এই সকল সন্ধির বিবরণ পরিত্যক্ত হইল, নচেৎ প্রবন্ধ-কলেবর অতিগুরু আকার ধারণ করিবে ও সভ্যগণের ধৈর্য্যহানির কারণ হইবে।

পঞ্চ সন্ধি দ্বারা নাটকীয় বস্তু পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে; এই বিভাগের সহিত অঙ্কের বিভাগের নিয়ত সম্বন্ধ নাই, অঙ্ক শেষ না হইতে সন্ধি শেষ হইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে নাটকের তিন অংশ কল্পনা করা হইয়াছে, যথা—the exposition অর্থাৎ প্রারম্ভ, the development বিকাশ এবং conclusion or catastrophe অর্থাৎ উপসংহার। এই তিন প্রকার বিভাগ অপেক্ষা ভারতীয় পঞ্চসন্ধি-বিভাগ অধিকতর সূক্ষ্ম দর্শনের ফল। Expositionকে মুখসন্ধির স্থান দেওয়া যাইতে পারে, development প্রতিমুখ সন্ধির স্থানীয় বলিয়া কল্পিত হইতে পারে, conclusion বা catastrophe উপসংহৃতি সন্ধি বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। ভারতীয় নাট্যেরগর্ভ ও বিমর্ষ পাশ্চাত্য বিভাগে স্থান পায় নাই। গর্ভ ও বিমর্ষের বিষয় পাশ্চাত্য নাটকেও অবশ্যই আছে, তবে নাটক-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাঁহারা এ দুই বিভাগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ নাটকের তিন অংশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "Hence division into three acts is natural but five have been considered to be necessary" অর্থাৎ নাটকের যখন তিনটি অংশ দেখা যায়, তখন নাটকে তিনটি অঙ্ক হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পাঁচ অঙ্ক আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই স্থলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সূক্ষ্ম দর্শনের তুলনা করুন। নাটকের পাঁচ অঙ্ক যখন দেখা যায়, তখন কল্পনা আর কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম করিলেই, তিনটি ভাগকে ভারতীয় বিভাগের তুল্য করিয়া পাঁচ বিভাগে আনিলেই সর্ব্বসামঞ্জস্য হইত; কিন্তু তত চিন্তাশীলতা না দেখাইয়া তিন অঙ্ক স্বাভাবিক, কিন্তু পাঁচ অঙ্ক আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই প্রকার উক্তি যে পণ্ডিতসমাজে কি প্রকারে গৃহীত হইতে পারে, তাহা সহৃদয়গণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ প্রকার উক্তিতেও দোষ হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় পক্ষান্তরে ভারতীয় মনস্বিগণের যুক্তিযুক্ত অতি-সূক্ষ্ম দর্শনের ফলস্বরূপ সারগর্ভ উক্তিগুলিও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া সময় সময় হেয় বলিয়া প্রতীত হয়।

গ্রীস দেশীয় নাটকে অঙ্ক-বিভাগ নাই; রোমানগণ প্রথমে নাটকে অঙ্ক-বিভাগের সূত্রপাত করেন ও অঙ্কান্তে অভিনয়ের কার্য্য বন্ধ থাকার ব্যবস্থা করেন; সচরাচর পাঁচ অঙ্কই তাঁহাদের নিকট প্রচলিত ছিল, পরিশেষে হোরেস নামক কোন পণ্ডিত "Arts poetick" নামক গ্রন্থে এই নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন যে, নাটকের অঙ্ক পাঁচ হইবে।

পাশ্চাত্য মতে অভিনয়ের দেশকালের যেখানে পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে, সেইখানে অঙ্ক-বিভাগ হইবে; অঙ্কবিভাগের অন্যতর উদ্দেশ্য অভিনেতা ও শ্রোতৃবৃন্দের ক্ষণিক বিশ্রান্তিও বটে। প্রাচ্য মতেও এক দিনের কার্য্যাবলী এক অঙ্কে চিত্রিত করিবার ব্যবস্থা আছে,

সুতরাং তন্মতেও কালের পরিবর্ত্তন অঙ্কবিভাগের নিয়ামক বটে। কালের সহিত দেশের সম্বন্ধ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। অঙ্কশেষে বিশ্রান্তি ভারতীয় নাট্যপদ্ধতিরও অনুমত, অঙ্কান্তে সকল পাত্রকেই নিষ্ক্রান্ত হইতে হয়।

ভারতীয়গণ যে প্রকার কার্য্যের আরম্ভ, যত্ন ইত্যাদি পাঁচটি অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন, পাশ্চাত্যমতেও সম্পূর্ণ কার্য্যের পাঁচটি অবস্থা কল্পিত হইয়াছে, যথা,—causes, growth, height, consequences, and close. এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে নাটক সম্বন্ধে স্থূলতঃ কিছু ঐক্য আছে। ভারতীয়গণের বিভাগ ও বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর।

পাশ্চাত্যদেশীয় প্রথম-প্রবর্ত্তিত দেশকালের সমত্ব বিধায়ক নিয়ম তদ্দেশে পরে শ্লথ হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয়গণ তাদৃশ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রথম হইতেই অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়াছেন। কাল সম্বন্ধে এই মাত্র নিয়ম আছে যে, এক অঙ্কে এক দিবসের ঘটনার অতিরিক্ত কার্য্য সন্নিবিষ্ট হইবে না। আবশ্যক হইলে বিষ্কম্ভক প্রবেশক ইত্যাদি দ্বারা অতিরিক্ত দিবসের ঘটনা উপস্থিত করা হইবে। একবর্ষ পর্য্যন্ত এই ভাবে নাটকে স্থান পাইতে পারে। এক বৎসরের অধিক কালের ঘটনা প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক হইলে উক্ত ঘটনা বর্ষমধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই ভাবে সমুপস্থিত করিতে হইবে। সংস্কৃত নাটকে পাঁচ হইতে দশ পর্য্যন্ত অঙ্ক থাকিতে পারে, সুতরাং পাঁচ হইতে দশ দিনের ঘটনার সমাবেশে একখানি নাটক হইবে। কিন্তু এই পাঁচ হইতে দশ দিন যে ধারাবাহিক দিন হইবে, এমত কোন অনুশাসন নাই ও থাকা অনাবশ্যক। এই পাঁচ হইতে দশ দিনে অনেক দীর্ঘকালও হইতে পারে। নায়ক-নায়িকার সুদীর্ঘ জীবনকালের অকিঞ্চিৎকর ঘটনাবলীর দ্বারা নাটকের কলেবর অযথা বর্দ্ধিত করিয়া সভ্যগণের বিরক্তি উৎপাদন করা নিষ্ফল। মহনীয় চরিত্রের, পবিত্র চরিত্রের অভিনয় দ্বারা সভ্যগণের চিত্তে সত্য, ঔদার্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্যাদির বিকাশ ও কলুষিত স্বভাব পাপিগণের নিন্দিত কার্য্যের কুফল ভোগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনে পাপের বিভীষিকা উৎপাদন ও পাপপথ হইতে নিবৃত্ত থাকার প্রবৃত্তি আনয়ন ও পাপের অন্ধতামিস্রের নিকট পুণ্যের দেদীপ্যমান চিত্রের সমধিক ঔজ্জ্বল্য বিধান নাটককারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ নায়ক ও প্রতিনায়কের জীবনের কয়েকটি দিন—পাঁচ হইতে দশ—কি পর্য্যাপ্ত নহে? সুতরাং কাল সম্বন্ধে ভারতীয় নাটকের ব্যবস্থা আমরা অযৌক্তিক মনে করি না।

কোন পাশ্চাত্য সমালোচক বলিয়াছেন, যে 'ভারতীয় নাটকে' দেশের সমত্ব unity of place বলিয়া একটি পদার্থ অজ্ঞাত। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, দৃশ্য পটের অভাবনিবন্ধন এরূপ ঘটিয়াছে। যথা—

দেশ ঘটিত সমত্ব

"Unity of place is unknown to the Hindoo drama by reason of the absence of scenery".

সমালোচকের তাৎপর্য্য এই যে, দৃশ্যপট যখন ছিল না, তখন ঘটনার স্থান সম্বন্ধে বিবেচনা করার আবশ্যক ছিল না, যে কোন স্থানে সংঘটিত ঘটনাবলী উপস্থিত করা যাইত, আর দৃশ্য-পট থাকিলে দৃশ্যপটে যে স্থানের চিত্র অঙ্কিত থাকে, সেই স্থানের ঘটনা ভিন্ন অন্য ঘটনা প্রদর্শন অসম্ভব সুতরাং দেশগত সমত্ব অপরিহার্য্য। ভারতীয় নাট্যে দৃশ্যপট ছিল কি না সে বিচারে আপাততঃ প্রবৃত্ত না হইয়া দেশগত সমত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমরা কিছু আলোচনা করিব। পূর্ব্বে কাল-ঘটিত নিয়মাবলী আমরা প্রদর্শন করিয়াছি; এক্ষণে সভ্যগণ অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কাল ও দেশ পরস্পর সাপেক্ষ বস্তু; কালের নিয়মনে দেশ স্বয়ংই নিয়মিত হয়। এক অঙ্কে এক দিনের ঘটনা চিত্রিত হইতে পারে। সুতরাং তদঙ্ক চিত্রিত পাত্রগণ একদিনে যতদূর পর্য্যন্ত গতিবিধি করিতে পারে, তাহাদিগের শক্তি ও স্বভাব অনুসারে তাহারা যে পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে পারে ও নাটকীয় ঘটনা অনুসারে যতদূর সঞ্চরণ করা তাহাদের আবশ্যক হয়, সেই পরিমিত স্থানই তদঙ্কের দেশ। এই কারণে ভারতীয় সূক্ষ্মদর্শী নাট্যসূত্রকারগণ কালঘটিত নিয়ম করিয়া দেশঘটিত বন্ধন অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোথদিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ॥

নায়ক

নাটকের নায়ক বিখ্যাত বংশের রাজর্ষি হইবেন, ধীরোদাত্ত ও প্রতাপশালী হইবেন, অথবা দিব্যপরুষ অর্থাৎ দেবভাবাপন্ন অথবা দেবভাবাপন্ন ব্যক্তি, কিন্তু আপনাতে নিজের মনুষ্য-বুদ্ধি আছে এই প্রকার গুণবান ব্যক্তি নাটকের নায়ক হইবেন। এই প্রকার গুণসম্পন্ন নায়ক (hero) কল্পনা করা একান্ত আবশ্যক। রূপকের মধ্যে নাটক প্রধান তাহা লোকশিক্ষার উপযোগী করিতে হইলে গুণসম্পন্ন নায়ক ব্যতীত কখনই হইতে পারে না।

রস নাটকে শৃঙ্গার অথবা বীররস অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান হইবে, অন্যান্য সকল রসই থাকিবে ও অদ্ভুত রসে উপসংহার হইবে—এই প্রকার অনুশাসন আছে। আপাত দৃষ্টিতে এই অনু-শাসন অনর্থক বলিয়া বোধ হইতে পারে। নাটকীয় চরিত্র-চিত্রণে

রস

যে রসের স্ফুরণ হয় হউক, প্রথমেই এত বাঁধা বাঁধির আবশ্যক কি এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রসিদ্ধ নাটকসমূহ সমালোচনা করিয়া যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাই সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রূপক সমূহের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। নাটককে রূপক সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে; নাটকের এই শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য, নাটকের নায়কের চরিত্র রক্ষার জন্য নাটকের প্রধান রস শৃঙ্গার বা বীর স্বীকার করা হইয়াছে; অন্য রস প্রধান হইলে কখনই ঐ শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষিত হয় না।

রস নয়টি—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। এই রস-গুলির বাচক শব্দদ্বারাই সামান্যত তত্তৎ রসের কিছু স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের

সমালোচ্য বিষয় সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে রসগুলির বিশেষরূপ স্বাদ লওয়া আবশ্যক; তজ্জন্য প্রথমতঃ রসগুলির আর একটু পরিচয়ের সুবিধা করা যাইতেছে।

শৃঙ্গার রস সকল রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই রস জগতের নিয়ন্তা ও প্রবর্ত্তক। সুতরাং ইহার নামান্তর আদিরস বা আদ্যরস। এই রসের স্থায়ীভাব অনুরাগ। এই শ্রেষ্ঠ রস আজকাল কুসংস্কারবশতঃ অতি জঘন্য ভদ্রসমাজে অবক্তব্য বস্তু বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। বস্তুতঃ আদিরস তাহা নহে; এ প্রবন্ধে রসসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করার অবসর নাই, কেবল সংক্ষেপতঃ স্থায়ীভাব গুলির উল্লেখ করিয়া মূল বিষয়ে আসিতেছি। হাস্যরসের স্থায়ীভাব হাস, করুণ রসে শোক, রৌদ্ররসে ক্রোধ, বীররসে উৎসাহ, ভয়ানকে ভয়, বীভৎসে ঘৃণা অদ্ভুতে বিস্ময় ও শান্ত রসে শম স্থায়ীভাব।

এক্ষণে আপনারা দেখুন যে, হাস্যরসে স্থায়ীভাব হাস; হাস পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত বা শোকার্ত্ত মানবের তাৎকালিক ক্ষণিক বিশ্রান্তি বা ভাবশূন্য ভাবান্তর আনয়ন করিতে পারে, তদ্দ্বারা জগতের বিশেষ কিছু ইষ্ট সাধিত হয় না বা হাস্য একটি অভিলষণীয় ও প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া গণনীয় হইবারও যোগ্য নহে। করুণরসে শোক স্থায়ীভাব, শোক জগতের একটি অপরিহার্য্য অবশ্যম্ভাবী বস্তু, কিন্তু কখনই বাঞ্ছনীয় পদার্থ নহে। রৌদ্র রসের স্থায়ীভাব ক্রোধ, কখনই প্রশংসার্হ নহে; ভয়ানক রসের ভয় অতিশয় হেয় সামগ্রী; বীভৎসের ঘৃণা একান্ত ঘৃণ্য; অদ্ভুতের বিস্ময় বিশেষ কোন ফলোৎপাদক নহে; বিস্মিতের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা অনুকরণ যোগ্য আদরণীয় দ্রব্য নহে। শান্তগুণের স্থায়ীভাব শম, শোকতাপ-বিজড়িত নিয়ত কোলাহলের মধ্যগত নশ্বর পৃথিবীতে অপূর্ব্ব শান্তির কারণ ও অভীপ্সিত পদার্থ হইলেও কার্য্যশীল জনগণের নিকট তাহার স্থান তত উচ্চ নহে; সুতরাং কর্ম্মময় জীবনের সজীবতা শান্তরসে দুর্ল্ভ। তবেই আমরা দেখিতেছি যে হাস্য, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত রস কর্ম্মময় জীবনের উচ্চ আদর্শের বিষয়ীভূত রস নহে; তাই এই সকল রসকে উপেক্ষা করিয়া শৃঙ্গার ও বীররসকে নাটকের অঙ্গরসরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

অদ্ভুত রসে নাটকের পরিসমাপ্তির অনুশাসনসম্বন্ধে এক্ষণে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। নাটকের সমুদয় রসের মূলে অদ্ভুতরস বর্ত্তমান থাকে। করুণ রসের স্থায়ীভাব শোক; রৌদ্ররসের স্থায়ীভাব ক্রোধ, এই প্রকার বীভৎসের ঘৃণা কখনই লোকের বাঞ্ছনীয় পদার্থ নহে; শোকের দৃশ্য দেখিলে আমরা কত বিলাপ করি, শোকাপনোদনের চেষ্টা করি অথবা তদ্দৃশ্য পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করি; ক্রুদ্ধ জনগণকে দর্শন করিলে অথবা ঘৃণ্য পদার্থ দেখিলে সহৃদয় জনগণমাত্রই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন, কিন্তু নাট্যমঞ্চে এই সকল দৃশ্য অবতারিত হইলে দর্শকবৃন্দের সে বিরক্তি থাকে না, সে দৃশ্য পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় না, বরং অভিনয়ের উৎকর্ষের সহিত পুনঃপুনঃ দেখিবার ইচ্ছা হয়। তবে নাট্যমঞ্চে করুণরসাত্মক অভিনয় দর্শনে রসজ্ঞ শ্রোতার অশ্রুপাতাদি হয়, তাহা বস্তুতঃ শোকাশ্রু নহে, উহা যদি শোকাশ্রু হইত তবে অর্থব্যয় করিয়া রাত্রিজাগরণ দ্বারা শোক-ভোগের জন্য লোকে লালায়িত

হইত না। এই শোকের মূলে অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুতরস বর্ত্তমান আছে; এই অদ্ভুত রস নাটকীয় সর্ব্বরসের পরিণতি। নাটকীয় পাত্রের শৃঙ্গারাদি রস সভ্যগণের নিকট অদ্ভুত পরিণতি-বিশিষ্ট হইয়া উপনীত হয়।

উপসংহারে যে অদ্ভুত রসের অবতারণা করিতে বলা হইয়াছে, তাহা পাত্রগত অদ্ভুত, সমুদয় রসের পরিণতি যে অদ্ভুত, তাহা নহে। নাটকীয় সমুদয় রসের পরিণতি অদ্ভুতে। এই জন্যই অদ্ভুত রসটিকে চরম সন্ধিতে উপস্থিত করিতে বলা হইয়াছে।

অঙ্কমধ্যে দূর হইতে আহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্য-দেশাদি-বিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, অভিশাপ, দান, নৃত্য, রতিক্রিয়া, দন্তাঘাত, নখাঘাত ও অন্য লজ্জাকর কার্য্য, শয়ন, অধরপানাদি, নগরাদির অবরোধ, স্নান, অনুলেপন ইত্যাদি স্থান পাইতে পারে না; এই সকল কার্য্যের অভিনয় হইবে না, নাটকের আখ্যায়িকার সঙ্গতির জন্য এই সকল আবশ্যক হইলে বিষ্কম্ভক, প্রবেশক আদি দ্বারা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই সকল কার্য্যের অনেকগুলি লজ্জাজনক বলিয়া সহৃদয়গণের রুচিবিরুদ্ধ জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইয়াছে; কতিপয় স্থলে অন্যবিধ কারণ আছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আধুনিক রঙ্গমঞ্চে এই নিষিদ্ধ কার্য্যগুলির মধ্যে অনেকগুলি অভিনীত হয় ও রুচি-অনুসারে অনেকের প্রীতিকর হয় বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতীয় সূত্রকারগণের নিষেধ অকারণ নহে।

দূর হইতে আহ্বানের যথাযথ অনুকরণ অল্পমাণবিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে যে একান্ত বিসদৃশ ও তাদৃশ চীৎকার কিয়ৎ পরিমাণে সুরুচিরও অনুমত নহে, ইহা বলা বাহুল্য। বধের দৃশ্যও সাধু ও সুকুমার জনগণের রুচি-বিগর্হিত। যুদ্ধের দৃশ্য অভিনয়স্থলে উপনীত করা একান্ত বিড়ম্বনা; রণস্থলের ভীষণ দৃশ্য, যোদ্ধৃপুরুষগণের উৎসাহ, যোধগণের বীরদর্প বর্ত্তমান কালের যুদ্ধাভিনয় দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হয়। এই অংশ আহার্য্য ও আঙ্গিক অভিনয়ের অন্তর্গত। এতৎ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে আমরা করিব না। পাঠ্য প্রবন্ধে প্রধানতঃ বাচিক অংশের কথাই বিবৃত হইতেছে। সংক্ষেপতঃ বাচিক অভিনয়ের বীররস একান্ত কৃত্রিম যুদ্ধানুকরণ দ্বারা হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। অন্যান্য নিষেধগুলির সার্থকতাও চিন্তা করিলে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইদানীন্তন কালে আহার্য্য অভিনয়ের প্রতি অতিমাত্র অনুরাগবশতঃ মূল বাচিক অংশের গাম্ভীর্য্যাদি অনেক সময় একেবারে উপেক্ষিত হয়।

এতক্ষণ আমরা যে সকল কথা বলিলাম, এই সকল বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাট্যশাস্ত্রে অল্প বিস্তর সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে আমরা যে বিষয়ের প্রস্তাবনা করিতেছি এইখানে পাশ্চাত্য নাট্যে ও ভারতীয় নাট্যে ঘোর বৈষম্য। যেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে দ্বৈধ, সেখানে প্রতীচ্য মত যে অধুনা সমধিক আদরণীয় হইবে, ইহা বলা বাহুল্য; কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, দেশীয় শাস্ত্রের মত সম্যক্ রূপে আলোচনা না করিয়া কেবল গড্ডলিকা-প্রবাহের অনুকরণে দেশীয় যুক্তিযুক্ত মত উপেক্ষা করা হয়। পাশ্চাত্য দেশে কতকগুলি নাটককে (Tragedy)

বলে, কতকগুলিকে Comedy বলে। অধুনা এই দুই শব্দের অনুবাদ যথাক্রমে বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত শব্দ দ্বারা সাধিত হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্বতঃ বলিতে গেলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিয়োগ ও মিলনের সহিত tragedy ও comedyর বিশেষ সম্বন্ধ নাই। যাহা হউক বিয়োগান্ত নাটককেই আমরা tragedy বলিয়া ধরিয়া লইলাম। আমাদের দেশীয় প্রাচীন নাট্য-শাস্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাঁহাদের মতে বিয়োগান্ত নাটক হয় না, এই নিয়ম ঘোর অস্বাভাবিক ও নাট্যশাস্ত্রের উন্নতির বিরোধী। পাশ্চাত্য কোন সমালোচক ভারতীয় নাটক বিয়োগান্ত না হইবার কারণ-নির্দ্দেশে তৎপর হইয়া বলিয়াছেন, "In accordance with the childlike element of their character, the Hindus dislike an unhappy ending to any story and a positive rule accordingly prohibits a fatal conclusion in their drama." উক্তির তাৎপর্য্য,-হিন্দুগণ তাহাদিগের চরিত্রের বালস্বভাব-সুলভ উপাদানের বশবর্ত্তী হইয়া কোন উপাখ্যানের অসুখজনক পরিণাম ভালবাসেন না, সুতরাং তাঁহাদের নাটক বিয়োগান্ত না হয়, এই ভাবের স্পষ্ট সূত্র করা হইয়াছে।

নাটকের নায়ক বা নায়িকার বিয়োগ শাস্ত্রসম্মত নহে, কিন্তু অপর পাত্রের মরণ বা বধ নিষিদ্ধ নহে, তবে রঙ্গমঞ্চে সেই বধ প্রদর্শিত হয় না, এই মাত্র। এই বিয়োগনিষেধ কখনই বালস্বভাব-সুলভ নহে। ভারতীয়গণের হৃদয়ের বল সর্ব্বজন-বিদিত। কঠোর সন্ন্যাস যাঁহাদের অন্যতম ধর্ম্মমার্গ, যে দেশে কর্ণ অতিথির প্রীতির জন্য স্বহস্তে স্বীয় পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছেন, এই প্রকার আরও অনেকানেক প্রকৃত ভীষণ কার্য্য যে দেশের লোক অবলীলায় সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা যে বালস্বভাব-সুলভ চরিত্র-বশগ হইয়া অপ্রকৃত কাল্পনিক মৃত্যুর দৃশ্যের ভয়ে নাটকীয় নায়কনায়িকার বধ বা মৃত্যুর প্রতিষেধ করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনার প্রতিকূল যুক্তির অবতারণা করা বিড়ম্বনা মাত্র; কিন্তু আমরা যখন অভিযুক্ত, তখন অভিযোগের ক্ষালন না হইলে ভারতীয় নাট্যের এই অপরাধে, নির্ব্বাসনদণ্ডের ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব নহে, তজ্জন্য আমরা প্রত্যুত্তরে সভ্যসমাজে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সংসারের প্রকৃত ঘটনাবলী দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক স্থলে ঘটনাবলী দুঃখময় পরিণতি প্রাপ্ত হয়, সুখদুঃখ-বিজৃম্ভিত ধরণীমণ্ডলে জীবনের বিষাদময়ী পরিণতি অস্বাভাবিক নহে--পরং স্বাভাবিক। কিন্তু নাটকের নায়কের জীবনের তাদৃশ পরিণতি যে একান্ত আবশ্যক ইহা স্বীকার করা যায় না, বরং নায়ক যদি স্বীয় জীবনের দুঃখময় পরিণামকে সুখময় করিতে সমর্থ হন, তবে সেই উদ্যম ও উৎসাহ অপরের অনুকরণীয় হইতে পারে ও তদ্দ্বারা জগতের হিত হইতে পারে; সুতরাং যাহাতে নায়ক সংসারের ভীম আবর্ত্তে পতিত হইয়া ঈশ্বর-বিশ্বাস, আত্ম নির্ভর, উদ্যম, অধ্যবসায়, ধর্ম্মপ্রাণতা ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলীর সাহায্যে আত্মত্রাণে সমর্থ হন, নাটকের কবির সেই সকল উপায় উদ্ভাবন করাই কর্ত্তব্য এবং তদ্দ্বারা লোকশিক্ষার পথও বিস্তৃত হইতে পারে; নচেৎ অকিঞ্চিৎকর কারণে, ক্ষণিক যন্ত্রণায়, অথবা উৎকট লালসার

অতৃপ্তিতে নায়ক বা নায়িকা যদি আত্মহত্যা সাধন করে, অথবা প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ হইয়া নায়ক বা নায়িকা তাহার সুতীক্ষ্ণ করবালের তীব্র ধারাতে আত্মবলি দেয়, অথবা কূটনীতি শত্রু-প্রেরিত ঘাতকের গুপ্ত ছুরিকা তাহাদের জীবলীলার বিরাম দেয়, তাদৃশ হতভাগ্যগণের জীবন যথাযথভাবে চিত্রিত হইয়া নাট্যমঞ্চে উপস্থাপিত করায় কোন সুফল হয় না—বরং বিষময় ফল হওয়া অসম্ভব নহে। সংসারে এই প্রকার দৃশ্য অনেক দেখা যায় সত্য, সেই সকল দৃশ্য যথাযথ চিত্রিত না করিয়া নায়কের চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রোঞ্ছিত করিয়া উজ্জ্বল চরিত্র লোক-সমক্ষে ধারণ করাই নাটককারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, যথাযথ ঘটনার চিত্র—নাটক নহে। প্রকৃত ঘটনার অপলাপ ও অপ্রকৃত আবশ্যকীয় ঘটনার যোজনা দ্বারা আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করাই নাটকের উচ্চ আদর্শ।

অনেক যত্ন করিয়া কবি যাহার জীবন গঠন করিলেন, প্রণয়িনীর বিরহাশঙ্কায় তীব্র হলাহল দ্বারা তাহার জীবন নাশ করাইলে কবির কৃতিত্ব কি, তদ্দ্বারা জগতেরই বা কি শিক্ষা হইল। যদি বলেন যে, ইহা পবিত্র প্রণয়ের উচ্চ আদর্শ; প্রণয়িনীর বিরহাশঙ্কাবিধুর বিষপূর্ণ পাত্রচুম্বিতাধর নব যুবকের দৃশ্য পবিত্র প্রণয়ের অপূর্ব্ব চিত্র একটি দৃশ্যে প্রেমের প্রগাঢ়তা যতদূর ব্যক্ত হইল, অন্য উপায়ে শত শত চিত্রে সহস্র সহস্র পত্রের বর্ণনা দ্বারা এ প্রগাঢ়তা—প্রেমের এ অপূর্ব্বত্ব ব্যক্ত হইত না। ইহাও যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা জিজ্ঞাসা করি, কবি কি কোন উপায়ে পীতবিষ প্রণয়ীকে রক্ষা করিতে পারিতেন না, তাহাকে রক্ষা করিয়া তাহার প্রণয়িনীর সহিত মিলিত করিয়া দিলে কি প্রেমের ন্যূনতা হইত? নায়কের মৃত্যু হইলে নায়িকাকেও প্রেমের পূর্ণতা প্রকট করিবার জন্য শমন-সদনে প্রেরণ করা হয়—আবশ্যকও বটে, নচেৎ নায়িকার প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান হয় না; কিন্তু এই উপায়ে নায়কনায়িকার মধ্যে যে অগ্রে করাল-কবলে আত্ম সমর্পণ করে, তাহার প্রেম জীবিত নায়ক বা নায়িকা বুঝিতে পারে, কিন্তু পরে যে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, পূর্ব্বে গতাসু নায়ক বা নায়িকা তাহার প্রেমের পূর্ণতা যে এতদূর—যে সে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারে না। বরং যদি এতদবস্থাপন্ন নায়ক ও নায়িকা উভয়কে কোন উপায়ে প্রাপ্তজীবন করা যায়, তখন উভয়েই জানিতে পারে যে, তাহারা একে অন্যের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে ও তখন তাহাদের প্রেমের আরও প্রগাঢ়তা জন্মে ও সেই প্রেম লোকশিক্ষার আদর্শ হয়। আর যদি উভয়ের মরণে প্রেমের পর্য্যবসান হয়, তবে তাহা দ্বারা জগতের কি?

প্রেমের পূর্ণত্ব মিলনে—অপূর্ব্ব প্রেমের ছবি গঠন করিয়া তাহাদের মিলনের সহায় না হইয়া অর্থাৎ কার্য্যটি সম্পূর্ণ না করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমোদ উপভোগ করাই বরং আমাদের মতে 'বালস্বভাব-সুলভ চপলতার ফল'।

পক্ষান্তরে প্রত্যেক কার্য্যের যে পঞ্চ অবস্থা কল্পিত হইয়াছে, তদনুসারেও কার্য্যের পরিণত অবস্থা বা শেষ বলিলে নায়ক-নায়িকার মিলন প্রেমের পরিণত অবস্থা বা শেষ বলিয়া গ্রহণ

করা যাইতে পারে, কিন্তু একতরের বিয়োগ হইলে তাহাকে প্রেমের সম্পূর্ণতা বলা যায় না, সুতরাং অন্যতরের বিয়োগ চিত্রিত হইলে নাটকের সম্পূর্ণতা রক্ষা হয়।

পূর্ব্বে আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি যে, নাটকের অঙ্গ বা প্রধান রস শৃঙ্গার বা বীর হওয়া আবশ্যক; এক্ষণে সভ্য মহোদয়গণ বিবেচনা করুণ, নায়কনায়িকার অন্যতরের বিয়োগ চিত্রিত হইলে তখন শৃঙ্গার ও বীর করুণ রসে পরিণত হয়, তদ্দ্বারা নাটকের প্রতিপাদ্য প্রধান রসের আস্বাদের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং নায়কনায়িকার বিয়োগ-চিত্রন নাটকে যুক্তিযুক্ত হয় না বলিয়াই সূক্ষ্মদর্শী ভারতীয় পণ্ডিতগণ তদ্‌বিষয়ে প্রতিষেধ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রের বালভাব-নিবন্ধন এ নিষেধ উপস্থিত হয় নাই।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং আঙ্গিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না।

যে সকল বিষয় আমরা বলিয়াছি, তাহাও প্রবন্ধকলেবর-পুষ্টির ভয়ে সবিস্তার বলিতে পারি নাই, তবে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা হইতে যদি সভ্যমহোদয়গণ বুঝিয়া থাকেন যে, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র অকিঞ্চিৎকর বিশৃঙ্খল কল্পনাপ্রসূত নহে, বরং সুপ্রণালীসিদ্ধ যুক্তি-মূলক শাস্ত্র, তাহা হইলে আমরা পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ করিব।

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী

ঢাকার মসলীন।

একটি লুপ্ত শিল্প!

এই সাহিত্য-পরিষদের গত বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে জনৈক বক্তা ঢাকাই মসলিনের জগৎব্যাপী খ্যাতি ও উহাতে ব্যবহৃত তন্তুসমুদয়ের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই অধুনা-বিস্মৃত শিল্পটির প্রতি আমার প্রীতি অগাধ এবং উহার তথ্য-সংগ্রহেও আমার উৎসাহ অসামান্য; তজ্জন্যই উক্ত বিষয়ের কয়েকটি তথ্য নিম্নে বিবৃত করিতেছি, আশা করি, ইহা পরিষদের সভ্যগণের কৌতূহল-প্রদ ও রুচিকর হইবে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইংলিসম্যান পত্রের কোন রবিবাসরীয় সংস্করণে ঢাকাই মসলিন সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ঐ প্রবন্ধ হইতে অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। ঢাকা বহুকাল হইতেই মসলিনের জন্য প্রসিদ্ধ। ঢাকাই মসলিনের লূতাতন্তুসুলভ স্বচ্ছত্ব, প্রকৃষ্ট সূক্ষ্মত্ব এবং বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সুদূর অতীত যুগের বস্ত্রশিল্প-বিশেষজ্ঞগণের নিকট সমাদৃত হইত। রোমদেশ যখন

সমৃদ্ধির শিখরে অবস্থিত ছিল, তখন মসলিন রোমক-মহিলাদের বিলাসোপকরণরূপে পরিগণিত হইত, ইতিহাস এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। ঢাকার ইতিহাসকার টেলার সাহেব মনে করেন যে, বাঙ্গালার মসলিন যে কার্পাস নামে অভিহিত হয়, ঐ শব্দটি সংস্কৃত "কার্পাস" এবং হিন্দি 'কাপাস' শব্দ হইতে উদ্ধৃত। প্লিনির সময়ে "কার্পাসিয়াম" বা "কার্পাসিয়ান" বলিতে সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্ম তন্তুজাত বস্ত্রকেই বুঝাইত।

প্লিনি কার্পাসবয়ন-শিল্পের যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, এক সময়ে ঢাকা বঙ্গদেশের মধ্যে উক্ত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এক দিকে চীন, অপর দিকে তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া এবং পারস্য দেশের সহিত এই বাণিজ্য চলিত। ইহার কিছুদিন পর প্রভেন্স, ইটালী, ল্যাংগুইডক্ এবং স্পেন দেশেও ঢাকার মসলিন প্রেরিত হইত। ঢাকার ইতিবৃত্তে মসলিন-বিবরণে টেলার সাহেব নবম শতাব্দীর দুই জন মুসলমান পরিব্রাজকের লিখিত "চীন ও ভারতের সংবাদ" নামক গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের অনু-বাদক আবিব তিওইছারাৎ। ভারতবর্ষের কার্পাসবস্ত্র সম্বন্ধে ঐ পুস্তকে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পুস্তক-লিখিত অন্যান্য ঘটনাবলীর সমবায়ে উহা যে ঢাকাই মসলিন উপলক্ষ করিয়াই লিখিত, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত মুসলমানপরিব্রাজকদ্বয় বলিয়াছেন, "সেই দেশের লোক এমন আশ্চর্য্য কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করে যে, তাহার তুলনা অন্য কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এই বস্ত্রগুলি গোলাকারে রক্ষিত এবং এরূপ সূক্ষ্মভাবে বয়িত যে মাঝারি আকারের একটি অঙ্গুরীয়কের মধ্য দিয়া টানিয়া বাহির করা যায়।"

মসলিনের সূক্ষ্মতা ও উৎকর্ষজ্ঞাপক অসংখ্য গল্প কথিত হইয়া থাকে। ট্রেভারনিয়ার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, "পারস্যরাজের ভারতীয় দূত মহম্মদ আলিবেগ ভারত হইতে পারস্যে ফিরিয়া আসিয়া বাদসাহ দ্বিতীয় চাসেফিকে বহুমূল্য প্রস্তরখচিত অষ্ট্রীচ্ পক্ষীর ডিম্বাকৃতি একটি ক্ষুদ্র নারিকেল উপহার দিয়াছিলেন। যখন নারিকেল ভাঙ্গা হইল, তখন তাহার মধ্য হইতে ষষ্টি হস্তপরিমিত দীর্ঘ মসলিনের পাগড়ীর কাপড় বাহির হইল, উহা এমন সূক্ষ্ম যে হাতে রাখিয়াও সঠিক জানা যায় না যে, কি হাতে রহিয়াছে।"

"প্রাচীন এবং মধ্য যুগের ভারতবর্ষ" নামক গ্রন্থে মিসেস ম্যানিং লিখিয়াছেন যে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্বকালে জনৈক তন্তুবায়ের গাভী শষ্পোপরি প্রসারিত এক খণ্ড মসলিন বস্ত্র খাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া ঢাকা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। ঐ প্রকার মসলিন আবি-রাওয়ান বা প্রবহমান সলিল নামে অভিহিত হইত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক খাফি খাঁর গ্রন্থ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অলোকসামান্যা রূপবতী নুরজাহান বেগম ঢাকাই মসলিনের প্রতি এত অনুরক্তা ছিলেন যে, তৎকালে তাঁহার জন্য দীল্লী-দরবারে এবং দীল্লীর সংস্রবযুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রীয় নগরীতে ঢাকাই মসলিন বিশেষ আদরের সমগ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। সূক্ষ্মত্বগুণে উৎকৃষ্ট-তম মসলিন সমস্তই বাদসাহ-অন্তঃপুরচারিণীগণের ব্যবহারেই পর্য্যাপ্ত হইত। অন্য কেহ তাহা ব্যবহার করিতে পারিত না।

নিম্নে বর্ণিত গল্পটি ভারতবর্ষে সুপরিজ্ঞাত। অবশ্য ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতে আমি অপারগ, কিন্তু ইহা দ্বারা ঢাকাই মসলিনের অসাধারণ সূক্ষ্মতাবিষয়ে সুন্দর ধারণা জন্মিতে পারিবে।

সাহিত্যক্ষেত্রে কবিতা-রচয়িত্রী বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিতা সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের রূপবতী কন্যা কুমারী জেব উন্নিসা একদা মসলিন-পরিহিতা হইয়া পিতৃ-সমীপবর্ত্তিনী হইলে কঠোর "পিউরিটান" নীতি-পন্থাবলম্বী সম্রাট্ কন্যাকে অন্তঃপুরচারিণীগণের নীতিবিগর্হিত স্ত্রীজনোচিত লজ্জাশীলতা বিষয়ে ঔদাসীন্য হেতু ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। জেব উন্নিসা ইহাতে দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি কাপড় সত্তর ভাঁজ করিয়া পরিধান করিয়াছেন। পারস্য-কবি সিরাজকুঞ্জ-কোকিল হাফেজকে ভারতবর্ষে আগমন করিবার জন্য গায়সউদ্দীন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বহুমূল্য উপহারের সহিত কয়েকখানি মসলিনবস্ত্রও তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ঢাকাই মসলিন যে তৎকালে কি আদরের জিনিস ছিল, ইহা হইতেই তাহা অনুমিত হইবে। সেই উপহার-প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কবিবর তাঁহার লোকবিশ্রুত গজল রচনা করিয়া বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত গজলে কবি বলিয়াছেন যে, পারস্যের এই শর্করা (গজল) ভারতের তোতাপাখীদিগের কণ্ঠ মধুময় করিবে।

আলঙ্কারিক ভাষায় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করা প্রাচ্য দেশবাসীর চিরন্তন প্রথা। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ঢাকাই মসলিনের এই জন্য নানা আলঙ্কারিক নাম ছিল, যথা—"আবি-রাওয়ান" বা প্রবহমান সলিল। "সাব্‌নাম" বা সান্ধ্য শিশির, কারণ জলসিক্ত হইলে উহা শিশির হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুমান হয় না। "জামদানী" ফুল দেওয়া মসলিন। "মালওয়াল খাস" অর্থাৎ রাজবস্ত্র। ডাক্তার টেলার সাহেবের সময়ে বিদেশীয় অল্প মূল্যের বস্ত্রে ভারত প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং মসলিন তখন মৃত্যুর কবলবদ্ধ; সে সময়েও ছত্রিশ প্রকারের মসলিন ঢাকায় প্রস্তুত হইত। টেলার ক্লে এবং অন্যান্য লেখকগণ প্রাচীন কালে তন্তুবায়গণ যে সমস্ত যন্ত্রাদি ব্যবহার করিত, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। "আবি-রাওয়ান" প্রস্তুত করিতে ১২৬ প্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন হইত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশখণ্ড সূত্রে গ্রথিত করিয়া সেই সমস্ত সরল যন্ত্র প্রস্তুত হইত। বর্ষাকালই সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়নের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সময় বলিয়া বোধ হয়। অষ্টাদশবর্ষীয়া হইতে ত্রিংশবর্ষীয়া হিন্দু স্ত্রীলোকগণই সূক্ষ্মতন্তু নির্ম্মাণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা পটু বলিয়া বিবেচিত হইত। ত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলেই তাহারা কর্ম্মে অনুপযুক্ত হইত। চত্বারিংশ বর্ষ বয়সে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি এতদূর খারাপ হইয়া পড়িত যে, তাহারা আদৌ মিহি সূতা কাটিতে পারিত না। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালেই তাহারা কার্য্য করিত, কারণ ঐ সময়ে বায়ু স্বভাবতঃই সিক্ত থাকে, এবং আলোকরশ্মি চক্ষুর কোন অপকার সাধন করে না। ১৮৫১ অব্দের বিরাট প্রদর্শনীতে ঢাকা হইতে আনীত এক অদ্ভুত চরকা প্রদর্শিত হইয়াছিল। কতকগুলি বক্র কাষ্ঠখণ্ড সূতা দিয়া বাধিয়া ঐ চরকাটি প্রস্তুত হইয়াছিল। উহার দ্বারা কি প্রকারে যে মসলিনের সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ সূত্র প্রস্তুত হইত, তাহা স্থির করা সুকঠিন। ১৮৩৬ অব্দে ডাঃ ইউর লিখিয়াছেন, ইউরোপ-

বাসিগণের প্রতিভা যে প্রকার সূত্র নির্ম্মাণ করিতে অক্ষম, তাদৃশ সূত্র ঢাকায় তখনও প্রস্তুত ও মসলিন বয়িত হইত। কি কৌশলে যে ঐ প্রকার চরকা ও মাকুদ্বারা তাদৃশ সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে, লেখক তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৮৩৭ অব্দে বয়িত একখণ্ড উৎকৃষ্ট মসলিন ডাঃ টেলার সাহেবের নিকট ছিল, তিনি লিখিয়াছেন বিশেষ সতর্কতা সহকারে উহা পরিমাণ করিয়া ২০০ শত গজ দীর্ঘ সেই কাপড়খানি ওজনে ৫ গ্রেণ মাত্র হয়। মসলিনের প্রশংসা করিতে গিয়া উক্ত ডাক্তার বলিয়াছেন যে, "পুরুষ-পরম্পরাক্রমে মসলিন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং বর্ত্তমান দিনে বিলাতে বস্ত্রবয়নশিল্প অশেষ উন্নতি লাভ করা সত্ত্বেও মসলিনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে এমত বস্ত্র অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই। সৌন্দর্য্য, স্বচ্ছত্ব, সূক্ষ্মত্বাদি গুণে পৃথিবীর যত প্রকার বয়নযন্ত্র আছে, তাহার নির্ম্মিত বস্ত্র অপেক্ষা ঢাকার মসলিন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মসলিনের সূক্ষ্মতর বস্ত্রগুলি স্বদেশী কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত করা হইত। ঐ প্রকার কার্পাস নিউ অর্লিন্‌স্ এর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। উহার আজ কাল ক্রেতার অভাব, এ জন্য ঐ কার্পাসের চাষও বন্ধ হইয়াছে। মিঃ ক্লে তৎপ্রণীত ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ১৮৬৭ অব্দে মসলিনের উৎপত্তি এত কমিয়া গিয়াছিল যে, বিশেষ আদেশ ব্যতীত ভাল মসলিন প্রস্তুত করাই হইত না।

১৮৫১ অব্দের প্রদর্শনীর বিবরণে অধ্যাপক কুপার সাহেব লিখিয়াছেন যে ইউরোপ প্রভৃতি দেশ হইতে প্রদর্শিত যাবতীয় বস্ত্র অপেক্ষা ঢাকার মসলিন অনেক উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ১৮৬২ অব্দের প্রদর্শনীতেও ঢাকাই তাঁতের উৎপন্ন দ্রব্যাদি "শিল্পের জয়চিহ্ন" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ভারতীয় সাইক্লোপিডিয়া নামক গ্রন্থ-প্রণেতা সার্জ্জন জেনেরাল এডওয়ার্ড বালফোর বলেন যে, ১৮৫১ অব্দের প্রদর্শনীর জন্য উত্তম ঢাকাই মসলিন সংগ্রহ করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং ১৮৬২ অব্দে উক্ত প্রকার উৎকৃষ্ট মসলিন প্রস্তুত করিতে পারে এমত শিল্পী এক ঘর মাত্র ছিল। লণ্ডনের শিল্পাগারে ২০ গজ দীর্ঘ ও ১ গজ প্রস্থ বস্ত্র রক্ষিত ছিল, তাহার ওজন ৭½ অউন্স মাত্র। বয়ন শিল্প (textile manufactures) নামক গ্রন্থের লেখক ডাঃ এফ, ওয়াটসন্ ঢাকাই কাপড়ের সহিত ইউরোপেরও অন্যান্য দেশের বস্ত্রের তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ঢাকার দ্রব্যগুলি অন্যান্য সমস্ত কাপড় অপেক্ষা অনেক উত্তম। বিশেষতঃ ঢাকায় সূত্র পাকাইয়া বয়িত হয় বলিয়া তন্নির্ম্মিত বস্ত্রাদি অধিকতর স্থায়ী হয়। ১৭৭৬ অব্দে মসলিনের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, এক একখানি বস্ত্র ৬০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইত। মিঃ ক্লে বলেন যে, জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে একখানি "আবি-রাঁওয়ান" ৪০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইত। মিসেস ম্যানিং লিখিয়াছেন যে, আওরঙ্গজেব বাদসাহের জন্য প্রস্তুত এক একখানি বস্ত্র ৩১ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইত। ১৯০৫ অব্দের ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের সংস্করণ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল। পুরাকালে ঢাকা ও শান্তিপুর সূক্ষ্ম মসলিনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই

মসলিন ইউরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্স্ দেশে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হইত। ১৮১৭ অব্দে কেবল ঢাকা হইতেই ১৫২০০০০০ এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ টাকার মসলিন রপ্তানী হইয়াছিল। ভারত-নির্ম্মিত সাধারণ বস্ত্রেরও ইউরোপে যথেষ্ট কাটতি হইত। ১৭০৬ অব্দে তন্তুবায়দিগকে কলিকাতার সন্নিহিত পল্লীতে বসবাস করাইবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। ইউরোপে যন্ত্রবয়ন-শিল্পের উদ্ভাবনা দ্বারা কেবল যে ভারতের রপ্তানী বিনষ্ট হইয়াছে, এমত নহে, এ দেশ অল্প মূল্য বস্ত্রে ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে স্থানীয় শিল্পের যথেষ্ট সঙ্কোচ সাধিত হইয়াছে। দেশী বস্ত্র অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং সুদূর পল্লীতে তন্তুবায়গণ এখনও জাতীয় ব্যবসায় চালাইয়া থাকে, এই ভাবে গৃহজাত শিল্পের আকারে বস্ত্র বয়ন এখনও চলিতেছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে আর ঐ শিল্পের অস্তিত্ব দেখা যায় না। যে সমস্ত তন্তুবায় ঐ প্রকার ব্যবসায় করে তাহারাও বিদেশনির্ম্মিত সূত্র দ্বারা বস্ত্র বয়ন করে মাত্র।

পরলোক-গত বন্ধু-প্রবর মুনসি রহমন আলি তাঁহার তাবারিখ-ই-ঢাকা নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, কাপাসিয়া গ্রামে এবং তৎসন্নিহিত স্থানেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত। উক্ত স্থানের নাম ইহারই প্রমাণ করিতেছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে মনে হইত যে ঢাকার বয়ন-শিল্পের লোপ অবশ্যম্ভাবী। ১৯০৮ অব্দে সিলংএ প্রকাশিত মিঃ জে, এন গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের শিল্পবিষয়ক সরকারি বিবরণে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি মন্তব্য, ঢাকাই মসলিন জগতের সর্ব্বত্র পুনরায় আদৃত হউক এই ইচ্ছা যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের প্রাণে আশার একটি ক্ষীণ রশ্মির উন্মেষ করাইয়া দেয়। উক্ত বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, এই প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান শিল্পটির অধোগমনের বেগ যেন নিবারিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই মৃদু উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। মিঃ কামিং অল্পদিন হইল লিখিয়াছেন, "গত ২ বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপন্ন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি দেখিতেছি যে, প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগের তন্তুবায়গণের ইহাতে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি বহুকাল তাহাদের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা সেই সেই ব্যবসা পুনর্গ্রহণ করিয়াছে।" মিঃ চ্যাটারটন মান্দ্রাজেও ঠিক ইহাই দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি বলেন "হস্ত-পরিচালিত তাঁতের দিকে যে লোকের এত দৃষ্টি পড়িয়াছে, স্বদেশী আন্দোলনই তাহার মূল। নূতন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্যই অনেক হস্তপরিচালিত তাঁতের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।"

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান বস্ত্রবয়ন-শিল্পের কেন্দ্রগুলিতেও যে বয়নশিল্পের পুনরায় প্রচলন পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের কথা।

এ, এফ, এম্, আব্দুল আলি।

"বিদ্যোদয়"-সম্পাদক

৺পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রিমহাশয়ের জীবনী।

বঙ্গের খ্যাতনামা পণ্ডিত ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রি মহাশয় বিগত ২৩ শে অগ্রহায়ণ (১৩২০) পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে সংস্কৃত গদ্য কাব্য অধুনা কর্ণধারবিহীন ; যিনি প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ ব্যাপিয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবায় কায়মনোবাক্যে ব্রতী, যাঁহার সংস্কৃত, ইংরাজী, হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষার অভিজ্ঞতা, কবিত্বশক্তি, নানা শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং চরিত্রের উৎকর্ষ এক জন বাঙ্গালী-বিদ্বেষী ইউরোপীয় পণ্ডিতকে বিমুগ্ধ এবং বাঙ্গালীর প্রতি অনুরক্ত করিয়াছিল, দীর্ঘ দশবর্ষকাল সুদূর পঞ্জাবপ্রদেশে বঙ্গদেশের মহিমা উদ্বোধিত করিয়াছিল, সেই মহাত্মার জীবনকথা বঙ্গদেশের প্রায় কেহই অবগত নহেন। ইহা বাঙ্গালীর অল্প কলঙ্ক নহে।

বিগত ১২৫৫ সালে (শকাব্দা ১৭৭০) জ্যৈষ্ঠমাসে ২৪ পরগণার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ভট্টপল্লী গ্রামে শাস্ত্রিমহাশয়ের জন্ম। তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় প্রসিদ্ধ। পিতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষ ৺নারায়ণ ঠাকুর, তিনি তপঃসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পুরাতন যশোহরসন্নিহিত যমুনাতীরবর্ত্তী ধুলিয়াপুর হইতে প্রত্যহ আসিয়া প্রত্যূষে ভট্টপল্লীগ্রামে গঙ্গাস্নান করিতেন। বর্ত্তমান হালদারগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ নারায়ণঠাকুরের এই প্রকার অলৌকিক সিদ্ধিপ্রভাব-দর্শনে পুলকিত ও চমৎকৃত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নারায়ণ ঠাকুর ধুলিয়াপুর ত্যাগ করিয়া ভট্টপল্লীগ্রামে তাঁহাদের প্রদত্ত স্থানে বাস করেন। ইহা প্রায় আড়াইশত বৎসরের কথা। নারায়ণ ঠাকুর কেবল তপঃসিদ্ধ ছিলেন না, তাঁহার পাণ্ডিত্যও অসামান্য ছিল। তাঁহার সঙ্কলিত "ব্রহ্মসংস্কারমঞ্জরী" যেমন এক দিকে বেদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্রে সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে, অন্য দিকে তৎপ্রণীত "কাব্যপ্রকাশ-টীকা" তাঁহার ললিত সাহিত্যে তেমনি বিচক্ষণতার সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত। নারায়ণঠাকুর পাশ্চাত্য বৈদিক এবং বশিষ্ঠগোত্র, ইঁহার বংশ ভাটপাড়ার ঠাকুরগোষ্ঠীনামে প্রসিদ্ধ। এই বংশ অত্যন্ত বিস্তৃত, ইঁহারা নিরামিষভোজী এবং লক্ষাধিক রাঢ়ীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন শ্রোত্রীয় এবং বংশজাদি ব্রাহ্মণের কুলগুরু। এই বংশের অন্যতম শাখা, চৌবাড়ী বা চৌবাড়ীর ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ। এই শাখার একাধারে তেজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য অধিকতর বিখ্যাত। অন্যতম বাঙ্গালী-কবি সুপণ্ডিত ও সুবক্তা ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি একজন গণ্যমান্য চৌবাড়ীর ঠাকুর। ভট্টপল্লীর প্রধান স্মার্ত্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এবং নৈয়ায়িক ৺যাদবচন্দ্র তর্করত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র। স্মৃতিরত্ন মহাশয় উক্ত ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রিমহাশয়ের পিতা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভক্তিভাজন পণ্ডিত অল্লালভট্টের কুলে শাস্ত্রিমহাশয়ের মাতৃ-

দেবীর জন্ম। অল্লালভট্ট গৌতমগোত্রসম্ভূত সিদ্ধপুরুষ। অল্লালভট্টের অধস্তন নবম পুরুষ ভট্টপল্লীর তদানীন্তন অন্যতম প্রধান স্মার্ত্ত ও তাপস ৺লম্বোদর তর্কবাগীশ শাস্ত্রি-মহাশয়ের মাতামহ। তর্কবাগীশ মহাশয় কবির গান রচনা করিয়া দিতেন। তিনিও এক জন তাৎকালিক বাঙ্গালী-কবি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দচন্দ্র বিদ্যাপঞ্চানন মহাশয় সংস্কৃতে অসামান্য কবিত্বসম্পন্ন। এইরূপ পিতৃমাতৃকুলের কবিত্ব, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং তেজস্বিতা উত্তরাধিকারসূত্রেই শাস্ত্রিমহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রিমহাশয়ের জন্মসময়ে তাঁহার পিতামহ ও মাতামহের সংসারে শিশুসন্তান ছিল না বলিয়া তিনি উভয় কুলেরই বড় আদরের পাত্র হইলেন। বিলাসী পরিবারের আদরে বিলাসে অনুরাগ বাড়িয়া থাকে; বিদ্বৎপরিবারের আদর শিশুর হৃদয়ে বিদ্যানুরাগ বর্দ্ধিত করিল।

আদরের ফলে তিনি শৈশবেই সংস্কৃতাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। ত্রয়োদশবৎসর বয়সে তাঁহার ব্যাকরণপাঠ সমাপ্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুষ্টুপছন্দের সংস্কৃত শ্লোক রচনা ও গুরূপদেশ ব্যতীত হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। ভট্টি, রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্য, অলঙ্কার এবং ছন্দ-শাস্ত্র অধ্যয়নে ও আলোচনায় প্রায় ৪ বৎসর অতীত হইল। সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। ১০ বৎসর তথায় অধ্যয়নের পর তাঁহার পিতৃব্য যাদবচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নূতন চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইলে তিনি তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ৩।৪ বৎসর অতিবাহিত হইল। এই ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার সময়ে তিনি তাঁহার পিতৃদেবের নিকট স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশও মধ্যে মধ্যে গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে তাঁহার জীবন নূতন পথে পরিচালিত হইল। বঙ্গভাষার বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা রায়বাহাদুর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রি-মহাশয়ের পিতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। যাদবচন্দ্রের বাস কাঁঠালপাড়াগ্রামে। কাঁঠালপাড়া ভট্টপল্লীর সংলগ্ন গ্রাম। ছুটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ী আসিলে যাদবচন্দ্রের ভবনে মহাসমারোহ হইত। দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, রামদাস, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যধুরন্ধরগণ ও দুর্গানারায়ণ, রুদ্রনারায়ণ, ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতি রসিক মিত্রগণের সমাগমে কাঁঠালপাড়া উৎসবময় হইত। ধার্ম্মিক যাদবচন্দ্র এই যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। ইহাদের মতি গতি বুঝিতেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি যাদবচন্দ্র কখন কখন শাস্ত্রিমহাশয়ের পিতামহকে আহ্বান করিয়া এই যুবকগণের প্রতি উপদেশ-প্রদানের ব্যবস্থা করিতেন। সে উপদেশ "শুষ্কং কাষ্ঠং" নহে মধুর কোমল ও সরলভাব পরিপূর্ণ। সে উপদেশে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণ অনেক সময়ে বিমুগ্ধ হইতেন। একদিন শাস্ত্রিমহাশয়ের পিতামহ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাদবচন্দ্রের ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেদিনও বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ যুবকগণ বৃদ্ধ পণ্ডিতের উপদেশ শ্রবণ করিলেন এবং তর্কও করিলেন, পরিশেষে পরাস্ত হইলেন বটে, কিন্তু নিজ নিজ ইংরাজি-

অভিজ্ঞতার প্রচ্ছন্ন গর্ব্ব প্রকাশ করিতে ক্রটি করিলেন না। এই দিনের এই ঘটনা হইতেই তেজস্বী শাস্ত্রিমহাশয়ের হৃদয়ে ইংরাজি জানিবার প্রবৃত্তি হইল। কিন্তু ভট্টপল্লীসমাজে তখন ইংরাজিভাষা অধ্যয়ন অত্যন্ত নিন্দিত কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। চৌবাড়ীর ঠাকুর-দিগের মধ্যে তখন একজনও ইংরাজি ভাষা পড়েন নাই। এ অবস্থায় তাঁহার ইংরাজি ভাষাজ্ঞানে প্রবৃত্তি দরিদ্রগণমনোরথের ন্যায় "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে" হইবার সম্ভাবনা হইল। শাস্ত্রিমহাশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ। যতই বিঘ্ন-বিপত্তি থাকুক না কেন, তিনি নিরস্ত হইলেন না। জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন প্রতিভাশালী হুগলী-কলেজের ছাত্রের নিকট ইংরাজি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ইংরাজি শিক্ষার বিনিময়ে জয়গোপালকে তিনি সংস্কৃত পড়াইতেন। এইভাবে গোপনে একবৎসর অধ্যয়ন চলিল। এই সময়ে চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রিমহাশয় অনেক সময়েই উপস্থিত হইতে পারিতেন না। তিনি নিজ শয়নাগারে একাকী ইংরাজিচর্চ্চা করিতেন। তিনি যে ইংরাজি পড়িতেছেন, এ কথা তাঁহার পিতামহ একবৎসর পরে জানিতে পারিয়া আদরের পৌত্রকে তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু "ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রীতপয়েৎ" তিরস্কৃত হইয়াও তিনি অধ্যয়ন হইতে নিরস্ত হইলেন না। তখন দৈবও তাঁহার পুরুষকারের অনুকূল হইলেন। জয়গোপাল যে পল্লীতে থাকিতেন, সেই পল্লীতে কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য নামক এক যুবক বহরমপুর হইতে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি বুদ্ধিমান, ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ ও বঙ্গসাহিত্যে সুনিপুণ লেখক ছিলেন, তাঁহার সহিত শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল, রাজকুমার মুখোপাধ্যায় নামক ইংরাজি-অভিজ্ঞ যুবকের সহিতও তাঁহাদের উভয়ের বন্ধুত্ব হইল। তখন শাস্ত্রিমহাশয় আপনাগারে ইংরাজি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাটীতেই পাঠস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কয়েকজন বিদ্যানুরাগী বন্ধু মিলিয়া এই স্থানে ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা বিশেষভাবে করিতে লাগিলেন, এই আলোচনা অধিকতর বর্দ্ধিত করিবার জন্য কুঞ্জবিহারী ও রাজকুমারের অর্থব্যয়ে ভট্টপল্লীর বর্ত্তমান সর্ব্বপ্রধান জ্যোতিষী সর্ব্বকর্ম্মে সুদক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়ের শিল্পনৈপুণ্যসাহায্যে রাজকুমারের বাটীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল, এবং "মধুকরী" নামে একখানি পত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। শাস্ত্রিমহাশয় তখন ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন।

তিনি "মধুকরীতে" নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন এবং কার্য্যের ব্যপদেশে সর্ব্বদাই রাজকুমারের বহির্ব্বাটীতে থাকিয়া তাঁহার অভিমত পাঠ্যপুস্তকের সম্যক্ আলোচনা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার রামদাস সেনপ্রমুখ কতিপয় তাৎকালিক প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী মধুকরীর প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু একবৎসরের অধিক মধুকরী চলিল না। মধুকরী উঠিয়া যাওয়ার পর বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি। মধুকরী প্রচারের সময়ে শাস্ত্রিমহাশয়ের অধ্যয়ন ও আলোচনার সুযোগ অধিক হইয়াছিল, গ্রাম্য-নির্য্যাতন তদপেক্ষাও অধিক হইয়াছিল।

প্রেস, পুস্তকমুদ্রণ, বাঙ্গালা কাগজ লেখা এ সমস্তই তখন ভট্টপল্লীসমাজে নিন্দিত ছিল। মধুকরী উঠিয়া যাইবার সময়ে শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রবেশিকাপরীক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক পাঠ করা হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার ইংরাজি অধ্যয়নের তৃতীয় বৎসর। মধুকরীর বিলোপে এবং ইংরাজি পাঠ সংবাদের অধিকতর প্রচারে শাস্ত্রিমহাশয় লজ্জিত ও সবিশেষ দুঃখিত হইয়া গুরুজনের অজ্ঞাতসারে ১২৭৯ সালে স্বদেশ ত্যাগ করিলেন। তাহার কিছুকাল পূর্ব্বেই জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া লোকলজ্জা-বশতঃ স্বজনসন্নিধি পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাব গিয়াছিলেন। শাস্ত্রিমহাশয় প্রথমে তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় গুজরনবালানগরে মিশনরি স্কুলে সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন। সুদূর দেশে দুই বন্ধু মিলিত হইয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলেন; শাস্ত্রিমহাশয় একমাস জয়গোপালের বাসায় থাকিয়া তাঁহারই পরামর্শে লাহোরে নবপ্রবর্ত্তিত প্রাজ্ঞপরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যয়ে পরীক্ষার তিনদিন পূর্ব্বে তিনি লাহোরে উপস্থিত হইলেন। তখন নবীনচন্দ্র রায় এবং রাজকৃষ্ণ গোস্বামী লাহোরসংস্কৃত-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রি-মহাশয়ের প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ করিরা অত্যন্ত প্রীতিসহকারে বলিলেন, আপনার পক্ষে প্রাজ্ঞপরীক্ষা নিতান্ত সামান্য, এবার শাস্ত্রি পরীক্ষার আয়োজন নাই, সুতরাং আপনি বিশারদপরীক্ষা প্রদান করুন। (প্রাজ্ঞপরীক্ষা প্রথম, বিশারদপরীক্ষা দ্বিতীয়, এবং শাস্ত্রি-পরীক্ষা তৃতীয় বা সর্ব্বোচ্চ, লাহোরে এইরূপ তিনটি পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা পঞ্জাব-গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে সেই বৎসরই হইয়াছিল। শাস্ত্রি-পরীক্ষার্থী ছাত্র সে বৎসর উপস্থিত না হওয়াতে শাস্ত্রি-পরীক্ষার আয়োজন সে বৎসরে হয় নাই)।

শাস্ত্রিমহাশয় সবিনয়ে বলিলেন, বিশারদপরীক্ষার পাঠ্য গ্রন্থ আমি আলোচনা করি নাই, সে সকল গ্রন্থও আমার নিকটে নাই, পরশ্বঃ পরীক্ষা, এ অবস্থায় বিশারদপরীক্ষা দিতে সমর্থ হইব কি, তাহাই ভাবিতেছি। সম্পাদকদ্বয় তাঁহাকে সাহস ও উৎসাহ দিয়া পাঠ্য গ্রন্থ অর্পণ করিলেন। অসাধারণ পরিশ্রমী ব্যুৎপন্ন শাস্ত্রিমহাশয় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পাঠে মনো-যোগী হইলেন এবং যথাসময়ে পরীক্ষা প্রদান করিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং এক বৎসরের জন্য মাসিক ২২৲ টাকা পুরস্কারও পাইলেন। পরীক্ষাকালে শাস্ত্রিমহাশয়ের কবিত্ব, রচনাশক্তি, এবং ভাষাজ্ঞানের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া পরীক্ষাসমিতির সম্পাদকদ্বয় তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা এক খানি সংস্কৃত মাসিক পত্র-প্রকাশে ইচ্ছুক, কিন্তু উপযুক্ত সম্পাদকের অভাবে আমাদের ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই, আপনাকে পাইয়াছি, আপনি এই লাহোরে থাকিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, মাসিক ২৫৲ টাকা পাইবেন। শাস্ত্রিমহাশয় সম্মত হইলেন। "বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শাস্ত্রিমহাশয়ের সেই "বিদ্যো-দয়" এখনও আছে, এখন ভট্টপল্লী হইতেই প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একখানিমাত্র সংস্কৃতমাসিক পত্র "বিদ্যোদয়"—তাহাও শাস্ত্রিমহাশয়ের শ্রমলব্ধ অর্থব্যয়েই

চলিতেছে, হাজার হাজার সংস্কৃতপাঠী ছাত্র আছে, কিন্তু "বিদ্যোদয়ের" গ্রাহক নাই বলিলেই হয়। অথচ "বিদ্যোদয়ে" যে কত শিক্ষণীয় বিষয় থাকে, কত উৎকৃষ্ট গদ্য পদ্য থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শাস্ত্রিমহাশয় তৎপরবৎসরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও শাস্ত্রি-পরীক্ষা প্রদান করিলেন। প্রবেশিকাপরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে এবং শাস্ত্রিপরীক্ষায় একমাত্র তিনিই সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন এক বৎসরের জন্য মাসিক ৩৩৲ টাকা বৃত্তি এবং এক কালীন এক শত টাকা পুরস্কার পাইলেন। গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত পরীক্ষায় শাস্ত্রী উপাধি ইতঃপূর্ব্বে আর কেহই প্রাপ্ত হন নাই। হৃষীকেশ শাস্ত্রিমহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম 'শাস্ত্রী'। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের এম্, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রধান ছাত্রদিগের শাস্ত্রী উপাধিও ইহার পরে প্রবর্ত্তিত। যথা-সময়ে এফ্, এ পরীক্ষাও দিয়াছিলেন, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে সংস্কৃতাধ্যাপকপদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার যশে পঞ্জাব পূর্ণ হইল, চরিত্রগুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন। এইরূপে দশ বর্ষ অতীত হইল। এ দশ বর্ষ শাস্ত্রি-মহাশয়ের জীবনের উৎকৃষ্ট সময়। নানা ভাষাভিজ্ঞ ডাক্তার লাইটনর সাহেবের বাঙ্গালীবিদ্বেষ ছিল, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে মিঃ পিয়ারসন্ সাহেব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া নব প্রতিষ্ঠিত পঞ্জাববিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেছিলেন। শাস্ত্রিমহাশয়ের গুণ, পাণ্ডিত্য এবং কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া তিনিই ওরিয়েণ্টাল কলেজে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। ডাক্তার লাইটনর উপ-স্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় কলেজে এক জন বাঙ্গালী অধ্যাপক নিযুক্ত। তিনি কয়েক দিন তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে জানিলেন, এই বাঙ্গালী পণ্ডিত নির্দ্দোষ এবং বহু গুণসম্পন্ন। তাঁহার অধ্যাপনাগুণে কলেজের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে। তখন তিনি বাঙ্গালীবিদ্বেষ ভুলিয়া শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রণয়বদ্ধ হইলেন। শাস্ত্রিমহাশয় যখন স্বজনবিয়োগ ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলায় বাধ্য হইয়া পঞ্জাব ত্যাগ ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন, তখন লাইটনর সাহেব বিলাত গিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রি-মহাশয়কে পুনরায় পঞ্জাবে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং কলিকাতা আগমন করেন এবং শাস্ত্রি-মহাশয়কে পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার এবং ওরিয়েণ্টাল কলেজের প্রধান অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু জীর্ণজ্বরে আক্রান্ত হইয়া শাস্ত্রিমহাশয় পুনর্ব্বার পঞ্জাবত্যাগে বাধ্য হন। ডাক্তার লাইটনর এই দৈব-দুর্ঘটনায় নিরতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রিমহাশয়কে প্রকাশ্য বিদায় দিলেন, যত দিন জীবিত ছিলেন শাস্ত্রিমহাশয়কে অন্তর হইতে বিদায় দেন নাই। সাহেব পেনসন লইয়া বিলাত গিয়াও বিদ্যোদয়ের সাহায্যের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা প্রদান করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পরে তদীয় পুত্র এই সাহায্যদান বন্ধ করেন। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন "গুণাঃ পূজাস্থানং"। শাস্ত্রিমহাশয়ের জীবনের উৎকৃষ্ট দশ বৎসর অতীত হইল। ক্রমে তাঁহার মাতা, পত্নী, এক মাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং পিতামহ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। সেই সময়ে কলেজের প্রধান অধ্যাপক পদে উন্নীত হইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া শোককাতর পিতৃদেবের সেবার জন্য

স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপূর্ব্ব হইতেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় শাস্ত্রিমহাশয়কে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শাস্ত্রিমহাশয় তাহাতে বাধ্য হন নাই, এক্ষণে বাধ্য হইলেন। তাহার পর ভট্টপল্লীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনায় সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এই সময় শাস্ত্রিমহাশয়ের নিকট সাংখ্য এবং পাতঞ্জল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রিমহাশয় শাস্ত্রিপরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার সময় পঞ্জাবেই এই সকল প্রাচীন দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স, এল, এ এবং বি, এর সংস্কৃত পরীক্ষক ছিলেন, তাঁহার সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, এবং প্রাকৃত গ্রন্থনিচয় তাঁহার রচনাশক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে কবিতাবলী মেঘদূতের টীকা ও অনুবাদ, প্রবোধচন্দ্রোদয়ের টীকা, সুপদ্ম ব্যাকরণের টীকা, প্রাকৃত ব্যাকরণ, হিন্দি ব্যাকরণ, প্রাকৃতপ্রকাশ, মলমাস, উদ্বাহ, তিথি, শুদ্ধি, শ্রাদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের অনুবাদ এবং শাণ্ডিল্য-সূত্রের অনুবাদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন "স্মৃতিশাস্ত্রের অনুবাদ করিয়া আপনি রঘুনন্দন অপেক্ষা দেশের উপকার করিয়াছেন। যেহেতু রঘুনন্দনের সংস্কৃত বুঝিবার লোক দেশে ক্রমেই কমিতেছে। আপনার প্রাঞ্জল বিশদ বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সকলেরই বোধ-গম্য। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র শাস্ত্রিমহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার সময় এসিয়াটিকসোসাইটীর বরাহপুরাণ এবং বৃহন্নারদীয়পুরাণ শাস্ত্রিমহাশয় সম্পাদন করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন সংস্কৃতকলেজের লাইব্রেরীস্থিত পুথির ক্যাটালগ প্রণয়ন শাস্ত্রিমহাশয়ের এক বিশেষ কীর্ত্তি। এই কার্য্যে তিনি ২০ বৎসর অসীম পরিশ্রম করিয়াছেন। সংস্কৃতকলেজ এই জন্য চিরদিন ঋণী থাকিবে। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজ সম্পর্কে এবং স্বাধীন অধ্যাপনায় অনেক কৃতবিদ্য ছাত্র অধুনা বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান সূর্য্যকুমার অগস্তি তন্মধ্যে অন্যতম।

তাঁহার সংস্কৃতকলেজে সুপ্রতিষ্ঠার সহিত দশ বৎসর অধ্যাপনার পর তাঁহার পিতা মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় গঙ্গালাভ করেন। এ সময় তাঁহার সংসার বিধবা ভগিনী ও পিতৃহীন ভাগিনেয়গণে পরিপূর্ণ থাকায় খুব বিশালই ছিল। আশ্রিতপালক শাস্ত্রিমহাশয় তাহাদিগকে পরম আদরে পালন করিতে লাগিলেন, ইহা ব্যতীত ১৫।১৬ জন বিদেশী ছাত্রকেও অন্নদান ও বিদ্যাদান দ্বারা পালন করিতে লাগিলেন। দেশে দুর্গোৎসব প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য কর্ম্মও যথাবিধি সমারোহে প্রতিবৎসর সম্পন্ন করিতেন। একদিকে বিশাল সংসারের ভারবহনে অকাতরতা অন্যদিকে সাহিত্যের প্রতি একনিষ্ঠ তৎপরতা বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি এই অবস্থাতেই অদম্য উৎসাহে বিদ্যোদয় নিয়মিত পরিচালন করেন। স্মৃতিতত্ত্বাদি অনুবাদ করেন। আজ দুই বৎসর হইল

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মধুসূদন সরস্বতীর টীকা ও স্বকীয় বিশদ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এ বিশাল গ্রন্থ অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন, ইহাই বড় পরিতাপে বিষয়। তাঁহার সংস্কৃত রচনারীতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রশংসিত হইত। সুদূর হরিদ্বারান্তর্গত জালাপুর মহাবিদ্যালয়ের মন্ত্রী পদ্মসিংহ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার গদ্যনিবন্ধাবলী-দর্শনে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি শাস্ত্রিমহাশয়কে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন—"জন্মান্তরাপন্নবান্ শ্রীহৃষীকেশমহাবিদুষাং।" আরও "বলিয়াছেন, "যদি বা ভট্টস্য বর্ণনশৈলীকাপ্যুপলভ্যতে তর্হি বিদ্যোদয়সম্পাদকপ্রবন্ধেষেবেতি।" পণ্ডিত পদ্মসিংহ ইহাতেও বিরত হন নাই, তাঁহার কতিপয় প্রবন্ধ জীবনী ও প্রতিকৃতির সহিত স্বব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয় সে পুস্তক মুদ্রিত দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহা আমাদের দ্বিতীয় ক্ষোভের বিষয়।

আমি পাঠ্যাবস্থা হইতেই বিদ্যোদয়ের গ্রাহক ছিলাম। উক্ত পত্রিকায় শাস্ত্রিমহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধাদিপাঠে বহু উপকৃত হইয়াছি। আমি শিমুলজানি বিজয়া-চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন কালীন একখানা হস্তলিখিত পুথির মধ্যে ভারতসাবিত্রী নামক কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাইয়াছিলাম। শ্লোকগুলি অতি সুন্দর। সরল সংস্কৃতে ভারত-যুদ্ধের বিবরণ লিখিত। শ্লোকগুলি পাইয়াই বিদ্যোদয়ে প্রকাশার্থে শাস্ত্রিমহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। শ্লোক-গুলি প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রিমহাশয় আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন *।

তিনি কোন ছাত্রের লিখিত প্রবন্ধ অথবা রচিত শ্লোক পাইলে বিশেষ আগ্রহ সহকারে প্রকাশ করিতেন। বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ব্যাকরণতীর্থ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী নবদ্বীপে অধ্যয়নকালে মহামান্য ভারত সম্রাট মহোদয়ের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শাস্ত্রিমহাশয় তাহা আগ্রহ সহকারে বিদ্যোদয়ে প্রকাশ করিয়া বন্ধুবরকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন †।

শাস্ত্রিমহাশয় কয়েক বৎসর হইল পেন্‌সন লইয়া স্বগৃহে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। তিনি পিতৃপিতামহের অনুরোধে যে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারই গর্ভজাত চারিটি পুত্র বর্ত্তমান। প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত ভবভূতি ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতকলেজের অন্যতম অধ্যাপক,

* নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
সঞ্জয়ং পরিপপ্রচ্ছ মনঃসন্তাপসংযুতঃ ॥ ১ ॥ ইত্যাদি

ভারতসাবিত্রী বিদ্যোদয় ১৯০১। মে মাস

† ভারতমহাসাম্রাজ্যেশ্বরস্য শুভরাজ্যাভিষেকমহোৎসবোপলক্ষে কাসাঞ্চিৎ প্রজানাম্ অভিনন্দনপত্রম্
রাজন্ মাতৃবিয়োগশোকসমাচ্ছন্নেনৃণাং
জাগর্ত্তদ্য নবীনভূপতিমহারাজ্যাভিষেকোৎসবঃ। ইত্যাদি

বিদ্যোদয় ১০২ জুলাই।

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত এম্ এ। আর দুইটি পুত্র বালক। পুত্রগণ সকলেই বিনয়াদিগুণে বিভূষিত তাঁহারই পুণ্যের ফল। আশা হয়, তাহারা তাঁহার আশীর্ব্বাদে কালে তাঁহার ও বংশের সম্মান ও পবিত্রতা ও পাণ্ডিত্য-গৌরবরক্ষা করিয়া বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিবে। এই অবস্থায় তাঁহার গঙ্গালাভ হইয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয় সদাচারনিষ্ঠ, তিনি অর্থলোভে কখনও কোন অব্যবস্থা প্রদান করেন নাই। তাঁহার শেষ জীবন এই আচার-নিষ্ঠার জন্য সবিশেষ উজ্জ্বল। যাও দেব! পুণ্যধামে তোমার মাতৃস্তোত্র, তোমার বসন্ত-বর্ণনা, তোমার বিয়োগবিলাপ, দিব্য সারস্বতকুঞ্জে বীণাঝঙ্কারে গীত হইবে। যাও দেব! ব্রহ্মলোকে তোমার অপূর্ব্ব গদ্য কাব্য ঋষিকুমারকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হইয়া তোমার তৃপ্তি বিধান করিবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধরচনায় "বঙ্গবাসী" "বিদ্যোদয়" প্রভৃতি পত্রিকা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

সদ্‌গ্রন্থের তালিকা

দেশের নানাস্থানে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে, প্রধানতঃ ছাত্রদিগের যত্নে পুস্তকালয়স্থাপনের একটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে, ইহা দেশের পক্ষে একটি শুভ লক্ষণ। জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষা কেমন প্রবল, এবং সেই জ্ঞানবিস্তারের জন্য কতটা যত্ন হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এইরূপ পুস্তকালয়।

কিন্তু এই সকল পুস্তকালয়ের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই যে সমানভাবে সিদ্ধ হইতেছে, এমন কথা বলিতে পারি না। এমন দেখা গিয়াছে, যাহারা জ্ঞান-বিতরণের উদ্দেশ্যে পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারা অনেক সময়ে উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান, এবং পুস্তকালয়ের পুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন, অবশ্য ইহারও প্রয়োজন আছে। মুদ্রা-যন্ত্র হইতে যখন যাহা পুস্তকাকারে বাহির হয়, কোন কোন পুস্তকালয়ে সেগুলি সঞ্চিত রাখা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কাজ সকল পুস্তকালয়ের নহে। গবর্ণমেণ্ট এবং দেশের বড় লোকেরা যেখানে বড় বড় পুস্তকালয় স্থাপন করেন, যেখানে অর্থের কিছুমাত্র অভাব নাই, এবং যেখানে সমস্ত পুস্তকই পাওয়া যায় বলিয়া পাঠকেরা আশা ও বিশ্বাস করেন, সেখানে ভালমন্দ ছোট বড় সমস্ত গ্রন্থ সংগৃহীত হইলেই তেমন পুস্তকালয়ের প্রকৃত শোভা পায়। কিন্তু পল্লীগ্রামের ছাত্রদের যত্নে সচরাচর যে সকল পুস্তকালয় স্থাপিত হয়, সচরাচর তাহাদের

আর্থিক অবস্থা তেমন উন্নত নহে। প্রায়ই দেখা যায় উদ্যোগী ভদ্রসন্তানেরা জনসাধারণের নিকট হইতে ভিক্ষা ও চাঁদা দ্বারা কিছু অর্থসংগ্রহ করে, এবং সেই অর্থে যে কয়েকখানি গ্রন্থ সংগৃহীত হইতে পারে, তদ্দ্বারাই সংকল্পিত পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। যে পুস্তকালয়ের মূলে এইরূপ অর্থ-দৈন্য বর্ত্তমান, তাহার জন্য যে সে গ্রন্থ ক্রয় করিয়া অর্থনাশ করা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। যে লেখা পাঠ করিলে যুবকদিগের জ্ঞানসম্পদ্ এবং ভাবসম্পদ্ বর্দ্ধিত হইতে পারে, যাহার প্রভাবে মনুষ্যত্বের অপচয় না হইয়া উপচয় হইতে থাকে, তেমন লেখা যাহাতে আছে, সেইরূপ গ্রন্থ সংগ্রহ করাই সঙ্গত।

সুখের বিষয়, পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতৃগণ ক্রমে এ কথা বুঝিতেছেন। এখন দেখিতে পাওয়া-যায়, যুবকেরা পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াই ভাল পুস্তকের একটা তালিকার জন্য ব্যগ্র হন, এবং যাহাতে তাঁহাদের পুস্তকালয়ে কেবল ভাল গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, তাহারই সংকল্প অবলম্বন করেন।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকস্থানের যুবকদিগের নিকট হইতে এইরূপ অনুরোধ পাইয়াছি এবং তাহাতেই দেশের দিন কতকটা ফিরিবে বলিয়া আশা হইতেছে। কিন্তু ইহা একজনের কার্য্য নহে, বিশেষতঃ আমারমত ক্ষুদ্র ব্যক্তির কার্য্য একেবারেই নহে। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে যখন সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ অনুরোধ পাইয়াছিলাম, তখন কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সাহায্যে একটি অনতিদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং উহার একটি নকল আমাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তালিকাটি যুবকদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। কয়েক মাস পূর্ব্বে এম, এ ক্লাসের ছাত্র জনৈক যুবক বন্ধু আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া জানান যে, পূর্ব্বের সংগৃহীত তালিকা হারাইয়া গিয়াছে; তাঁহারা আর একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিতেছেন, সুতরাং ভাল পুস্তকের একটা তালিকার প্রয়োজন। ফেরৎ ডাকেই একটা তালিকা পাঠাইবার অনুরোধ ছিল, কিন্তু আমি তখন রোগে শয্যাগত, লেখনীধারণে অসমর্থ, সুতরাং তালিকা পাঠান ত দূরের কথা, পত্রখানির উত্তর দেওয়াও ঘটে নাই।

এইরূপ অবস্থা অনেক স্থলেই ঘটিতেছে, যুবকেরা পুস্তকালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াই ভাল পুস্তকের একটা তালিকার অভাব অনুভব করিতেছেন। যদি সদ্‌গ্রন্থের একটা তালিকা প্রস্তুত থাকিত, তাহা হইলে পুস্তকালয়ের অনুষ্ঠান করিয়াই পুস্তকের জন্য যুবকদিগকে বিব্রত হইতে হইত না। যখন মালদহে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়, তখন এ বিষয়ে সম্মিলনীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং সম্মিলনী এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন, সভাপতি মহাশয় এরূপ আশ্বাসও দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরে ৺কামাখ্যাধামে এবং দিনাজপুরে আরও দুই অধিবেশন হইয়া গেল, অথচ এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা হইল না।

পরিষৎ বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করেন কি না, জানি না। যদি গুরুত্ব কিছু না থাকে,

তবে ইহার আলোচনা করিয়া পরিষদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে বলি না। কিন্তু যদি কিছু গুরুত্ব থাকে, তাহা হইলে ইহার একটা সুব্যবস্থা করিতে পরিষদকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করি।

ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ নহে, তাহা বুঝি। গ্রন্থকারদিগের বিশেষতঃ জীবিত গ্রন্থকার-দিগের গ্রন্থ রীতিমত সমালোচনা করিয়া তাহার দোষগুণ প্রদর্শন করা নিতান্তই বিপৎসঙ্কুল, এই জন্যই কোন সাহিত্যপরিষৎ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন না।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কঠিন হইলেও পরিষৎ ইচ্ছা করিলে যে ইহার একটা সুব্যবস্থা না করিতে পারেন, আমার ত এমন বোধ হয় না। সমালোচন সম্বন্ধে যাহাই হউক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ একখানি গ্রন্থ পড়িলে যে তাহার দোষগুণ বুঝিতে পারেন, একখানি গ্রন্থ দ্বারা সমাজের কতটা ইষ্টানিষ্ট হইতে পারে তাহা অনুভব করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণ করিয়া যে কোন পরিষৎ একখানি তালিকা প্রস্তুত করিলে নিশ্চয়ই দেশের একটা অভাব দূর হয়, সমাজে সৎসাহিত্য-প্রচারের একটা উপায় হয়, দেশের একটা গুরুতর মঙ্গল সাধিত হয়। আমার বিবেচনায় এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রণালীটি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১। বিষয়টির প্রয়োজন ভালরূপে বুঝাইয়া দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানু-রাগী ব্যক্তিদিগকে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ একখানি পত্র লিখুন এবং ঐ পত্র তাঁহাদিগের পত্রিকাতেও প্রকাশ করুন।

২। গদ্য, পদ্য, সাহিত্য, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ভেদে গ্রন্থের বিভাগনির্দ্দেশ করিয়া দিন।

৩। যাঁহাদিগের নিকট পত্র লেখা হইবে, তাঁহারা আপন আপন জ্ঞান এবং রুচি অনু-সারে পরিষদের নির্দ্দিষ্ট বিভাগ-অনুযায়ী গ্রন্থের এক একটি তালিকা পরিষদের নিকট প্রেরণ করুন।

৪। পরিষদ্ ঐসকল তালিকা সংগ্রহ করিয়া তালিকাভুক্ত নামগুলি বর্ণানুক্রমে এবং বিভাগ-অনুসারে সাজাইয়া একটি বিস্তীর্ণ তালিকা প্রস্তুত করুন, এবং প্রত্যেক গ্রন্থের অনুকূলে যতজনের মত পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা প্রত্যেক গ্রন্থের নামের সঙ্গে বন্ধনী-মধ্যে সন্নিবিষ্ট হউক, এবং পরিষদের প্রস্তুত এই শেষ তালিকা পরিষদ্ আপনাদের পত্রিকাতে এবং সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে জনসাধারণে প্রকাশ করুন।

এইরূপ তালিকা কখনও চরম হইতে পারে না। প্রতিবৎসর এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিতে পারিলেই ভাল হয়; কিন্তু পরিষদ্ যদি এতটাও ত্যাগ-স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হন, অন্ততঃ প্রতি পাঁচবৎসরে এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইবে।

যাঁহারা সাহিত্যের কোনরূপ ধার ধারেন, তাঁহাদের সকলকে পত্র লেখা হয় ত পরিষদের

পক্ষে সহজ হইবে না, কিন্তু একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া পরিষদ্ এ বিষয়ে সকলেরই সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারেন।

আমার প্রস্তাবিত এ প্রণালী পরিষদের মনঃপূত হইবে কি না, জানি না। আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই পরিষদের নিকট নিবেদন করিলাম। পরিষদ্ বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া ইহা অবলম্বন করুন, অথবা এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া অচিরেই এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী

রঙ্গপুরের প্রচলিত প্রবাদ-সংগ্রহ

। হাতে আর্শী কুয়ায় ভুলকী।

হস্তে দর্পণ রাখিয়া মুখাবলোকনের নিমিত্ত কূপে (ভুলকী) উঁকি দেওয়া। অর্থাৎ সহজলভ্যে উপেক্ষা-প্রদর্শন।

২। কুঁতিয়া মৈল দৈবকী,
নাম পাড়ায় যশোদারাণী।

(কুঁতিয়া) কুস্থন করিয়া অর্থাৎ দৈবকী প্রসব-বেদনা ভোগ করিলেন, যশোদার কৃষ্ণজননী আখ্যা হইল।

৩। পোষা শারো চক্ষে ঠোকায়

পালিত (শারো) শুকপক্ষী পালকের চক্ষে (ঠোকায়) চঞ্চু আঘাত করে। অকৃতজ্ঞের প্রতি এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

৪। যাবত না পায় পরের বেটি,
কান্দে ভারে উবায় মাটী।

যে পর্য্যন্ত পরের (বেটি) কন্যা হস্তগত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত (কান্দে) স্কন্ধে (ভারে উবায় মাটী) মাটীর ভার বহন করে। অর্থাৎ বিবাহ-কার্য্যোদ্ধারার্থ কন্যার অভিভাবকগণের আনুগত্য স্বীকার করে।

৫। পাঁঠার প্রাণ যায়,
খাওয়াইয়া স্বাদ না পায়।

পাঁঠার প্রাণ বধ করিয়াও (খাওয়াইয়া) খাদকের আত্মতৃপ্তি জন্মে না; অর্থাৎ নির্য্যাতনের শেষ সীমায় গিয়াও জিঘাংসার অপূর্ণতা।

৬। যার শির, তার গর্দ্দান।	অনধিকার চর্চ্চাকারীর প্রতি এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।
৭। মরাক্ মারিস্ কেনে, কথা কয়না কেনে।	মৃতব্যক্তি নির্ব্বাক্ বলিয়া তাহার উপরে নির্য্যাতন। অর্থাৎ দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচার।
৮। বান্দিয়া মারে সয় ভাল।	বন্ধনপূর্ব্বক প্রহার করিলে অগত্যা সহ্য হইয়া থাকে।
৯। মরিয়া যায় রাণী, তেঁও না ছাড়ে দাঁতের কাণী।	রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন (তেঁও) তথাপি (দাঁতের কাণী) দন্তের ঘর্ষণ ত্যাগ করিতেছেন না। অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় জেদ রক্ষা করিতেছেন।
১০। বার নাতি তের পুতি, তেঁও বুড়ার অধোগতি।	বহু পুত্র-পৌত্র সত্বেও বৃদ্ধের অধোগতি হইতেছে; অর্থাৎ অদৃষ্টের উপরে কাহারও হাত নাই।
১১। খাইলে বিষ না খাইলে নির্ব্বিষ।	ভুক্তবিষ অনিষ্টকারী, অভুক্তবিষ অনিষ্টকারী নহে, অর্থাৎ নিরপরাধের কোন আশঙ্কা নাই।
১২। খাইলে শালা, না খাইলে বওনাই।	ঋণী কটূক্তির ভাজন, অঋণী সর্ব্বত্র সমাদৃত। (বওনাই) ভগিনীপতির ন্যায় সমাদরের পাত্র।
১৩। কড়ির লোভে কুড়িয়ার আঙ্গুল চোষে	অর্থলোভে (কুড়িয়ার) কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তেরও অঙ্গুলী (চোষে) লেহন করে।
১৪। কোলা পায় না পিঠি চায়।	কোলা (ক্রোড়ে) উঠিবার অবসর নাই (পিঠি) পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে অভিলাষ, অর্থাৎ অতি লোভ প্রকাশ।
১৫। ভাতারে পোছে না, মোর নাম সোয়াগী।	স্বামী সমাদর করেন না, স্ত্রী আপনাকে (সোয়াগী) স্বামী সোহাগিনী বলিয়া মনে করেন। তুচ্ছার্থে এই বাক্য প্রযোজ্য।
১৬। অজাত পুত্রের নামকরণ।	রঙ্গপুর কাজিরহাটের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীমন্তধর চৌধুরী পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন, এরূপ প্রবাদ আছে। তদবধি দুরাশাস্থলে এই বাক্য প্রযুক্ত হইতেছে।

১৭। বান্ধিলে টাটি, পরাইলে বেটী।	উত্তমরূপে বাধিলে (টাটি) বেড়া তৎপদবাচ্য এবং (পরাইলে) পরিচ্ছদাদিদ্বারা ভূষিত করিলে কন্যার রূপ বৃদ্ধি হয়; যত্ন করিলে দ্রব্য সুরক্ষিত হয়।
১৮। পায় না ত খায় না।	আদৌ সংগ্রহের সামর্থ্য নাই, তথাপি তৎপ্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন।
১৯। হাত ছোট বেল বড়।	ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া।
২০। কথার নাম মধুবাণী, যদি কথা কৈতে জানি।	উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে বাক্য মধুবর্ষী হয়।
২১। বাতে হাতির পায়, বাতে হাতি পায়।	উপযুক্ত কথা-প্রয়োগে হস্তী লাভ করা যায়, আবার তদ্বিপরীতে হস্তিপদতলে নিষ্পেষিত হইতে হয়।
২২। ঝড় যায়া ঝাঁপী, বয়স যায়া বিয়া।	ঝড় ও বৃষ্টি অন্তে (ঝাঁপি) মস্তকাবরণ ধারণ ও বয়স অতিবাহিত হইলে বিবাহ করা নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ অসময়ে কর্ম্মচেষ্টা।
২৩। কপালে থাকিলে গু কাউয়ায় আনিয়া দেয়।	অদৃষ্টের লিপি অখণ্ডনীয়। গু—বিষ্ঠা।
২৪। অসময় কাউন উষিয়া কাউয়ার ভাত করা।	অসময়ে কাউন (উষিয়া) (সিদ্ধ করিয়া (কাউয়া) কাকের ভোগ্য করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য।
২৫। কথা না কহিয়া পাড়ে গাইল, আইজ না হবে হবে কাইল।	প্রথম আহ্বানে নায়িকা ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে, পশ্চাৎ এ ক্রোধের নিবৃত্তি হইয়া নায়কের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবে। অপেক্ষা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি। গাইল—গালি; আইজ—অদ্য; কাইল—কল্য, পশ্চাৎ।
২৬। সময়ের গীত অসময়ে গায়, গালে মুখে চওড় খায়।	সময়োচিত ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। চওড়—চপেটাঘাত।
২৭। জীয়ন্তে না পায় ভাত কাপড়, মৈলে হবে দানসাগর।	উপস্থিত অসমাদর পরে সম্মানদানের প্রলোভন।
২৮। অরাজ্যে বামন বেগার।	কুস্থানে সম্মানার্হের প্রতিও অসম্মান প্রদর্শিত হয়।
২৯। ছাগলে যব পীড়লে বলদ কিনে কেনে।	সকল লোক সকল কার্য্যের উপযুক্ত নহে।
৩০। গ্রাম ভারি তার মাঝের পাড়া।	বৃথা গর্ব্বের স্থলে প্রযোজ্য।

৩১। খুঁইয়ার তাঁতী তসরে হাত।	(খুঁইয়া) ক্ষুদ্রবস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায়ের তসর বয়নের বৃথাচেষ্টা ; দুরাশা-জ্ঞাপক।
৩২। মুখ থাকিতে নাকে ভাত।	স্থলের অপপ্রয়োগ।
৩৩। বড় গ্রাসে খাইতে লক্ষী ডরায় ডরাউক।	ন্যায্য কাজ করিলে কেহ অসন্তুষ্ট হয়, হউক।
৩৪। ধারিলে ধান না ধারিলে পাতান।	ভালকথাও কূটার্থে মন্দ হয় এবং অগ্রাহ্য করিলে মন্দ কথাও উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ধারিলে—ধার, ঋণ করিলে। পাতান—শস্যহীন ধান্য।
৩৫। অবলা বলে বিস্তর অফলা ফলে বিস্তর।	অব্যবহার্য্য ফল অধিক ফলিয়া থাকে এবং অপণ্ডিত যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারেন।
৩৬। হয় সৈয়দপুর না হয় নিয়ামতপুর।	রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত সন্নিহিত এই দুইটি গ্রাম হইতে এই প্রবাদের উৎপত্তি। ফল-বৈপরীত্যে এই বাক্য প্রযোজ্য।
৩৭। অকথার কথা বেঙে দই চিড়া খায়, মায়ের বিয়া না হইতে বেটি নাইয়র জায়।	(নাইয়র) শ্বশুর বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে আসা। অসম্ভবস্থলে প্রযুক্ত হয়।
৩৮। ধান বাড়ি দিয়া ঘাঁটা, চাউল বাড়ি দিয়া ঘাঁটা। টালেয়া ফেলাইম মাথার পাগ, চওড়েয়া দেখাইম ঘাঁটা।	অনধিকারচর্চ্চাকারীর প্রতি তিরস্কারার্থে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়। ধানচাউলবাড়ী—গোলাবাড়ী। ফেলাইম্—ফেলিব। টালেয়া—সহসা হস্ত দ্বারা ফেলিয়া দেওয়া ; ঘাঁটা—পথ। চওড়েয়া—চপেটাঘাতে। দেখাইম্—দেখাইব।
৩৯। অকর্ম্মার তিনকাম দঢ়, ভোজন নিদ্রা ক্রোধ বড়।	অর্থ সহজবোধ্য।
৪০। ঢাল সরিষা গণ কড়ি।	ত্বরা অর্থে ব্যবহৃত হয়।
৪১। কাজের মাক্ ঘর কর, বেটার মাক্ বাইর কর।	সন্তানবতী হওয়াই যথেষ্ট নহে, সংসারের কার্য্যের উপযোগী হওয়াও স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক।
৪২। কর্ত্তার ইচ্ছায় খেড়বাড়ী কীর্ত্তন	খেড়বাড়ী—উলুবন।
৪৩। যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়, চেরাক্দারের ঘোড়া। যার নাও সে যায় তড়ে, ধুমকাড়াটা আসিয়া চড়ে।	অনধিকারীর প্রতি প্রযোজ্য। চেরাকদার—আলোকদাতা, এস্থলে সহিস। তড়ে—তটে, ধুমকাড়া—দুরন্ত, ধুমধামকারী। বলপ্রয়োগে অনধিকার-প্রবেশ স্থলে প্রযোজ্য।

৪৪। খাইলে দাইলে বান্ধিলে পুড়া,
পকি দেখাইলে বদলা বুড়া॥

(পকি)—পক্ষী, এস্থলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। পুড়া—বস্তা। কার্য্যোদ্ধারপূর্ব্বক অকৃতজ্ঞের ন্যায় প্রস্থান।

৪৫। নাও নাই বান্ধিস,
নায়ের কি ঢুক্‌ঢুকিও নাই শুনিস।

নাও—নৌকা। ঢুকঢুকি—ঢুক ঢুক শব্দ। সন্দেহস্থলে প্রযোজ্য।

৪৬। যার দান তার পুন,
যাঞ দেয় তার হাতের গুণ।

পুন—পুণ্য। যাঞ—যে। দানের পুণ্য দাতারই লভ্য, যাহা দ্বারা সেই অর্থ বিতরিত হয় তাঁহার ঔদার্য্য থাকিলে আংশিক যশোলাভ করিতে পারেন।

৪৭। দাতার দান, বকিলের ফাটে পরাণ

বকিল—কৃপণ। অপর কেহ দান করিলেও কৃপণের প্রাণ ফাটে, অর্থাৎ কষ্টানুভব হয়।

৪৮। পান দিয়া না দেয় চুণ,
সেবা গুয়ার কিবা গুণ।

গুয়া—তাম্বূল। অসম্পূর্ণ কার্য্য বিফল।

৪৯। কার্য্যের সাক্ষী করণ,
পুণ্যের সাক্ষী মরণ।

ফলের দ্বারা কার্য্যের এবং মৃত্যুদ্বারা পুণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৫০। চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া।

অসৎ তাহার অসৎ প্রবৃত্তির চরিতার্থের জন্য সুযোগ অন্বেষণ করে।

৫১। উচিত কথায় দোস্ত বেজার।

দোস্ত—বন্ধু। প্রকৃত কথা প্রিয়তম বন্ধুর পক্ষেও অপ্রিয় হয়।

৫২। বুক ফাটে তবু মুখ না ফাটে।

বিশেষরূপে গোপনীয় সুতরাং অপ্রকাশ্য।

৫৩। পুক্‌টি আছে পাক্‌টি দিবে,
সেই পাক্‌টির পানি খাবে।

পুক্‌টি—গুহ্যদ্বার এস্থলে ক্ষমতা রাহিত্য পাক্‌টি—কূপ, তুচ্ছার্থে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়। কূপ খননের ব্যয় বহনে অক্ষমের সেই কূপোদক পানের বৃথা প্রয়াস।

৫৪। গায় নাই চাম
রামকৃষ্ণ নাম

চাম—চর্ম্ম, চর্ম্মহীনের অর্থাৎ অক্ষমের রামকৃষ্ণের ন্যায় শক্তিমান নাম ধারণ।

৫৫। গায় নাই ছাল্ বাক্‌লা
মদ খায় আক্‌লা আক্‌লা

ছাল্ বাক্‌লা—চর্ম্ম, আক্‌লা আক্‌লা—অঞ্জলি অঞ্জলি; অশক্তের দুরাশা।

৫৬। খাইস্‌তে ছাড়িস না
বাঁচিসতে নড়িস্ না।

খাইস্—খাইতে ইচ্ছা করিলে, তে—ত, যদি; সর্প ও ভেকের সম্বন্ধ হইতে এই বাক্যের উৎপত্তি। ছাড়িয়া না দিলে সর্পের ভেপ আহার অব্যর্থ এবং ভেকের সর্প মুখে

		অচাঞ্চল্যই জীবনের রক্ষার উপায়। অধ্যবসায় সহ আক্রমণ অব্যর্থ এবং—আক্রান্ত ব্যক্তির অচাঞ্চল্যই নিষ্কৃতির উপায়।
৫৭।	মাছ মারিলে কাদা ভরে।	কাদা—কর্দ্দম, কোন কুকর্ম্মে লিপ্ত হইলে তাহা গোপন রাখা যায় না।
৫৮।	পিন্দিবার নেঙ্গটি নাই দরগা যাবার চায়।	পিন্দিবার—পরিধান করিবার, নেঙ্গটি—কৌপীন। (দরগা) আরাধনা স্থানে গমনার্থ-উত্তম বসন প্রয়োজন। কৌপীনধারীর পক্ষে তথায় গমনেচ্ছা নিস্ফল।
৫৯।	জীউনা যায় কাউটালই সার, যায় জীউ তাঞ ভাল্।	জীউ—জীবন, কাউটালই—বিবাদই। জীবনান্ত হইতেছে না বিবাদই চলিতেছে এরূপ স্থলে জীবনান্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়; অর্থাৎ সমূহ ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক বিবাদ মীমাংসার স্পৃহা।
৬০।	ঘোড়ায় নাদে ঘাসিক কিলায়।	নাদে—মলত্যাগ করে। অশ্ব মলত্যাগ করিলে (ঘাসিক) অশ্বরক্ষককে (কিলায়) প্রহার করে। অর্থাৎ একের অপরাধে অন্যের প্রতি দোষারোপ করা।
৬১।	গাই কি বলদ নেঙ্গুড় তুলিয়া দেখেনা।	নেঙ্গুড়—পুচ্ছ। বিষয়টি অনুধাবন করে না।
৬২।	মুঞি না জানো দাদায় জানে বড় বড় জনাক বাঁধিয়া আনে।	মুঞী—আমি, জনাক—ব্যক্তিকে; আমার অজ্ঞাতে অপরের কৌশলে বৃহৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।
৬৩।	খাট ভাতার দেওর হেন সাজে।	ভাতার—স্বামী। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উক্তি "দেবরের ন্যায় আমাকে কি ক্ষুদ্র জ্ঞান কর" অর্থাৎ আমি অক্ষম নহি।
৬৪।	বিয়াই তোর খরচ আর মোর খরচ যত দেখিস খাউয়া আর চাউয়া।	বিয়াই—বৈবাহিক, মোর—আমার, খাউয়া—খাদক, চাউয়া—যাচক। খরচ কোথা হইতে হয় সংবাদ রাখে না বাহিরের লোকের ন্যায় খায় ও চায়।
৬৫।	মরিয়া মৈ টানা।	অশক্ত তথাপি কর্ম্মরত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারাশঙ্কর তর্করত্ন।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

:০:*

গৌড়-পাণ্ডুয়া প্রদর্শক

(অবতরণিকা)

গৌড় অতি প্রাচীন রাজধানী। বহুশতাব্দীব্যাপী গৌড় বঙ্গ ও আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ ভূখণ্ডের উপর প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিল। অধুনা কয়েক শতাব্দী হইতে গৌড় শ্রীহীন ও ধীর-পাদবিক্ষেপে অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে। একটি বহুপ্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে যাহা যাহা থাকা সম্ভব, গৌড় নগরে তাহার আদৌ অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। এক এক সময়ে গৌড়নগর এক এক প্রকার রূপ ও ঐশ্বর্য্যে অতুলনীয় দীপ্তিশালী হইয়া কিছু দিনের জন্য পুনরায় নির্ব্বাণোন্মুখ ভাব ধারণ করিয়াছিল। এই প্রকারের কতিপয় তরঙ্গ উত্থিত ও পতিত হইয়া, পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন নূতন সুরক্ষিত স্থানে নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই প্রাচীন তরঙ্গচিহ্ন মালদহের বক্ষে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। শেষ তরঙ্গ মালদহের দক্ষিণস্থ ভাগীরথী-তীরে উত্থিত হইয়া চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই শেষ তরঙ্গ লইয়া গৌড়তরঙ্গের চারিটি ধারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ চারিটি তরঙ্গের চিহ্নভূমি অনুসন্ধান না করিয়া সর্ব্বশেষ তরঙ্গের আবর্ত্তে যে ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে তাহারই অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঐতিহাসিকগণ চারিটি তরঙ্গেরই লীলা-ভূমির অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই অনুসন্ধান কিছুকাল ব্যাপী না হইলে উক্ত স্থানচতুষ্টয় সম্বন্ধে বিশদ তথ্য লাভে কৃতকার্য্য অসম্ভব হইয়া উঠে।

যাঁহারা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ সন্দর্শনে আগমন করেন, তাঁহারা দর্শনযোগ্য সকল স্থানসমূহের সন্ধান না পাইয়া সাধারণ কতিপয় স্থান দর্শন করিয়া গৌড় ভ্রমণ সমাধা করেন। বস্তুতঃ নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি দর্শনযোগ্য স্থান ব্যতীত আরও বহু ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রাচীন স্থান বিদ্যমান থাকিলেও পথপ্রদর্শকের অভাবে তাঁহারা দেখিবার সুযোগ আদৌ প্রাপ্ত হন না। পাণ্ডুয়া ও বরেন্দ্র সম্বন্ধেও এই প্রকার অকৃতকার্য্যতা ও বাসনার তৃপ্তিসাধন হয় না।

গৌড় ও পাণ্ডুয়া ভ্রমণের সুবিধার্থ প্রদর্শক খানি দুই খণ্ডে বিভাগ করিয়া লিখিত হইল। গৌড় রাঢ়দেশান্তর্গত ভূখণ্ডের অন্তর্গত। পাণ্ডুয়া বরেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত বলিয়া পাণ্ডুয়া-বিবরণে বরেন্দ্র ভূমির কতিপয় দর্শনযোগ্য স্থানের উল্লেখ করা হইবে।

মালদহ।

মালদহ একটি ক্ষুদ্র জেলা, নদী, খাল বিল ও বনে পরিপূর্ণ। মালদহ জেলা গঠনের পূর্ব্বে পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলার অধীনে বর্ত্তমান মালদহ জেলা বিলীন ছিল। মহানন্দা নদীর পশ্চিমভাগ পূর্ণিয়ার অধীন এবং পূর্ব্বভাগ দিনাজপুর এবং দক্ষিণের কিয়দংশ রাজসাহীর সীমান্তর্গত ছিল। খৃঃ ১৮১৩ সালে মালদহ জেলা গঠিত হয়। বর্ত্তমান-মালদহের উত্তরে দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া। পূর্ব্বে দিনাজপুর ও রাজসাহী, দক্ষিণে রাজসাহী ও গঙ্গা, পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্ণিয়া। গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ এই মালদহ জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে; কিন্তু পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ সীমা দিনাজপুর সীমামধ্যেও দৃষ্ট হয়।

নদী ও স্থল পথে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রায় সকল স্থানেই ভ্রমণ করিবার সুবিধা রহিয়াছে। মালদহের সদরষ্টেশন ইংলিশবাজার। কাটিহার গোদাগাড়ী রেলযোগে মালদহ ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ইংলিশবাজার আসিবার বিশেষ সুবিধা। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ষ্টেশন হইতে ইংলিশবাজারে পৌছান যায়। ষ্টেশনে গো-গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। সচরাচর ভাড়া চারি আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত। মহানন্দা পার হইয়া ইংলিশবাজার।

গোদাগাড়ী বা লালগোলা ঘাট হইতে ষ্টিমারযোগে ও ইংলিশবাজার আসিবার সুবিধা আছে। ইংলিশবাজার বা মালদহ টাউনে নবাগতের জন্য ঘরভাড়াপ্রাপ্তি দুষ্কর। পূর্ব্ব হইতেই বাসস্থানের সুবিধা করিয়া রাখিতে হয়, নচেৎ আগন্তুকগণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হওয়াই সম্ভব। গৌড় ও পাণ্ডুয়া ভ্রমণ করিতে হইলে মালদহ টাউনে অবস্থান করা আবশ্যক। গো-গাড়ী ও পাল্কী পাওয়া যায়।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভূভাগ বনজঙ্গলে পূর্ণ; ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অত্যধিক, সুতরাং সকল স্থানে রাত্রিবাস করিতে অনেকেই ইচ্ছা করেন না। গৌড় দর্শনকালে পিয়াসবাটীর বাংলায় থাকা চলে। পাণ্ডুয়া ভ্রমণকালে আদীনা মস্‌জেদের সন্নিকটস্থ বাজারে থাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু উভয় স্থানেই কোন প্রকার খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক ভ্রমণ-কারীকে খাদ্য লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতে হয়। গৌড়ের মধ্যে পীয়াসবাটী ও ছোট সাগর দীঘির জল সুপেয়। কিন্তু গৌড়ের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয়ে বহুসংখ্যক বৃহৎ কুম্ভীর বাস করে, প্রত্যেক ভ্রমণকারীর ইহা বিশেষভাবে মনে রাখার প্রয়োজন হয়। অসাব-ধানে কদাচ কোন জলাশয়ে অবতরণ করিলে বিপদ্ সম্ভব।

পাণ্ডুয়া ভ্রমণকালে যথেষ্ট সুবৃহৎ জলাশয় দৃষ্টিপথে পতিত হইলেও উহার জলপান করা কদাচ উচিত নহে। পাণ্ডুয়ার প্রত্যেক জলাশয়ে বহু কুম্ভীর বাস করে। পানীয় জল বাংলার সন্নিকটস্থ কূপ বা ইন্দারা হইতে সংগ্রহ ও উত্তপ্তকরিয়া শীতল হইলে পান করার প্রয়োজন।

গৌড় ও পাণ্ডুয়া ভ্রমণকালে মশারি আবশ্যক। রাত্রে মধুমক্ষিকার ন্যায় মশকের গুঞ্জন ও ভীষণ দংশন-জ্বালা ভোগ করিতে হয়। গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় ব্যাঘ্র থাকিলেও উহাদের দর্শনাভাব। পাণ্ডুয়ায় কোন কোন স্থলে ব্যাঘ্রের যথেষ্ট উৎপাত আছে। বাংলাগুলি সুরক্ষিত এবং কবাটযুক্ত। ভ্রমণকারীর পক্ষে গো-শকটই একমাত্র সম্বল। আলাপ পরিচয় থাকিলে হস্তীরও সুবিধা হইতে পারে। প্রত্যেক ভ্রমণকারীর সহিত যথেষ্ট খাদ্য পানীয় ও অন্ততঃ দুইজন ভৃত্য আবশ্যক। জ্বালানি কাষ্ঠের প্রায় অভাব হয় না। কোন কোন স্থানে দুগ্ধ মিলিতে পারে। প্রত্যেক ভৃত্যকে প্রত্যেক জলাশয়ে অবতরণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান করিয়া দিবার বিশেষ প্রয়োজন।

রোহণপুর, মালদহ সামসী ষ্টেশনে গো-শকট যথেষ্ট ভাড়া পাওয়া যায়। ভাড়া সুলভ। শকট-চালকেরা প্রায় বিশ্বাসী ও স্থান সম্বন্ধে সুপরিচিত।

ভ্রমণকাল।

মাঘ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ভ্রমণের প্রশস্ত সময়। এই সময়ে বন পরিষ্কার ও পথ শুষ্ক থাকে। পাকা পথের অভাব সৰ্ব্বত্র। দর্শনযোগ্য সকল স্থানে গো-শকট গমনের পথ নাই। এক স্থানে কেন্দ্র করিয়া অধিকাংশ দর্শনযোগ্য স্থান পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হয়। শীতকালে কুম্ভীরের উপদ্রব থাকে না, কিন্তু ব্যাঘ্রের ভয় কিঞ্চিৎ বিদ্যমান থাকে। সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কেন্দ্রস্থলে আগমন করার বিশেষ প্রয়োজন।

ইংলিশবাজার বা মালদহ সদর।

মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্, মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সদাশয় ব্যক্তি। তিনি মালদহের মকদুমপুর নামক মহল্লায় বাস করেন। তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার দ্বারা বাসস্থানের সুবিধা পূর্ব্বেই করিয়া লইলে গৌড় পাণ্ডুয়া দর্শকগণের বহুকষ্টের লাঘব হইবে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইংলিশবাজার টাউনে সকল প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথেষ্ট পাওয়া যায়। কোন দ্রব্যের অভাব হইবে না। মালদহ সদরে ও তন্নিকটবর্ত্তী মহল্লায় মধ্যে মধ্যে কলেরা ও বসন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। নবাগত ভ্রমণকারীর পক্ষে এখানে আগমনের পূর্ব্বে কোন সংক্রামক পীড়া বিদ্যমান আছে কিনা তৎসংবাদ গ্রহণেরও বিশেষ আবশ্যক।

ইংলিশ বাজার।

(কেন্দ্র)

ইহা মালদহ জেলার সদর ষ্টেশন। ম্যাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, মুন্সেফ প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণের কর্ম্মস্থান যে স্থানে বিদ্যমান, সেই প্রাচীর-বেষ্টিত দ্বিতলগৃহটি পূর্ব্বে রেশমকুঠি ছিল।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রংরেজা বা রংরেজাবাদ একটি বাণিজ্য স্থান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। যৎকালে ডাক্তার বুকানন হামিল্টন মালদহে আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে

বর্ত্তমান মালদহ জেলার অর্দ্ধেক দিনাজপুর কালেক্টরির এবং অর্দ্ধাংশ পূর্ণিয়ার কালেক্টরির অধীন ছিল।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে শিবগঞ্জ, কালিয়াচক, ভোলাহাট প্রভৃতি থানাগুলি পূর্ণিয়ার এবং মালদহ (পুরাতন) বামনগোলা প্রভৃতি থানা দিনাজপুরের অধীন এবং রোহণপুর চাঁপাই রাজসাহীর অন্তর্গত ছিল। ১৮১৩ সালেই মার্চ্চ মাসে মালদহ জেলা গঠিত হয়। এক জন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, এক জন ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট এবং এক জন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। ১৮৩২ সালে ট্রেজারি. স্থাপিত হয়। ১৮৭৫ খৃঃ গঙ্গা মালদহের পশ্চিম সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় (ত্রিশ-বৎসর পূর্ব্বের সীমা হইতে ⅙ অংশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়)।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমকুঠি এই স্থানে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান সদর কাছারী বাড়ী ও চতুর্দ্দিকের প্রাচীর ও প্রাচীরের চারিকোণে কামান রাখিবার বন্দোবস্ত হয়।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেসিডেন্স হাউস মিঃ টমস হেঞ্চম্যান (Mr. Thomas Henchman) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। প্রথমে ইহা রেশমকুঠির ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন এদেশী কর্ম্মচারিগণের "সফেদার" (Lace work) কার্য্য ইহার উপর হইত। ক্রমে "সফেদা" কার্য্যালয়টি রেশমকুঠিতে পরিণত হয়। ১৭৬০ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রেশম পালনের জন্য "বদনী"দিগকে দাদন দ্বারা উৎসাহিত করা হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কালে "সারকিট হাউস" যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডোপরি বিদ্যমান রহিয়াছে, এই স্থানে "মাইবাড়ী" ছিল, কাটনীগণ ও পাকদারগণ এই স্থানে কোয়া হইতে সূত্র বাহির করিত।

"মাইবাড়ীর" দক্ষিণভাগে "লকড়ী" থানা নামক স্থানে সেই সময়ে মাইকার্য্যের জন্য জ্বালানিকাঠ রাখা হইত। লকড়ীথানার পশ্চিমে কয়েকটি সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইংরাজ কুঠিয়ালগণ কাঠবাড়ী কামান দ্বারা সুরক্ষিত করিবার কারণ নিম্নলিখিত রূপে নির্দ্দেশিত হইতে পারে—

বর্দ্ধমান রাজনন্দিনীর ছুরিকাঘাতে দস্যুদলপতি শোভাসিংহের প্রাণবিয়োগ হইবার পর (১৬৯৫—৯৬ খৃঃ) তাহার ভ্রাতা হিম্মৎসিং দলপতি হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে দস্যুগণ ও অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যগণ হিম্মৎসিংহের দলভুক্ত হয় এবং রাজমহল ও মালদহ অঞ্চলে ঐ দস্যু-গণের বহু আড্ডা স্থাপিত হয়। সেই সময়ে হিম্মৎসিংহের দল মালদহের অনেকগুলি কুঠি লুঠ করিয়া যথেষ্ট অর্থ লইয়াছিল। তৎকালে মালদহে ইংরাজ ও ওলন্দাজবণিক্‌গণের অনেক কুঠি ছিল। জবরদস্তখাঁর সৈন্যগণ দস্যুগণকে পরাজিত করিয়া দস্যুলুণ্ঠিত অর্থ প্রাপ্ত হয়। মালদহের ইংরাজ ও ওলন্দাজ কুঠিয়ালগণ নিজ নিজ সম্পত্তির দাবী করিলেও সুবাদারের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হন নাই।

এই বিবাদের পর ইংরেজার (English Bazar পরে) ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কুঠি সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত ও কামান দ্বারা সুরক্ষিত হয়।

বর্ত্তমান কাছারি বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্রস্তম্ভ বিদ্যমান আছে তাহাতে পূর্ব্ববর্ণিত Mr. Thomas Henchman নাম খোদিত আছে।

সেই সময়ে শাহাপুর, পুঁড়াটুলী প্রভৃতি স্থানের জনগণ রেশম ও রঞ্জিত রেশম বিক্রয় করিত। রেশম ও কার্পাস সূত্র-রঞ্জনকারিগণ এতদ্দেশে "রংরেজা" নামে পরিচিত। তাহাদের নামে এই স্থানের নাম "রংরেজাবাজার" হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন কাগজ পত্রেও "রংরেজাবাজার" লিখিত আছে। পরবর্ত্তিকালে ঐ স্থানের নাম "ইংলিশ বাজার" হইয়াছে।

ইংলিশ বাজার সন্নিকটস্থ দর্শনযোগ্য স্থানসমূহ।

(১) দাতব্য চিকিৎসালয়, (২) সিংঙ্গাতলা, (৩) খুরসেদ্ জাহানুমা লেখক এলাহী-বক্সের বাসস্থান, (৪) মীরের চকস্থিত গোলাম হোসেনের সমাধি, (৫) শ্রীপাট গয়েশপুর।

পরিচয়।

(১) দাতব্য চিকিৎসালয়।

এইস্থানে রিয়াজ-উস্-সালাতিন লেখক গোলামহোসেনের বাসভবন ছিল।

সাকিট হাউসের পশ্চিমে সরকারী রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে মিউনিসিপালিটির দাতব্য চিকিৎসালয় বিদ্যমান। এই স্থানে মৌলবী গোলাম হোসেনের বাসভবন ছিল। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী ছিলেন—বিখ্যাত "রিয়াজ-উস্-সালাতিন" নামক ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

(২) সিঙ্গাতলা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রংরেজাবাজারস্থ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক এই স্থানে একটি নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নীলকুঠি সন্নিকটস্থ পুষ্করিণী, বাঁধা রাস্তা ও হাউসের কিয়দংশ মাত্র বিদ্যমান আছে। একটি সমাধি ক্ষেত্রে কয়েকটি সমাধি বিদ্যমান আছে। সমাধিস্থ লেখমালায় নীলকুঠির অধ্যক্ষগণের সন্ধান প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

(৩) এলাহীবক্সের বাসস্থান।

(আঁধারপাড়া)

হাটখোলা আঁধারপাড়ায় রিয়াজ-উস-সালাতিন লেখক গোলাম হোসেনের ছাত্র মুন্সি আবদুল করিম সাহেবের ছাত্র মৌলবী এলাহী বক্সের সুন্দর বাসভবন ছিল। তিনি খুর-সেদ-জাহানুমা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহা পৃথিবীর ইতিহাস; এই ইতিহাস মধ্যে গৌড় ইতিহাসের অনেক নূতন কথা আছে। অদ্যাপি এই গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশিত হয় নাই বা মূলও প্রকাশিত হয় নাই। ইহার কিয়দংশ—এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে প্রকাশিত হইয়াছে। মৌলবী সাহেব মালদহ গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলের মৌলবী ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। তাঁহার বাসভবনে বহুসংখ্যক গৌড় পাণ্ডুয়াস্থ শিলালিপির ছায়া চিত্র ছিল। তাঁহার নিকট গৌড় ও পাণ্ডুয়ার অনেক পুরা-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার

বাসভবনের প্রাঙ্গণে অনেক গুলি ইষ্টকগ্রথিত সমাধি ছিল, এক্ষণে নাই। বাসভবনের সন্নিকটে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৪) গোলাম হোসেনের সমাধি।

(মিরেরচক্)

ইংলিশ বাজার সহরের উত্তরাংশে মিরেরচক্ নামক পল্লী, এই স্থানে বিরাজ-উস্-সালাতিনলেখক গোলাম হোসেনের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। হিজরী ১২৩৩ সালে ইংরাজি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস অযোধ্যার অন্তর্গত যোধপুর। আবদুল করিম তাঁহার সমাধিস্থ শিলালিপির রচয়িতা। ইহাতে সংক্ষেপে তাঁহার মৃত্যুর সন লিখিত আছে—তাহার অর্থ—

"মুন্সী পৃথিবী ত্যাগ করিলেন।"

(৫) শ্রীপাট গয়েশপুর।

ইংলিশ বাজারের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মহানন্দাতীরে 'গয়েশপুর' নামক গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীমৎ বীরভদ্র গোস্বামী প্রভু একবার মালদহ আগমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ রামকেলীগ্রামে কেশব ছত্রীর সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেশবপুত্র দুর্ল্লভ ছত্রী যে সময়ে গয়েশপুরে ছিলেন, সেই সময়ে বীরভদ্র প্রভু তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন বলিয়া প্রবাদ রহিয়াছে; এবং এই উপলক্ষে গয়েশপুরের আমবাগানে একটি মহোৎসব হইয়াছিল। শুনা যায় দুর্ল্লভ ছত্রী উক্ত আমবাগানটি বীরভদ্র প্রভুকে দান করেন। সেই সময় হইতে গয়েশপুর "শ্রীপাট" নামে খ্যাত হয়। ঐ সময়ের পূর্ব্ব হইতে গয়েশপুরে "নেড়া নেড়ীর" একটি বড় আখড়া ছিল। বর্ত্তমান দোলমঞ্চ যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থান ব্যাপিয়া তাহাদের আখড়ার স্থান। তাহারা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। মালদহ জেলায় তাহাদের যথেষ্ট অত্যাচারের কথাও প্রচলিত আছে। তাহাদের দলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই থাকিত। সকলেই মস্তক মুণ্ডন করিত। বীরভদ্র গোস্বামী তাহাদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

গয়শান নামে এক জাতি এদেশে ছিল, তাহারা এতদঞ্চলে বাস করিত বলিয়া, বা সুলতান গয়েশ উদ্দীনের নামে এই স্থানের নাম গয়েশপুর হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে বাদশাহী আমলে কিছুদিনের জন্ম টাক-শালা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইংলিশ বাজারে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাতে বা অপরাহ্নে পাদচারণ কালে উপরোক্ত স্থানগুলি দর্শন করা চলিতে পারে।

প্রথম শাখা ভ্রমণ পথ।

ইংলিশ বাজার হইতে মূল গৌড়-ভ্রমণ-পথের বিবরণ প্রদানের পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক স্থান সমূহের বর্ণনা পরিসমাপ্ত করিয়া মূল গৌড় ভ্রমণপথের পথিক হইব।

(১) বাগবাড়ী।

প্রাতঃ বা সান্ধ্য ভ্রমণ উদ্দেশ্যেও বাগবাড়ী ভ্রমণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বাগবাড়ী হইতে প্রাচীন রামাবতী পর্যান্ত ভ্রমণ করিতে হইলে শকট যোগে গমন করাই প্রশস্ত। ইংলিশ বাজার হইতে বাগবাড়ী দুই মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

ইংলিশ বাজার হইতে রাজমহল রোড দিয়া কিয়দ্দূর পশ্চিমে গমন করিলে 'রথবাড়ী" নামক স্থানে পোঁছান যায়। এই স্থানে দর্শনযোগ্য প্রাচীন ধরণের একটি সুবৃহৎ রথ ছিল। উহাতে বহুসংখ্যক কুৎসিত মূর্ত্তি থাকাতে কয়েক বৎসর হইল উহা ভাঙ্গিয়া মহানন্দায় বিসর্জ্জন করা হইয়াছে। এই 'রথবাড়ী' হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গমন করিলেই দূরে বাগবাড়ীর উন্নত মৃত্তিকা গড় (গোঁসাঞি গড়) দর্শকগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তৎপরে রাজমহল রোড্ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া উন্নত "গয়েশ উদ্দীন কজওয়ে" নামক গড়ের উপর দিয়া পশ্চিমে প্রসারিত রহিয়াছে।

গয়েশ উদ্দীন কজওয়ে

সুলতান গয়েশ উদ্দীন ইহার নির্ম্মাতা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কিন্তু ইহা গয়েশ উদ্দীন কৃত নহে। এই গড় "গোদরাইস" বা "গোদ-আইল" নামক প্রাচীন উন্নত "গড় পথ" ছিল। ইহা দক্ষিণ পূর্ব্বে গোদরাইল বিলের উত্তর ও উত্তর পূর্ব্বাংশ বেষ্টন করিয়া "রাই-পুর" নামক পল্লীর দক্ষিণ "বুরুজ" গড়ের অনতিপূর্ব্বে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে লুপ্তপ্রায় চিহ্নদর্শনে বোধ হয় ইহা সুন্দরাবাড়ী, পোড়াবাড়ী, গোহালবাড়ী, খালিমপুর, ভগবতীপুর দিয়া ভাতিয়া বিলের উত্তরাংশ বেষ্টন করিয়া প্রসারিত ছিল। ইহারই একাংশের নাম "ঠাকুর প্রসাদের গড়", সুলতান গয়েশ উদ্দীন মালদহের এই গড়ের সংস্কারক, নির্ম্মাতা নহেন।

এই গড় পশ্চিমে পিছলী গঙ্গারামপুর, হরিপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই গড়ের উপর দিয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত রাজমহল রোড প্রসারিত রহিয়াছে। এই গড়ের গতি বক্র রেখার ন্যায়। রাজমহল রোড দিয়া কিছু পশ্চিমে গমন করিলেই বাগ্‌বাড়ী গড়ের দক্ষিণ সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। গড়ের উত্তরাংশের গভীর পরিখা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। গড়ের অংশ ত্যাগ করিয়া বক্রভাবে কিঞ্চিদ্দক্ষিণ মুখে, তৎপরে পশ্চিম ও উত্তর মুখে গমন করিয়া বাগবাড়ীর দক্ষিণ তোরণদ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়। এই তোরণ দ্বার হইতে একটি উন্নত গড় দক্ষিণ দিকে সরল রেখার ন্যায় দ্বারবাসিনী (লক্ষণাবতীর উত্তর তোরণ গড়) গড়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। •

• বাগবাড়ী গড়টি এক বর্গ মাইল পরিমাণ ভূভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহা প্রায় সমচতুর্ভুজাকার চতুর্দ্দিকে গড় ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঠিক মধ্যভাগ অন্য একটি উন্নত গড় দ্বারা সমগ্র বাগবাড়ী দ্বিভাগে বিভক্ত। গড় উচ্চতায় উপস্থিত ২০ ফিট, তলদেশ ১৫০ ফিট, উর্দ্ধাংশ ৫০ ফিট মাত্র। গড়ের বাহিরের পরিখা ৭৫ ফিট প্রশস্ত।

বাগবাড়ীর পূর্ব্বভাগের গড়টিকে গোসাঞি গড় বলে। মধ্যভাগের গড়কে মাঝের গড় এবং পশ্চিমের গড়টিকে ফুটকলাই গড় বলে।

তোরণ দ্বার

বাগবাড়ী গড়ের দক্ষিণ ভাগের মধ্যস্থল হইতে একটি গড় দ্বারবাসিনী পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। এই গড় যে স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, মানচিত্রে সেই স্থানটি লাল বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে। উক্ত অংশে একটি বিশাল বট বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল। উক্ত বৃক্ষের প্রায় ৪০ ফিট উচ্চে প্রাচীন তোরণ দ্বারের বহু ইষ্টক আবদ্ধ থাকিতে দেখিয়াছিলাম। আমার মাতুল স্বর্গীয় গোষ্ঠবিহারী সেন উকিল মহাশয় আমাকে প্রথম মালদহ পদার্পণ কালে উক্ত অংশ দেখাইয়া উহা যে বাগবাড়ীর তোরণ দ্বারের কিঞ্চিৎ অবশিষ্টাংশ তাহা বলিয়াছিলেন। উপস্থিত সেই বৃক্ষটি আর নাই, কিন্তু উক্ত অংশের মৃত্তিকার যথেষ্ট ইষ্টক অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বাগবাড়ী ও তোরণ দ্বারের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমাকে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রত্নতত্ত্বে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

ভাতশরা

তোরণ দ্বার অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তরে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দেখা যায়, ইহার নাম "ভাতশরা"। কোন কোন ঐতিহাসিক ইহাকে "ভট্টশালা" বলিতে চাহেন। বাস্তবিক ইহা ভট্টশালা কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ এই পুষ্করিণীতে বাগবাড়ী ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইত, এবং শ্রাদ্ধের দিবস রাত্রে একটি মৃৎপাত্রে আমিষযুক্ত অন্ন ও একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ এই স্থানে প্রদত্ত হইয়া থাকে। মৃতব্যক্তির প্রীত্যর্থে এই প্রকার সংস্কার এতদঞ্চলে সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই "ভাতশরা" হইতেই উক্ত নামের উদ্ভব হইয়াছে। এই জলাশয় নরকঙ্কালে পরিপূর্ণ। এই স্থানের অনতি উত্তরাংশে

টামনা দীঘি

নামে একটি উত্তর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ নাতি বৃহৎ দীর্ঘিকা বিদ্যমান রহিয়াছে। উত্তরাংশে বাঁধান ঘাট ছিল। দীঘির সন্নিকটে একটি পীরের ক্ষুদ্র স্থান আছে। সম্ভবতঃ উহা "টমনা গাজি" বা পীরের দরগা ছিল।

নরসিং কূপা

বাগবাড়ী গড়ে দর্শনযোগ্য বিশেষ কোন স্থান বা চিহ্ন বিদ্যমান নাই ও অনেকগুলি ছোট বড় পুষ্করিণী এবং অতীতের চিহ্নস্বরূপ ইষ্টকাদি ও বিবিধ রঞ্জিত, মিনাকরা মৃৎপাত্র চূর্ণ পতিত থাকিতে দেখা যায়। গড়ের উত্তর ও পূর্ব্বাংশের উপরি ভাগে একটি বাঁধান কূপ বিদ্যমান ছিল উহা সুগভীর এবং উক্ত কূপমধ্য দিয়া গড়ের নিম্নস্থিত অট্টালিকায় প্রবেশ করা যাইত। এই কূপের নাম, "নরসিংকূপা"। সম্ভবতঃ "নৃসিংহ কূপ" নামে খ্যাত ছিল। এই স্থানে বহু ইষ্টক দৃষ্ট হয়। গড়ের বাহিরে উত্তর দিকের একটি পুষ্করিণীকেও "নরসিং কূপা" বলিয়া থাকে।

ভাতুরায় থান

গড়ের উত্তরাংশের এক স্থানে "ভাতুরায়ের থান" বিদ্যমান আছে। গড়ের বহু স্থানে সুরকি ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাগবাড়ী সম্বন্ধে দুচারিটি কথা

পূজনীয় গৌড়-ইতিহাস-লেখক মহাশয় বাগবাড়ীটি রাজা বল্লাল সেনের বাগানবাড়ী বলিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা বাগানবাড়ী। কিন্তু বল্লাল সেনের কি না বলা যায় না। সম্ভবতঃ বাদশাহী আমলে ইহা বাগ বা বাগান রূপে ব্যবহৃত হইত। বাগবাড়ীর পূর্ব্বে কুমারবাগ নামক স্থান। মালদহের বিখ্যাত আম্রের আদি জন্মস্থান কুমারবাগ এবং জঙ্গলী-বাগ বা জঙ্গলাবাদ ও বেগজাবাদ।

শ্রীযুক্ত র‍্যাভেন্‌শা হাণ্টার প্রমুখ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বাগবাড়ীকে বল্লালবাড়ী বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বল্লালবাড়ী নাম কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন বলা যায় না। ঢাকা জেলায় একটি বাগবাড়ী আছে, এবং বৰ্দ্ধমান জেলায় কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত দাঁইহাট ও পাইপাড়া পল্লীর মধ্যে গড় বেষ্টিত বাগবাড়ী নামক এক প্রাচীন স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ "বাগবাড়ী" বাগান বাড়ী ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

বসন্ত কোট

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল, এম, আর, এ, এস মহোদয় অনুমান করেন, বাগবাড়ী, বসন্তকোট নামক দুর্গের স্থান। ইহা সত্য বলিয়া বিবেচনা হয়। "সুলতান গয়েশ উদ্দিন দেবীকোট, বৰ্দ্ধনকোট, মঙ্গলকোট, পঞ্চকোট এবং বসন্তকোট দুর্গগুলির নির্ম্মাতা নহেন, সংস্কারকর্ত্তা মাত্র। গয়েশ উদ্দিনকর্ত্তৃক রাস্তা ও বসন্তকোট এক সময়ে সংস্কৃত হইয়াছিল।" জোড় বসন্ত নামক ভূভাগ বাগবাড়ীর অনতি সন্নিকটে বিদ্যমান রহিয়াছে। বসন্তকোটই পরবর্ত্তিকালে বাগবাড়ী হইয়াছে। বাগবাড়ীর সংস্থান হইতে ইহা যে পূর্ব্বকালে দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইত বেশ উপলব্ধি হয়। বসন্তকোট সম্বন্ধে মনোমোহন বাবু বলিয়াছেন, "I suspect that the place was Hindu, and a fort on it, which was repaired or rebuilt by this Mullah (Gausuddin) ; could it be the modern Ballalbari ?" (I. P. A.S.B. Vol. No. 7 July, 1909) মালদহে ভ্রমণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আমার উপলব্ধি হইয়াছে যে, বাগবাড়ী, বসন্তকোট নামক দুর্গ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

বসন্ত কোট ও জোড় বসন্ত

বাগবাড়ীই বসন্ত কোট

অষ্টভুজা মূর্ত্তি

বসন্ত কোট বা বাগবাড়ীর উত্তরে গোসাঞিবাগে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানের কয়েকটি পাষাণ মূর্ত্তির মধ্যে একটি অষ্টভুজা পাষাণ মূর্ত্তি

বিগুমান আছে। স্থানীয় জনগণ ঐ মূর্ত্তিটিকে কালীমূর্ত্তি বলিয়া পূজা করে। ইহার পশ্চিমে "গণিপুর" নামক প্রাচীন জৈন পল্লী ছিল।

কাজল দীঘি

বাগবাড়ী হইতে পশ্চিমে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিলে রাজমহল রাজপথের উত্তরে বনাবৃত উন্নত পাহাড় দৃষ্ট হয়, উহাই কাজল দীঘির পাড়। বাগবাড়ীর তোরণ দ্বার হইতে যে গড় পশ্চিম দিকে রামাবতী অভিমুখে প্রসারিত ছিল, উক্ত প্রাচীন উন্নত পথের অনুসরণে রাজমহল রোড নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ গড়ের এক অংশের নাম "পাথালে গড়"। পাথালের

পাথালে গড়

দক্ষিণে বিল, উত্তরে পূর্ব্বে লোকালয় ছিল। যে স্থানে লোকালয় ছিল, সেই অংশের ভূভাগ খনন কালে যথেষ্ট ইষ্টক দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থানীয় জনগণ বলিয়া থাকে, যে সময় রাজমহল রোড নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎকালে গ্রামবাসীদিগকে 'বেগার ধরা' হইয়াছিল; রাস্তা নির্ম্মাণের পর পথিক ও গোশকট-চালকগণের নিকট হইতে পথকর আদায় করিবার ফাঁড়ী বসিয়াছিল। পাথালে গড় হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে উক্ত গড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান কালে বিগুমান নাই। এই স্থানের ভূমি যথেষ্ট নিম্ন ও উত্তরে মালিদা বিল ও দক্ষিণে গোদরাইল বিলের পশ্চিমাংশ একত্রে মিলিত হইয়াছে। প্রাচীনগণ বলেন, পূর্ব্বকালে এই স্থানে একটি দাঁড়া (খাল) বিগুমান ছিল। কালিন্দী নদী হইতে 'হাহাজান' নামক একটি জলস্রোত ঐ দাঁড়া দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোদরাইল বিলে মিলিত হইত। এই অংশে গুজার পড়িত।

কাজল দীঘির পশ্চিম অংশ হইতে একটি উন্নত গড় দক্ষিণস্থ কাঞ্চনতলা, সোণাতলা নামক 'কাটাল' অভিমুখে প্রসারিত রহিয়াছে, এবং ঐ গড়টি উত্তরে কোতোয়াল ও দৈবকীপুর নামক প্রাচীন স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই পথে কালিন্দী তীরে গমনাগমন করা চলিত।

কাজল দীঘির পশ্চিম-দক্ষিণাংশ উন্নত ও প্রাচীনকালে লোকাবাসপূর্ণ ছিল। এই স্থানের

হরিপুর বা হরিকোটী

নাম 'হরিপুর'। অনেকে অনুমান করেন গঙ্গাতীরের "হরিকোটী" নামক প্রাচীন স্থানই বর্ত্তমান কালে "হরিপুর" নামে খ্যাত হইয়াছে।

কাজল দীঘি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, গভীর ও সুপ্রশস্ত। সম্ভবতঃ জলকর অংশই ৫০।৬০ বিঘা পরিমাণ হইবে। ইহার চারিদিকে চারিটি বাঁধান ঘাট ছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজল দীঘি নামে মালদহে দুইটি জলাশয় দৃষ্ট হয়। অন্য একটি কাজল দীঘি "গৌড়হণ্ড" নামক প্রাচীন স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এই কাজল দীঘিই সুপরিচিত। বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে এতদঞ্চলের জনগণ কাজল-দীঘিতে স্নানার্থ আগমন করিয়া থাকে; ইহা প্রাচীন প্রথা। ইহাতে খোঁস, চুলকানী আরোগ্য হয়, লোকের এরূপ বিশ্বাস। "কাজলঠাকুরাণী" দেবীর উদ্দেশে কলার কাঁদি ও নির্জ্জলা দুগ্ধ ইহার জলে অর্পণ করিয়া মানস শোধ করা হয়, অথবা গৃহস্থের মঙ্গলকামনা করা হয়। অনেকে বলেন, কাজলদীঘি সেনরাজগণের খনিত। উক্ত দীঘির মধ্যভাগে জলমধ্যে একটি প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ আছে। উহা দৃষ্ট হয় না।

খানকীমহল, খালিমপুর, দাউদবাড়ী
তামলীভিটা, কোতোয়ালী

কাজল দীঘির পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ পূর্ব্বকালে বহুসংখ্যক লোকাবাসে পূর্ণ ছিল, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থান হইতেই 'রামাবতী' নগরীর আরম্ভ ধরা যাইতে পারে।

খানকীমহল

কাজল দীঘির অনতিপশ্চিমে বহু পুষ্করিণী পরিশোভিত বনভূমি অধুনা পরিস্কৃত করিয়া চাষ আবাদ চলিতেছে। এই স্থানে কয়েকটি 'বাদশাদাগী' ও 'খানকীদাগী' আম্র বৃক্ষ ছিল। বাদশাহী আমলে ঐ বৃক্ষে বাদশাহী শোঁটা লম্বিত ছিল। ঐ বৃক্ষের আম বাদশাহ ব্যবহার করিতেন। বাদশাহী আমলে বেশ্যাপল্লী ছিল*।

খালিমপুর

কাজল দীঘির সন্নিকট হইতে একটি উন্নত গড় খানকীমহল ও খালিমপুরের মধ্য দিয়া গঙ্গারামপুর কাটালাভিমুখে প্রসারিত আছে। পূর্ব্বে ঐ অংশ রাজমহল গমনের পথ রূপে ব্যবহৃত হইত।

দাউদবাড়ী

কাজল দীঘির পশ্চিমাংশ হইতে যে উন্নত গড় উত্তর দিকে প্রসারিত, তাহার

গড়ের পূর্ব্বাংশ

যে অংশ কাজল দীঘির অনতি উত্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারই

ইষ্টকমণ্ডিত

পূর্ব্বভাগ মানীহাবীরের পশ্চিম অংশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই অংশের পূর্ব্বভাগ ইষ্টকমণ্ডিত ছিল। উক্ত অংশের ভূমিখনন কালে আমি স্বচক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক গ্রথিত থাকিতে দেখিয়াছি, এবং কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত অংশের অনুসরণ করিয়া বুঝিয়াছি যে প্রাচীন গড়টি ইষ্টকমণ্ডিত ছিল। সম্ভবতঃ রামাবতীর পূর্ব্ব দিকের এইটিই সীমান্ত গড় ছিল। এই গড় অবলম্বনে উত্তরে গমন করিলে নিমাশরাই হইতে

অমর দীঘি

অমৃত রাস্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সংযোগ স্থানের অনতিপূর্ব্বে

দাউদবাড়ী

"অমর দীঘি" এবং অমর দীঘির পশ্চিমে পরিখা ও লুপ্তচিহ্ন প্রায় অনুচ্চ গড়দ্বারা সীমাবদ্ধ সুবিস্তীর্ণ ভূভাগই 'দাউদবাড়ী' নামে খ্যাত।

দাউদ খাঁ প্রথমে এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তৎপরে গৌড় বাদশাহী প্রাপ্ত হন। 'দাউদবাড়ী' তাঁহারই জন্য যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নহে, এই স্থানে একটি দুর্গবৎ আমির ওমরাহের বাসভবন ছিল। দাউদ খাঁ এই স্থানে নজরবন্দী হইলেন। তাঁহারই নামে এই স্থানের নাম "দাউদবাড়ী" হইয়াছে।

* খানকীমহল—খানাগী মহল বা পেটভাতা মহল অর্থে প্রযুক্ত হয়, এরূপ স্থলে বেশ্যাপল্লী না হওয়াই সম্ভব। (সম্পাদক)

চৌদোয়ার

নগরের অনতি উত্তরে প্রাচীন নদী স্রোত (দাঁড়া) ও টানের বা বিলের দ্বারা সুরক্ষিত সুবিস্তীর্ণ উন্নত ভূখণ্ডকে চৌদোয়ার বলে। এই স্থান হইতে গঙ্গা পারাপারের বিখ্যাত ঘাট ছিল। এই ঘাটসন্নিকটে চতুর্দ্বারসমন্বিত একটি দুর্গ ছিল। যাত্রিগণকে এই দুর্গের অভ্যন্তর দিয়া নগর, পিছলী, গঙ্গারামপুর, পাণ্ডুয়া, মালদহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানে গমন করিতে হইত। এতদঞ্চল হইতে কাকজোল, পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করিতে হইলেও ঐ চৌদোয়ার মধ্য দিয়া গমনে বাধ্য হইতে হইত। এই স্থানে "ছাপঘাটি" ছিল, অর্থাৎ নৌকাযাত্রিগণের লোটটোল কর এই স্থানে গ্রহণের বন্দোবস্ত ছিল। এই স্থানের সন্নিকটেই 'ছাপঘাটি' নামক স্থান। এই স্থান ও পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে লোকবাসের যথেষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানের পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর ভাগ নদী পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ দেয়াড় ভূমি ও বহুসংখ্যক খাল বিলে পূর্ণ।

ভ্রমণকারিগণ রামাবতী ভ্রমণব্যপদেশে এই চৌদোয়ার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারেন। তৎপরে সম্বরপুর ও পাথরা বাহারাণ ভ্রমণ একদিনে সম্ভবপর নহে। পাথরা বাহারাণ এই স্থান হইতে ৮।৯ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

সম্বরপুর

চৌদোয়ার হইতে তিন ক্রোশ উত্তর পশ্চিম। তথায় সম্বরবাসিনী দেবীর পীঠস্থান বিদ্যমান আছে। অতিরিক্ত ব্যাঘ্রভীতি নিবন্ধন সচরাচর কেহ এই বনপ্রদেশে গমন করেন না। এক্ষণে বনভূমি অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকেই টান বা বিল।

পাথরা বাহারাণ

সীরাজ ও দানশা ফকিরের স্মৃতিবিমণ্ডিত দানশার মসজিদ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা অতি কদর্য্য স্থান। দেয়াড় ভূমির মধ্যস্থ বলিয়া খাদ্যাভাব।

তামলীভিটী চাকলা

দাউদবাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বের পরীখাট গঙ্গারামপুরের মধ্য দিয়া কালিন্দী বা অমৃতী নালার মোহানার সহিত সম্মিলিত ছিল। দাউদবাড়ীর উত্তরে "তামলীভিটী" নামক উন্নত স্থান। এই স্থান হইতেই "কোতোয়ালী" ও "চাকলার" সীমারম্ভ।

কোতোয়ালী

অতি প্রাচীনকালে গৌড় যখন ধনে জনে পূর্ণ ছিল, তৎকালে নগরের উত্তর ভাগের কোতোয়াল ও আদালত এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং অদ্যাপি এই স্থানে একটি বৃহৎ ইমামবাড়ী ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে এই স্থান চিনির কারখানার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। গৌড় ভ্রমণকালে রামাবতী ভ্রমণ উদ্দেশে কোন ভ্রমণকারী এতদঞ্চল পরিভ্রমণ করেন না। এই স্থানসমূহে দর্শনযোগ্য ও বর্ণনীয় বিষয় যথেষ্ট বিদ্যমান থাকিলেও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় কেবলমাত্র নামোল্লেখ করা হইল; কারণ

মালদহপল্লীকাহিনী বর্ণনকালে উক্ত স্থানসমূহের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। 'পল্লীকাহিনী' পাঠকগণের সুবিধার্থে উক্ত স্থান সমূহের পথপরিচয় মাত্র লিখিত হইল।

রামাবতী—অমৃতী

কাজল দীঘি হইতে যে পথ রাজমহল অভিমুখে প্রসারিত, সেই পথ অবলম্বনে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে অমৃতী নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। এই পথের উভয় পার্শ্বেই প্রাচীন পল্লী বা নগরসমূহ বিদ্যমান ছিল ইহাদিগের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইংলিশ বাজার হইতে অমৃতী ৬ মাইল দূরবর্ত্তী। এই অমৃতী বা অমরতী প্রাচীন রমতী বা রামাবতী নগর। এই স্থানে বাজার দোকান, পোষ্টাফিস আছে। অমৃতী নালা এই স্থান হইতেই দক্ষিণ মুখে প্রসারিত আছে। গো-শকট ত্যাগ করিয়া রামাবতীর উত্তর অংশ পরিভ্রমণে বহির্গত হইতে হয়।

ব্রহ্মপুরী

কানাইপুর, ভগীরথপুর, গঙ্গারামপুর, পীছলী প্রভৃতি প্রাচীন রামাবতীর মহল্লাসমূহ উক্ত অংশে গঙ্গারামপুরের কাটাল নামে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত "ব্রহ্মপুরী" অমরতীর দক্ষিণ পশ্চিমে দেয়াড় ভূমিতে বিদ্যমান। এই অমৃতীর পশ্চিম পার্শ্ব এক সময়ে গঙ্গার লীলাভূমি ছিল। এই স্থান হইতে রাজমহল ঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গার দেয়াড় ভূমি।

গৌড়পতি রামপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য কানুদেব ও শিবরাজের পরামর্শে ও কতিপয় নরপতির সাহায্যে পালরাজ্য-অপহরণকারী ডমরপতি ভীমকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শ্রীহট্ট শ্রীহিতুরাজ চণ্ডেশ্বরের পরামর্শে এই 'রামাবতী' পুরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'বরেন্দ্রী কৃতাতঙ্ক' রামাবতী পুরীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য যদিও বর্ত্তমানে বিদ্যমান নাই, যদিও প্রাচীন রামাবতীর রাজপ্রাসাদ ও প্রধান মহল্লাগুলি ভাগীরথীগর্ভে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তথাপি রামাবতী ভ্রমণকালে দর্শকগণের আনন্দ ও বিষাদ যুগপৎ উপস্থিত হইবে, তাহা বলিতে পারা যায়।

রামাবতী ভ্রমণ

কানাইপুর, চাঁদনীবাড়ী, গোলাঘাট, ভগীরথপুর

অমরতী নামক স্থানে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য কোন কিছু নাই। মানচিত্রে অশ্বখুরাকার যে ঝিলের চিত্র অঙ্কিত আছে, ইহাই দেখিবার ও চিন্তা করিবার বিষয়। প্রাচীন "রামাবতী" গঙ্গাপ্রবাহে যৎকালে পয়স্থ হইতেছিল, খুব সম্ভব সেই সময়ে মুসলমান গৌড় ও লক্ষ্মণাবতীর পশ্চিমপ্রান্তও সিকস্থি হইয়াছিল। বর্ত্তমান "অমৃতীনালা" (বুড়ীগঙ্গা) এবং সাদুল্লাপুরের গঙ্গা প্রকৃত ভাগীরথী স্রোত ছিল। রামাবতীর উত্তরে কালিন্দী সম্ভবতঃ প্রাচীন দাঁড়া; উত্তরে সম্বরপুরের বীল, মহানন্দা, পদ্মা, কৌশিকী প্রভৃতির সঙ্গমস্থল ছিল।

কানাইপুর

অমৃতীর অনতি উত্তরে 'কানাইপুর' গ্রাম। শ্রীযুক্ত ঝুমুকলাল ও হারাধন সাহ এই পল্লীর সম্ভ্রান্ত অধিবাসী। তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিলে তাঁহারা যত্নের সহিত প্রাচীন রামাবতীর

ধ্বংসাবশিষ্ট চিহ্নসকল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমি তাঁহাদেরই সাহায্যে উক্ত অঞ্চল ভ্রমণ করিয়াছিলাম।

ভগীরথপুর

কানাইপুর হইতে অনতি উত্তরে গমন করিলে ভগীরথপুরের কাটালে উপস্থিত হওয়া যায়। কালীমন্দিরের চিহ্ন এবং পূর্ব্বভাগে একটি ধ্বংসপ্রায় মস্‌জেদ দৃষ্ট হয়। ভগীরথপুর ভাগীরথী-তীরে বিদ্যমান ছিল। যে স্থানে বহু দেবালয়, "চাঁদনীবাড়ী", "গোলাঘাট" প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল, অধুনা তথায় বিশেষ কোন চিহ্ন বিদ্যমান না থাকিলেও প্রাচীন স্মৃতি জাগরণের জন্য কতিপয় চিহ্ন নাম মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। গৃহভিত্তির চিহ্নস্বরূপ যথেষ্ট মৃত্তিকা-প্রোথিত ইষ্টক বিদ্যমান রহিয়াছে। এই অংশে পুষ্করিণীর সংখ্যা নিতান্ত কম। গঙ্গার অতি সন্নিকটে বলিয়াই সম্ভবতঃ এই প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই চাঁদনীবাড়ী ও গোলাঘাটে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে, আশ্বিন মাসে ভগবতী পূজার বাইচ হইত। অতি পূর্ব্বকালে পশ্চিমে গমনাগমনের সময় এই স্থানের পার্শ্ব দিয়াই নৌকা চলিত—এই স্থানের বাজার হইতে রেশম, পিতল, কাঁসা ও কড়ি নির্ম্মিত বহু দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় হইত।

পীছলী ও গঙ্গারামপুর

ভগীরথপুরের উত্তরে গঙ্গারামপুর ও পীছলী (পেশল)। পীছলী নামক স্থানের অধিকাংশ গঙ্গা ও কালিন্দী প্রবাহে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। গঙ্গারামপুর সুপ্রশস্ত উন্নত ভূখণ্ড; উত্তরে কালিন্দী, পশ্চিমে সুবৃহৎ ঝিল, দক্ষিণে ভগীরথপুর। সামান্য পীছলী নামক স্থান ও সমগ্র গঙ্গারামপুর ইষ্টকাদি পরিব্যাপ্ত, অনেকগুলি পুষ্করিণী, কৃত্রিম খাত, প্রাচীন পাকা রাস্তা, প্রাচীন সেতু, মস্‌জেদ, দেবালয়াদিতে শোভিত ছিল; অদ্যাপি ইহাদিগের যথেষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন পরিখা ও গড় এই স্থানের পূর্ব্বপ্রান্ত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পুষ্করিণীগুলির ঘাট বাঁধান ছিল। পীছলী গঙ্গারামপুরের মধ্য দিয়া একটি প্রশস্ত পাকা রাজপথ দৈবকীপুর কোতোয়ালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথ দিয়া নিমাশরাই গমনাগমন করা চলিত।

কালুপাহালমানের দরগা

পীছলী গঙ্গারামপুরের দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে কালুপাহালমানের দরগা উল্লেখযোগ্য। ঝিলের অনতি সন্নিকটে এবং দরগার দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। কালুর নামে যে মস্‌জেদটি খ্যাত, তাহার কিয়দংশ মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে প্রস্তর অপেক্ষা ইষ্টকের প্রাধান্যই অত্যধিক দৃষ্ট হয়। আজিও বহু বিদেশী মুসলমান ভক্তিপূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া নমাজ করিয়া থাকেন। মস্‌জেদ অভ্যন্তরের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বহুসংখ্যক প্রাচীন 'কুঁজো' ভগ্ন অভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে।

এই দরগায় অক্ষরমালা খোদিত একখানি দীর্ঘ শিলা-ফলক বিদ্যমান আছে। ইহাতে কোরানের বায়েত খোদিত রহিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৭ ফিট ও প্রস্থে ১ ফুট ২½ ইঞ্চি। প্রস্তরে খোদিত তারিখ ৬৪৭ হিজিরা বা ১২৪৯ খৃষ্টাব্দ।

মস্‌জেদের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একখণ্ড সুবৃহৎ চিত্রবিচিত্র প্রস্তর পতিত আছে। ইহা মস্‌জেদের কোন অংশ নহে।

হজরত সাহ জালাল উদ্দিনের তাকিয়া

'তাকিয়া' আস্তানার এক প্রকার সংস্করণ মাত্র। প্রবাদ এই হজরৎ সাহ জালাল উদ্দিন নামক একজন সিদ্ধ-ফকির গৌড়দেশে সর্ব্বপ্রথমে আগমন করিয়া এইস্থানে কোন অলৌকিক কার্য্য দেখান এবং এই স্থানে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া পাণ্ডুয়া (পাণ্ডুনগর) গমন করেন, সেই সময় হইতে এই স্থানের পবিত্রতা বিঘোষিত হইতেছে। কালুপাহালমানের দরগা ও তাকিয়া একত্রে সংবদ্ধ। যেস্থানে সেখ দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানটি "তাকিয়া" নামে খ্যাত।

"চতুর্ব্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈকশতান্বিকে।
বেহার পাটনাৎ পূর্ব্বং তুরুষ্ক সমুপাগতঃ॥"
(শেখশুভোদয়া)

পীছলী গঙ্গারামপুরের এই অংশ হইতে রাজমহল পাহাড় সুদূর পশ্চিমে মেঘের ন্যায় অতি সুন্দর দেখায়। একদা রাজমহল হইতে পীছলী পর্য্যন্ত গঙ্গাপ্রবাহ বিদ্যমান ছিল। পীছলীর অন্তর্গত রামুকলাস সাহার বাগানের কাঁটাল বৃক্ষতলে একটি মানব প্রমাণ প্রস্তর মূর্ত্তি পতিত ছিল। উহা অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্ত্তি।

গঙ্গারামপুরে নীলকুঠী বিদ্যমান ছিল। নীলকুঠীর নির্ম্মাণকালে দেবালয় ও মস্‌জেদের বহু ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছিল। যে সকল প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, তাহা নীলকুঠীর নির্ম্মাণ-কালে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে।

নাগরাই কাটাল, চৌদোয়ার সম্বরবাসিনী, বাখ্‌রা বাহারাল,

পীছলী গঙ্গারামপুরের উত্তরে কালিন্দী নদী, কালিন্দীর উত্তর তীরে নাগরাই বা নগর নামক একটি সুবিস্তীর্ণ গড় ও পরিখা বেষ্টিত বহু পুষ্করিণী এবং ইষ্টকগৃহের চিহ্নে চিহ্নিত ভূখণ্ড বনাবৃত ভাবে পতিত রহিয়াছে। উক্ত স্থানের নাম "নাগরাই কাটাল।" পীছলী গঙ্গারামপুরের সহিত সম্ভবতঃ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইষ্টক প্রাসাদ শোভিত দুই মহল পৃথক্‌ভাবে মৃত্তিকা গড় বেষ্টিত 'নগর' নামে উক্ত হইলেও ইহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্তির নিতান্ত অভাব। এই স্থানের নদীও অপ্রশস্ত, উত্তর পার্শ্বেই গৃহভিত্তির চিহ্ন উন্মুক্ত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ কালিন্দী নাগরাই ও পীছলী গঙ্গারামপুরের মধ্যভাগে সামান্য দাঁড়া বা জলপ্রণালী ছিল। পরবর্ত্তিকালে ইহাই প্রশস্ত হইয়া প্রাচীন কালিন্দী স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া কালিন্দী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। নাগরাই হইতে একটি সুদীর্ঘ গড় পূর্ব্বদিকে মহানন্দাতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। এই পথে পাণ্ডুয়া ও নবাবগঞ্জে যাতায়াত করিতে হইত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস পালিত।

সভাপতির-অভিভাষণ।

(রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে পঠিত)

প্রিয় সাহিত্যিক ও সমবেত ভদ্র মহোদয়গণ,

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি যখন কুড়িগ্রামের প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন রঙ্গপুরের শাখাপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তখন মনে করিয়াছিলাম, কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে ঐ পদে বৃত করিলে আমি সুখী হইতাম; কিন্তু সম্প্রতি এই সভার সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া যখন সকলে আমাকে আমন্ত্রণ করিলেন, তখন জানিলাম, আর আমার অব্যাহতি নাই, শেষে এই গুরুভার গ্রহণের অযোগ্যতা সত্ত্বেও সভাপতির আসন-গ্রহণে স্বীকৃত হই। বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠবে সুসম্পন্না দেখিতে একান্ত অভিলাষ আছে বলিয়া আজ আপনাদের নিকট সমুপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য যেরূপ মহান্ ও বহু বিস্তৃত এবং দিন দিন ইহার কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ প্রসারিত হইতেছে, এবং আশা যেরূপ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, ভবিষ্যতে রঙ্গপুরের ন্যায় শাখা সভা বঙ্গের প্রতি জেলায় স্থাপিত না হইলে উপযুক্তরূপে কার্য্য চলিতে পারে না। সুতরাং শাখা সভা যতই সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়, এবং কার্য্যক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হয়, মূল সভার পক্ষে ততই মঙ্গল ও উৎসাহবর্দ্ধক হইবে।

এই সভার কার্য্যপ্রণালী ও অনুষ্ঠিত কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া নিঃসংশয়রূপে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার প্রতি জেলায় এইরূপ শাখা সভা যখন স্থাপিত হইবে, তখন বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে এক নবযুগের আবির্ভাব হইবে। মূল সভার উদ্দেশ্য ও অন্যান্য অনেকগুলি বিষয় লইয়া এই শাখাসভা কার্য্য করিতেছেন, তজ্জন্য এই সভা বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

কুণ্ডী সপ্তঃপুষ্করিণীর জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রসার বৃদ্ধি এবং বঙ্গের ঐতিহাসিক উপকরণ ও প্রাচীন কাব্যাদি সংগ্রহ জন্য প্রতি জেলায় উহার একটি করিয়া শাখা সভা স্থাপিত হউক"। ঠিক এই সময়ে বঙ্গীয় পরিষদের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও উহার কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি-বিস্তারের জন্য এক নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই উভয় প্রস্তাবের আলোচনার জন্য ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৬ই চৈত্র তারিখে মূল পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। বহু আলোচনার পর এই উভয় প্রস্তাবই গৃহীত হয়, তাহাতে পরীক্ষার জন্য আপাততঃ রঙ্গপুরেই পরিষদের প্রথম শাখা স্থাপিত হউক, ইহাও নির্ণীত হইলে, প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া রঙ্গপুরের শাখা সভা গঠনের জন্য পরিষৎ অনুরোধ করেন। রঙ্গপুরে

পরিষদের শাখা সভা সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনার নিমিত্ত প্রথম সভা ১৩১১ বঙ্গাব্দে ১২ই চৈত্র তারিখে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক রঙ্গপুর পাবলিক লাইব্রেরী গৃহে আহূত হইয়াছিল। উহাতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভা স্থির করেন, রঙ্গপুরবাসী পরিষদের একটি শাখা স্থাপন করিতে ইচ্ছুক আছেন। যথাসময়ে শাখা সভা সম্বন্ধীয় নিয়মাদির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া আসিলে বিগত ১৩১২ সালের ১১ই বৈশাখ সোমবার শুভক্ষণে রঙ্গপুর টাউনহলে প্রাগুক্ত শাখা স্থাপনার্থ একটি সাধারণ সভা পুনরাহূত হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই রঙ্গপুরের সুযোগ্য ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় অষ্টাবিংশতি জন সভ্য লইয়া রঙ্গপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম শাখা সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বৎসরে এই শাখা সভা প্রায় ৫০ খানি প্রাচীন পুথি, ৫টা অপ্রকাশিত মুদ্রা, কয়েক খানি খোদিত লিপির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া স্থানীয় অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি সাহিত্যালোচনায় যোগদান করেন। কুণ্ডীর জামদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয় ছাত্রদের জন্য নির্দ্দিষ্ট "জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা" প্রবন্ধ লেখার পুরস্কারস্বরূপ "মধুসূদন পদক" নামে একটি রৌপ্য পদক প্রদান করেন। সেই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক রঙ্গপুরের কবিগণের বিরচিত বহু প্রাচীন পুথি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইরূপে শাখা পরিষৎ রঙ্গপুরের প্রচীন কবিদিগের রচিত কাব্যাদি সংগ্রহ ও জীবনী সম্বন্ধে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া শাখা পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্যের দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়াছেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় বর্ষের সাম্বৎসরিক অধিবেশনে জানা যায় যে, এই শাখা সভা কর্ত্তৃক অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের "উত্তরবঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন গ্রাম্য কবিতা," "বগুড়া বৃত্তান্ত" নামক প্রাচীনপুথি এবং শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের সংগৃহীত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, জৈমিনি ভারত প্রভৃতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই বৎসরে কাশীমবাজারে প্রথম প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্মিলনে রঙ্গপুর শাখা সভা কয়েক জনকে সভার প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া বাণীসেবার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে যতকাল অতীত হইতে লাগিল, রঙ্গপুর শাখা পরিষদের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রত্যেক সাম্বৎসরিক অধিবেশনে সাহিত্যসেবী ব্যক্তিমাত্রেই ততই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে তৃতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশনে জানা যায় যে, বাঙ্গালা পুথির অনুসন্ধান ও বিবরণ সংগ্রহ, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা প্রভৃতি কার্য্য এই শাখা সভা পূর্ণমাত্রায় চালাইয়াছিলেন। এই বৎসর সর্ব্ব প্রথম ছাত্র সভ্য গৃহীত হইয়াছিল। যে সকল সারগর্ভ ও উপাদেয় প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকগুলিই উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় বর্ষের অধিবেশনে জানা যায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের প্রেরিত ৩৬টি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা এই অধিবেশনে প্রদর্শিত হয়। মুদ্রাগুলি প্রত্নতত্ত্বালোচনায় বিশেষ সাহায্য করিবে বলিয়া পাঠোদ্ধার করিবার ভার সম্পাদকের উপর অর্পিত হয়। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ,

বি, এল্ মহাশয় কোচবিহার হইতে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রচিত মহাভারতের আদি কাণ্ড নামক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া উপস্থাপিত করেন। এ পর্য্যন্ত যতগুলি বাঙ্গালা মহাভারত আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখানি তদতিরিক্ত এবং উত্তরবঙ্গের কবিরচিত। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের সংগৃহীত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩০ খানি ও শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি প্রাচীন পুথি এই অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার জন্য ২০০৲ টাকা পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হয়। রঙ্গপুর শাখা পরিষদের সভ্যগণ ব্যতীত অপর যে কেহ উত্তরবঙ্গীয় অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়া সংখ্যা ও বিবরণ বিষয়ে তুলনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে রঙ্গপুরের মহান্ত মহারাজ সুমেরু গিরি গোস্বামী মহাশয় ১৫৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। অবশ্য সেই পুরস্কার উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত হইয়াছিল। কুণ্ডী সন্তঃপুষ্করিণীর জমিদার শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে রঙ্গপুরের কবি কমললোচনের রচিত চণ্ডিকাবিজয় কাব্য খানি ১৩১৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব গঙ্গাধর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামে উৎসৃষ্ট হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় সভার গ্রন্থাগারে ৫০ খানি, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, মহাশয় ৫ খানি, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় ২০ খানি, একুনে ৭৫ খানি পুথি উপহার প্রদান করিয়া সভার ঐকান্তিক প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সম্পাদকতায় শ্রীনাথী মহাভারতের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

(২) মালদহের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় অদ্ভুতাচার্য্যের বৃহৎ রামায়ণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবাব প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিরচিত "নামকোষ" ও "গৌড়ের ইতিহাস" নামক গ্রন্থদ্বয় মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থখানি রচয়িতার ব্যয়ে সভার গ্রন্থাবলী ভুক্ত হইয়া মুদ্রিত করার ব্যবস্থা এবং প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি গ্রন্থাবলী ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার ভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতির উপর অর্পিত হয়।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে অনেকগুলি বৃত্তি, পারিতোষিক, স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা, পুস্তক প্রকাশ প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে—

শ্রীযুক্ত নবসুন্দরদাস মহাশয়ের স্বর্গগতা পত্নীর স্মরণার্থ ১৫৲ টাকা মূল্যের পুস্তক পুরস্কারের ব্যবস্থা। কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ প্রদত্ত কাশীচন্দ্র বৃত্তি টাকা দ্বারা পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামকোষ নামক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা। কবিবর দাশরথি রায়ের স্মৃতি মন্দিরের স্থাপনা করে কাটোয়ার সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের পত্র পাঠ ও চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা। গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের রচিত সেরপুরের ইতিহাস ও বৌদ্ধযুগের স্মৃতি স্বরূপ রঙ্গপুরের

যুগীগণের দ্বারা সচরাচর গীত গোপীচাঁদের গান প্রকাশের ব্যবস্থা। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের সংগৃহীত রঙ্গপুরের বিবরণ রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে মুদ্রণের ব্যবস্থা; কৃষ্ণহরিদাস রচিত সত্যপীর নামক গ্রন্থ প্রকাশোপযোগী হইবে কিনা তাহা নির্ণয়ের ভার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম এ, বি এল, মহাশয়কে প্রদত্ত হয়। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত মহাশয়ের রচিত "মহাস্থান" কাব্য সভা কর্তৃক প্রকাশোপযোগী হইবে কিনা, পরীক্ষার ভার মহামহোপধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের উপর প্রদত্ত হয়। কোচবিহারাধিপতির ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী নাওডাঙ্গার ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের রচিত "আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট" শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, মহাশয়ের সম্পাদকতায় মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। বগুড়া নিবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য রচিত "সারস্বত ব্যাকরণ ভাষ্য" সভা হইতে প্রকাশোপযোগী হইবে কিনা, তাহার পরীক্ষার ভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্যব্যাকরণপুরাণতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের উপর অর্পিত হয়। কোচবিহারাধিপতি সুকবি স্বর্গীয় মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রচিত বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের পদ্যানুবাদ ও চীনদেশের রাজকন্যার উপাখ্যান কাব্যগ্রন্থ প্রকাশোপযোগী হইবে কিনা, পরীক্ষার ভার সভার সভাপতি মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, শাখা সভার কার্য্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকায় মাসিক পারিশ্রমিকে একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। শাখা সভার দ্রষ্টব্য পদার্থ এতই অধিক হইয়াছে যে, তাহা রক্ষার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র গৃহ ও কার্য্যালয় স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিভবনরূপে সভার চিত্রশালা ও কার্য্যালয়াদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কাকিনার অনারেবল রাজা বাহাদুরের পক্ষ হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে ও পরবর্ত্তী শ্রাবণ মাসের মধ্যে সংগৃহীত অর্থ স্মৃতি সমিতির সম্পাদকের হস্তে অর্পিত হইবে। এই বৎসরে গৌরীপুরাধিপতি অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরকে এই সভা হইতে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল। অনুগত বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ এই সভার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সুন্দর কার্য্য করিয়াছিল।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, অনারেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় সারস্বত ভবন ও রঙ্গপুর পরিষৎ গৃহ নির্ম্মাণার্থ কাকিনারাজের প্রজাবর্গের নিকট হইতে সংগৃহীত ৫০০০৲ টাকা প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রতিশ্রুতি আজও রক্ষিত হয় নাই। এই তহবিলে কাশীমবাজার হইতে ৫০০৲ টাকা আসিয়াছে।

আমাদিগের সম্মুখে সাহিত্যিক কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত ও এত বিভিন্ন প্রকারের যে, ভাবিলে স্তব্ধ হইতে হয়। মূলসভা দ্বারা এই বিশাল ক্ষেত্রের সকল অংশের কার্য্য সম্পন্ন

হইতে পারে না। মূল সভাকে সাহায্য করার জন্য বহু শাখা সভার প্রয়োজন। উদ্দেশ্য সকলেরই এক। কার্য্যও এক জাতীয়, কার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য এবং শ্রমের বিভাগ করিয়া সুবিধামত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শাখা সভার সৃষ্টি। নচেৎ আমরা সকলে এক সভারই সভ্য। সকলেই এক প্রকার উদ্দেশ্য স্থির করিয়া, সমান উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমাদের সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য মাতৃপূজা। সাহিত্যসেবিগণ আসুন, আমরা সকলে একপ্রাণে একমনে যাহাতে আমাদিগের চিরবরণীয়া মাতৃভাষার ষোড়শোপচারে পূজা করিতে পারি, শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি।

বাঙ্গালায় সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য ও চিন্তয়িতব্য বিষয়ের আলোচনা আমাদিগের মাতৃভাষায় হইতে পারে, তাহা সাধন করিবার জন্য আমাদিগের দেশীয় সকল জেলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানের বিষয় যত অধিক প্রচারিত হইয়া সকলের অধিগম্য করা যায়, অর্থাৎ মানব সমাজের মধ্যে বিস্তৃত ভাবে জ্ঞানানুশীলন হয় ও জ্ঞান চর্চ্চার সুবিধা যত অধিক হয়, তাহা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জ্ঞান চর্চ্চায় সকলেরই সমান অধিকার আছে। যে ভাষা দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জিত হইলে সকলের পক্ষে সহজ বোধ্য হইতে পারে এবং জনসাধারণের কার্য্যে আসিয়া অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করে, সেই ভাষায় তাহা অনুশীলন করা এবং সেই ভাষার পুষ্টি সাধন জন্য যত্ন করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। জগতে নানাজাতীয় নানা ভাষা রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব ভাষার ও সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিবিধ বিধানে উন্নতি সাধন করিতেছে। আমাদিগের মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠবান্বিতা করিতে হইলে আমাদিগের দেশে জ্ঞানের বিস্তার করিতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। সেই সেই ভাষা হইতে আমাদিগের মাতৃভাষার অপ্রচলিত ভাব ও বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে। জ্ঞানানুশীলন সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতি হয় না। জ্ঞান বিস্তার সম্বন্ধে সংকীর্ণতা থাকা বা তাহার প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা ভাষার অধিকতর অনিষ্টকর কারণ আর কিছু আছে কিনা তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার মনে হয় আমাদের ভাষাকে পুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা আমাদিগের বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রেরই অতি অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে মত দ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে ভাবিবার কোন কথা নাই।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে, মাতৃভাষার অনুশীলন করিতে হইলে অন্য ভাষা হইতে উচ্চ জ্ঞান লাভের পথ অবরুদ্ধ হয়, কারণ বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ অতি বিরল, কিন্তু এইরূপ ভাবিতে গেলে আমাদের মাতৃভাষার উন্নতির উপায় নাই। অন্য ভাষা আলোচনা করিয়া আলোচনাকারীদিগের যে জ্ঞান লাভ হইবে, উহা মাতৃভাষায় প্রকাশ করিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইবে, এবং আলোচনাকারী অন্য ভাষায় উচ্চ জ্ঞান নিজের হৃদয়ে গ্রহণ করিবার সময় বাঙ্গালা ভাষায় ঐ জ্ঞানের সম্যক্ উপলব্ধি মাতৃভাষায়

মধ্যে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্পই আছে। জ্ঞান চর্চ্চা ও তদনুশীলনের এমনই একটি অদ্ভুত শক্তি আছে যে, যেখানে উহা প্রভূত পরিমাণে ও বহু লোকের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে নানা ভাবে ও নানা প্রকারে জ্ঞানসাধনোপযোগী এক প্রকার নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহার ফলে জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি হইতে থাকে; এবং বহু লোকে জ্ঞানসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানমন্দিরের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। যে দেশে জ্ঞানালোক প্রবেশ করে নাই, সে দেশে জনসাধারণের জ্ঞানচক্ষু ফুটে নাই, জ্ঞান-পিপাসাও নাই। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি চতুষ্পার্শ্বে অজ্ঞানতাই দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার উৎসাহের অভাবে, এবং কর্ম্মী ব্যক্তিদিগের সহানুভূতি ও সাগ্রহ অনুমোদনাদির অভাবে জ্ঞান পিপাসা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। জ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্য—অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানের বিস্তৃতি সাধন। বঙ্গের কৃতিসন্তানগণ মাতৃভাষার পূজায় এক্ষণে যেরূপ মনোযোগী হইয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে অল্প কালের মধ্যে প্রত্যেক জেলার বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। নানা দেশীয় বিভিন্ন ভাষা হইতে নূতন শব্দ, নূতন ভাব, নূতন বিষয় সঙ্কলিত হইয়া বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্য এক প্রধান উদ্দেশ্য—প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার সাধন। পরিষদের উদ্‌যোগে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের চেষ্টায় অনেক পুথি সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশে অনেক নগরে ও গ্রামে এখনও এত প্রাচীন পুথি পড়িয়া আছে যে, তৎসমুদায়ের উদ্ধার করিতে পারিলে প্রাচীন সাহিত্যের অবস্থা বেশ বুঝা যাইবে। ঐ সকল প্রাচীন পুথির অধিকাংশই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে; এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে শীঘ্র সংগৃহীত হইয়া, বিশেষ যত্নসহকারে যদি সেগুলি সংরক্ষিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় সাহিত্যের মহোপকার সাধিত হইবে। ঐ পুঁথিগুলি সংগৃহীত ও সুরক্ষিত না হইলে হয়ত অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যাইবে। ঐ সকল পুথি উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইলে কেবল যে আমাদের মাতৃভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে আনুকূল্য করিবে, তাহা নহে; ঐ সকল পুথির দ্বারা আমাদের দেশের প্রাচীন কালের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ইতিহাসের অনেক অংশ জানিতে পারা যাইবে। আমাদের মাতৃভাষার গঠনপ্রণালী এবং প্রাদেশিক ও গ্রাম্য শব্দাবলী সংগৃহীত হইয়া বঙ্গভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান সংকলিত হইবার উপযুক্ত উপকরণ সংগৃহীত হইবে। ঐ সকল কার্য্য এত দুরূহ ও বহু চেষ্টা- সাধ্য যে, একমাত্র মূল পরিষৎ দ্বারা সাধিত হইবার অনেক অন্তরায় আছে। উহা কখনই এক কেন্দ্রে বসিয়া এক সভার উদ্‌যোগে সাধিত হইতে পারে না। ইহা প্রত্যেক জেলার শাখা সভা দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখা সমিতি নানা জেলায় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহা আদৌ পর্য্যাপ্ত বলিয়া বুঝা যায় না। প্রত্যেক জেলায় এই প্রকার শাখা সভার গঠন এবং তথাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের একমন হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত।

এখন দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের প্রধান পধান জেলার লোকের মতিগতি ফিরিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের অনুশীলন এবং তৎসাধনকল্পে প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার এবং তদবলম্বনে গবেষণা করিবার ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এখন মাতৃভাষানুরাগী মহোদয়গণ সকলে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া আমাদের দেশের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হউন, এবং ইহাই আমাদের মাতৃভাষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির আদেশ মনে ধারণ করিয়া, ঐ আদেশ পালনে যাহার যতটুকু শক্তি, সাধ্য ও সামর্থ্য, তদনুসারে যত্নবান হউন। দেশে প্রাচীন সাহিত্যাদি যথাযথ সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হইলে বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত কল্যাণ হইবে। কাব্য সৌন্দর্য্যাদির সহিত সাহিত্যের শব্দবিন্যাস প্রণালী, শব্দের ব্যুৎপত্তি, শব্দাদির অর্থের ইতিবৃত্ত নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানিতে পারিব, এবং প্রাচীন সাহিত্যাদির আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কত প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়া মাতৃভাষার অঙ্গ সৌষ্ঠব যে কত প্রকারে বৰ্দ্ধিত হইবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না।

আমাদের দেশে একখানি সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ ইতিহাস নাই। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইতিহাসের অনেক জটিল অংশ পরিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত ইতিহাস যাহাকে বলে, তাহার পর্য্যাপ্ত উপকরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বঙ্গদেশ কত দিনের তাহা অদ্যাবধি অবধারিত হয় নাই। এই দেশ অনার্য্য ও হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া বর্ত্তমানে ইংরাজ জাতির অধীন হইয়াছে। বঙ্গদেশ অতি বিস্তৃত, নানা জেলায় বিভক্ত। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার প্রত্যেক জেলায় বিভিন্নাকারে বিভিন্ন রাজার অধীনে বঙ্গ সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে, সভ্যতার প্রচার হইয়াছে। সেই কালের সামাজিক রীতি-নীতি, মানুষের স্বভাব চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় এখন নাই। প্রত্যেক জেলার এবং নগরের ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় এই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিলে বঙ্গদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগৃহীত হইতে পারে। আমার পরমকল্যাণভাজন দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীমান্ শরৎকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এইরূপ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া "গৌড় রাজমালা" নামক একখানি ইতিহাসের প্রথমাংশ বাহির করিয়াছেন। শ্রীমান্ শরৎকুমারের ন্যায় সুশিক্ষিত, ধনী ব্যক্তিগণ এইরূপ উদ্‌যোগী ও ব্রতী হইলে দেশের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্যের অন্যতম কর্ত্তব্য—দর্শন-বিজ্ঞানাদি বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সঙ্কলন করা। এই দুরূহ কার্য্য দুই প্রকারে সাধিত হইতে পারে। প্রথম উপায়, ঐ ঐ বিষয় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং দ্বিতীয় উপায় ঐ শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ভাষান্তর প্রকাশ করা। আমাদের দেশের এবং আমাদের মাতৃভাষার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দ্বিতীয় উপায়টি এখনও মুখ্যরূপে অবলম্বনীয়। এই সকল উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যেমন উৎসাহী ও অনুরাগী ব্যক্তির প্রয়োজন, তেমনি অর্থও বিশেষ আবশ্যক। এই সকল উপায় অবলম্বনের জন্য আমরা কি যথাযথ চেষ্টা করিয়াছি বা করিতেছি? ইহার

যেরূপ হইবে, বিদেশীয় ভাষায় সেইরূপ হইতে পারে না। আলোচনাকারিগণ অনুশীলনে বিরত থাকিলে এ বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ লিখিবেন কে? নিজেরা জ্ঞানলাভ করিয়া অন্যকে তাহার অংশ দিতে কৃপণতা ও সময় নষ্ট বিবেচনা করা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শোভা পায় না। শিক্ষার ফলে যদি তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন যে, আপনার ভ্রাতাকে জ্ঞান বিতরণ করিতে গেলে সময় নষ্ট করা হয়, নিজের উন্নতির ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষায় কোন ফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা যে প্রকৃতই এত স্বার্থপর তাহা আমার মনে হয় না। আমি বিশ্বাস করি যে, দেশে জনসাধারণের মধ্যে যদি কেবল অজ্ঞানতাই থাকে, তাহা হইলে দেশের উত্তরে আমি বলিতে পারি, কিছু কিছু যত্ন ও চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা কি উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য না অনুরূপ? কখনই নহে। এখন ইংরাজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষা এবং সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা হইতে কোন কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থের ভাষান্তর প্রকাশ করা বঙ্গভাষার পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়াছে। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনুবাদিত হওয়া আবশ্যক। ভাষান্তররূপে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে সুষ্ঠুভাবে হইয়াছে, তাহাও ঠিক বলা যায় না। সংস্কৃত ভাষা হইতে দর্শনাদি বিষয়ে কয়েক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনূদিত হইলেও ঐ সকল গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্যক উপলব্ধি এখনও হয় নাই। সুতরাং যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন অনুবাদিত গ্রন্থ দ্বারা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে অভাব থাকিয়া যাইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিরসুহৃদ্, সাহিত্যচর্চ্চার ব্যয়কল্পে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত, বদান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের চেষ্টায় অনেক ভিন্ন ভাষার গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইতেছে, এবং বঙ্গের অনেক কৃতী সন্তানও এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যেক জেলার ধনী ও কৃতবিদ্যগণ এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

উদ্ভিদ্—তাহার উপকরণ ও বর্দ্ধন।

চতুর্থ প্রকরণ।

রাসায়নিক সারের উপকারিতা।

"কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ"

পরাশর—কৃষি সংহিতা।

প্রাণ অন্নগত। অন্ন কৃষিজাত। সুতরাং জীবন ধারণ জন্য লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভীষণ জীবনসংগ্রামের দিনে কৃষির উন্নতি সাধন আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কৃষিকার্য্য নিরক্ষর এবং দরিদ্র প্রজা-দিগের উপরে ন্যস্ত রাখিয়া আমরা সুখে নিদ্রা যাইতেছি। পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষির এবং তাহার ফলস্বরূপ শ্রমশিল্পের যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, আমাদের নিরক্ষর দরিদ্র প্রজাদের তাহা জানিবার, শিখিবার অথবা তদ্রূপ কার্য্য করিবার কোন শক্তি নাই। তাহাদের সাধ্যমধ্যে তাহারা বরাবর যে উপায়ে কৃষি কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহাই করিয়া যাইতেছে তাহাদের জমিতে যে যে ফসল উৎপন্ন হইতেছে, ঐ সকল ফসল জীবনধারণ এবং বর্দ্ধনজন্য জমি হইতে খাদ্যরূপে কি কি উপকরণ গ্রহণ করিয়াছে, এবং ঐ ফসল বিক্রয় দ্বারা স্থানান্তরিত হওয়ায়, ঐ জমিস্থ উদ্ভিদাহার অর্থাৎ সার-পদার্থের কতটা অভাব হইতেছে, তাহা তাহারা অবধারণ করিতে পারে না। তবে জমিতে কোন প্রকার সার না দিয়া ফসল উৎপন্ন করিলে ফসল ভাল হয় না সার দিলে ভাল হয়, এই মাত্র সাধারণ জ্ঞান থাকায়, তাহারা হালের যে দুই চারিটি বলদ এবং দুগ্ধজন্য যে দুই একটি গাভী থাকে, তাহাদিগের গোময়, অংশত (শীতকালে) পাককার্য্যের জন্য ঘুটে প্রস্তুত করে, এবং অপরাংশ (বর্ষাকালে) সারের গাদিতে রাখিয়া দেয় এবং পরে জমিতে সার দেয়। তাহাদিগের নিত্য আবশ্যকীয় গৃহ পালিত গবাদি জমিতে উৎপন্ন ফসলের খড় ইত্যাদি কতক অংশ এবং ঐ জমিতে উৎপন্ন ঘাস ইত্যাদি খাইয়াই কোন প্রকারে জীবন-ধারণ করে। দরিদ্র প্রজা বাহির হইতে খৈল দানা ইত্যাদি কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া গবাদির আহার দিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগের গবাদি হইতে যে সামান্য পরিমাণ গোময় সাররূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে উর্ব্বরতাবিধায়ক পদার্থ অতি অল্পই থাকে, এবং গোময় সাররূপে ব্যবহার জন্য কি প্রকারে রক্ষা করিতে হয়, তাহা না জানায় ঐ অল্প পরিমাণ উর্ব্বরতা-বিধায়ক পদার্থেরও অনেক নষ্ট হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশেও রাসায়নিক সার প্রচলন হইবার পূর্ব্বে গবাদি পশুর মল-মূত্রাদিই কেবল কৃষিকার্য্যে সাররূপে ব্যবহৃত হইত। পাশ্চাত্য কৃষকগণ খইল ইত্যাদি দ্বারা উপযুক্তরূপে রক্ষিত গো, ঘোড়া, শূকর, ভেড়া ইত্যাদি নানা জাতীয় আহার্য্য পশু ও পক্ষীর এবং খামারের লোক জনের মলমূত্র, আহারাবশেষ, বিচালি, পাক-শালার এবং খামারের অন্যান্য সমস্ত আবর্জ্জনা একত্র মিশ্রিত, এবং বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে রক্ষা করিয়া সার প্রস্তুত করিত। তথায় এই প্রকার মিশ্রিত সারকে "খামার বাড়ীর সার" (Farm-yard manure) কহিয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রজাগণ যে গোময় সার সামান্য পরিমাণ জমিতে দেয়, তদপেক্ষা পাশ্চাত্যদেশের এই খামার বাড়ীর সারে উর্ব্বরতাবিধায়ক পদার্থ অনেক পরিমাণে থাকে, সুতরাং তাহা উৎকৃষ্ট, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কেবল ক্যালসিক ফস্ফেট্ পোটাস্, চূণ এবং যবক্ষারযান-ঘটিত পদার্থ চতুষ্টয় একত্র যোগে উদ্ভিদ্ বর্দ্ধনে সহায়তা করে। "খামার বাড়ীর সারে" কি কি পদার্থ থাকে, তাহার একটি তালিকা ফ্রান্স দেশের তিনটি পরীক্ষাক্ষেত্র হইতে প্রদত্ত হইল :—

একশত ভাগ শুষ্কসার

	ভিন্‌সিনিস্ কৃষিক্ষেত্র	বেচোব্রুন কৃষিক্ষেত্র।	সিয়ারগার্টেন কৃষিক্ষেত্র।
অঙ্গার, জলজান, উদ্‌জান ...	৫৯.৬৫	৬১.৫০	৬৪.৬৭
যবক্ষারজান ...	২.০৮	২.০০	২.৫৬
প্রস্ফুরিকাম্ল ...	০.৮৮	১.০০	১.২৬
গন্ধক দ্রাবক ...	নাম মাত্র	০.৬৩	০.৮১
ক্লোরিন্ ...	০.৭০	০.২০	০.৩১
এলুমিনা ও ফেরিক অক্সাইড	০.৬৮	২.৬০	১.৫১
চূণ ...	৫.২৩	২.৮০	৩.৭০
ম্যাগ্‌নেসিয়াম ...	০.৩২	১.২১	১.৮৮
সোডা ...	নাম মাত্র	২.৬০ (সোডা ও পোটাস)	০.৮৭
পোটাস ...	২.৪৬		১.৮৭
দ্রুনিয়া সিলিকা ...	১.৪৫	২২.১৩ (দ্রুনিয়া সিলিকা ও বালি)	৬.২৫
বালি ...	২৫.৬৬		১০.৭৭

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সারে যে চারিটি পদার্থের প্রয়োজন, তদ্ভিন্নও 'খামার বাড়ীর সারে" বহু পরিমাণ অঙ্গার, জলজান ও অম্লজান আছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকরণে বলা হইয়াছে যে, ঐ তিনটি উপকরণ উদ্ভিদ্ ভূমি হইতে গ্রহণ করে না এবং সারের পক্ষে ঐ পদার্থগুলি নিষ্প্রয়োজন এবং "খামার বাড়ীর সারে" যে সোডিক্ ক্লোরাইড্, ম্যাগনেসিয়া, সোডা, ফেরিক অক্সাইড (লৌহমল) ইত্যাদি আছে, তাহাদিগেরও প্রয়োজনাভাব; কারণ অতি অনুর্ব্বর ভূমিতেও ঐ সমস্ত পদার্থ যথেষ্ট থাকে। যাহা হউক, "খামার বাড়ীর" অর্থাৎ গবাদির সারে আবশ্যকীয় চারিটি উপকরণ থাকায় উহা অবিসম্বাদিতরূপে ভাল সার। কিন্তু ঐ চারিটি পদার্থের পরিমাণ "খামার বাড়ীর সার" জমিতে দিয়াও পূর্ণাঙ্গ রাসায়নিক সারের সমতুল্য ফল কখনই পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে এই সমস্ত পরীক্ষা অবশ্য কোথায়ও করা হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশে বহু পরীক্ষা হইয়াছে। ফ্রান্স দেশে বিরিকৃষি-বিদ্যালয়সংসৃষ্ট ক্ষেত্রে বীটমূল, বিনা সারে, পূর্ণাঙ্গ রাসায়নিক সারে এবং খামার বাড়ীর সারে একর (৩ বিঘা ১ কাঠা) প্রতি নিম্নলিখিত হিসাবে ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা হইয়াছিল (ভিলি মহোদয়ের "রাসায়নিক সার" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত)।

	টন	হন্দর
বিনা সারে	৩	৫
৩২ টন খামার বাড়ীর সারে	১৯	১৩
১৩½ হন্দর পূর্ণাঙ্গ (রাসায়নিক) সারে	২১	০
অন্যত্র,—		
২০ টন খামার বাড়ীর সারে	১৮	১৪
১১½ হন্দর পূর্ণাঙ্গ সারে	২০	০
তৃতীয় স্থলে,—		
১০½ হন্দর পূর্ণাঙ্গ সারে	২৪	১৮
২০ টন খামার বাড়ীর সারের সহিত ৬ হন্দর গুয়ানো মিশ্রিত করিয়া	১৬	০
চতুর্থ স্থলে,—		
২০ টন খামার বাড়ীর সারে	২০	০
১৫½ হন্দর রাসায়নিক সারে	২৪	০
গোয়াডিলোপ দ্বীপে একটী ইক্ষুক্ষেত্রে ইক্ষু,—		
খামার বাড়ীর সারে	১২	১৬
রাসায়নিক সারে	২২	৮
বিনা সারে	১	৪

একটন = ২৭.২ মণ।
২০ হন্দর = ১ টন।

আলু এবং গোধূম সম্বন্ধেও বহু পরীক্ষাতেই এই প্রকার সন্তোষজনক ফল তথায় পাওয়া গিয়াছিল। বাহুল্যভয়ে সে সমস্তের উল্লেখ করা হইল না। গোধূম সম্বন্ধে ৪টি ভিন্ন স্থানের পরীক্ষার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। সকল স্থানেই জমি অনুর্ব্বর ছিল।—

প্রতি একর গোধূমের ফসল।

	বুশেল	বুশেল	বুশেল	বুশেল
রাসায়নিক সারে	৩৬	৩৩		২৮
খামার বাড়ীর সারে	১৪	১২		
বিনা সারে	...	৩	২?	

আলুর ফসলও কম সন্তোষজনক নহে। ভিন্‌সিনিস্ কৃষিক্ষেত্রে কৃষিপণ্ডিত ভিলি মহোদয় রাসায়নিক সার প্রয়োগে প্রতি একরে ১০ হইতে ১২ টন পর্য্যন্ত আলু উৎপন্ন করিয়াছিলেন। মারকুইস্ ডি হারিংটন সাহেব——

	টন	হন্দর।
রাসায়নিক সারে	১৩	২
ঘোড়ার সারে	৬	৮
বিনা সারে		৪

আলু উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ সালে গোয়াডিলোপ দ্বীপে এম্. ডি, জারুন সাহেব ইক্ষু সম্বন্ধেও পরীক্ষা করিয়া নিম্নোক্ত ফল পাইয়াছিলেন,—

একর প্রতি ইক্ষু।

			টন		হন্দর।
রাসায়নিক সারে	...	...	৩৩	...	১৮
খামার বাড়ীর সারে	...	...	২৪	...	১৮
বিনা সারে	...	...	১০	...	১২

খামার বাড়ীর সারে ক্রমিক ফসলের অর্থাৎ এক ফসলের পর অপর ফসলের আবাদ ভাল হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু রাসায়নিক সারে ক্রমিক ফসলের আবাদফল অতি সন্তোষজনক।

প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির প্রাচুর্য্যের উপর শস্যের ফসল নির্ভর করে। বহু পরিমাণ গবাদি পশুর সার প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকরণ প্রদত্ত হইয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বৃহদায়তন খামারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ গোময় সার যথাসময়ে সংগ্রহ করা অসম্ভব। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার ইচ্ছামত ক্রয় করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং তাহা পরিমাণেও অল্প লাগে। যখন কৃষিকার্য্যের লাভালাভ সারের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে, তখন এই জীবন-সংগ্রামের দিনে রাসায়নিক সারের ব্যবহার অপরিহার্য্য। বিশেষতঃ অধিক পরিমাণ জমি ভাল সার দিয়া, ভাল করিয়া আবাদ করা শ্রেয়ঃ।

পাশ্চাত্য কৃষকগণ বলিয়া থাকে, প্রতি একর জমিতে ১৬ টন (৪২৭২ মণ) "খামার বাড়ীর" সার দিলেই যথেষ্ট। ১৬ টন খামার বাড়ীর সারে পূর্ণাঙ্গ সারের ৪টি উপকরণ নিম্নলিখিত পরিমাণ থাকে।

যবক্ষারজান	...	১৪৪ পাউণ্ড।
ফস্ফরিক এসিড্	...	৬৬ ,,
পোটাস	...	১৩২ ,,
চূণ	...	২৮২
	সমষ্টি	৬২৪ পাউণ্ড।

পূর্ণাঙ্গ সারের উপরি উক্ত ৪টি পদার্থের উপরেই খামার বাড়ীর অর্থাৎ গোময়াদি সারের উপকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং কার্য্যকরী পদার্থ গোময়াদি সারের ৫০ ভাগের এক ভাগেরও কম। সাধারণ গোময়াদি সারে শতকরা ৮০ ভাগ জলীয় পদার্থ, সুতরাং ১৬ টন গোময়াদি সারে কেবল ৩ টন ৪ হন্দর শুষ্ক কঠিন পদার্থ। ইহার মধ্যে ২ টন ৮ হন্দর হইতে ২ টন ১৬ হন্দর অঙ্গারঘটিত পদার্থ। সারে অঙ্গারের কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং ১৬ টন গোময়াদি সারে উদ্ভিদের উপকরণ পদার্থ অতি অল্প। নিম্নলিখিত হিসাবে ২২৪৮ পাউণ্ড রাসায়নিক পদার্থ কয়েকটির একীকরণেই ১৬ টন খামার বাড়ীর, অর্থাৎ গোময়াদি সারের সমতুল্য উপকারী সার প্রস্তুত হইতে পারে।

				পাউণ্ড একর প্রতি
ক্যালসিক সুপার ফসফেট্	...	...	...	৫২৮
পোটাসিক্ ক্লোরাইড্	...	...	...	২৮২
এমোনিক সালফেট্	...	...	...	৬৯১
ক্যালসিক সলফেট্	...	...	...	৭৪৭
			সমষ্টি	২২৪৮

অতএব রাসায়নিক সারের তুলনায় গোময়াদি সার জমিতে বহন এবং প্রয়োগ করিতে বহু ব্যয়ের প্রয়োজন। কিন্তু এটি সামান্য কথা। অন্য কারণেও রাসায়নিক সার উৎকৃষ্ট। গোময়াদি সারে যবক্ষারজান উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় থাকে না। খামার বাড়ীর সারে যবক্ষারজান, পশ্বাদির মলমূত্র এবং পচা খড় ইত্যাদিতে থাকে। ক্রমিক পচন ক্রিয়াতে এই সমস্ত পদার্থ সম্পূর্ণরূপে অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইলে, উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয় না। যবক্ষারজান, এমোনিয়া এবং নাইট্রেট পদার্থে পরিণত না হইলে উদ্ভিদ্ গ্রহণ করিতে পারে না। এই পরিণতি প্রাপ্ত হইতে ঐ মলমূত্র, খড় ইত্যাদিতে যে পরিমাণ যবক্ষারজানময় পদার্থ থাকে, তাহার শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ অমিশ্রিত বাষ্পরূপে উড়িয়া যায়। কিন্তু রাসায়নিক সারে গ্রহণোপযোগী অবস্থায় যবক্ষারজান প্রদত্ত হওয়ায়, তাহার কোন অংশই নষ্ট হয় না, সুতরাং ইহার কার্য্যকারিতা নিশ্চিত।

আর একটি গুরুতর বিষয় এই যে, রাসায়নিক সারের উপকরণগুলি উদ্ভিদের প্রকৃতি বিবেচনায় নিয়মিত করা যাইতে পারে। কোন্ উদ্ভিদে, কোন্ উপকরণ, কি পরিমাণে প্রয়োগ

করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। রাসায়নিক সারে এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিবার উপায় আছে. এই জন্যই তাহার উৎকর্ষতা। যদিও ক্যালসিক ফস্‌ফেট্, পোটাস, চূণ এবং কতক পরিমাণে যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ উদ্ভিদের আবশ্যকীয় অভাব পূরণের জন্য যথেষ্ট, প্রকৃতি অনুসারে উদ্ভিদ্‌বিশেষে ইহার এক একটির প্রয়োজনীয়তা অধিক এবং অন্যগুলি ঐ প্রধান বা মুখ্যোপকরণের সহায়ক;--যথা, গোধূম ইত্যাদি ওদন শস্যে, বীটমূলে এবং তামাক প্রভৃতি উদ্ভিদে যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ মুখ্যোপকরণ বা মুখ্যাঙ্গ। মটর ইত্যাদি শিম্বজাতীয় উদ্ভিদে পোটাস প্রধান বা মুখ্যোপকরণ, এবং ইক্ষু, শালগম, ভুট্টা ইত্যাদিতে ক্যালসিক ফস্‌ফেট্ মুখ্যাঙ্গ। এই প্রকার প্রতি উদ্ভিদেরই পোষণ কার্য্যে সারে একটি মুখ্যাঙ্গ এবং অপর তিনটি সহায়ক মাত্র। গোময়াদি সার জমিতে প্রয়োগকালে কৃষক তাহার মুখ্যাঙ্গের কোন বিচার করিতে পারে না, তাহার উপাদানের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, কেবল পরিমাণের ন্যূনাধিক্য করিতে পারে। কৃষক একখণ্ড জমিতে পর্য্যায়ক্রমে তামাক, ইক্ষু, মটর এবং গোধুম এই চারিটি ফসল জন্মাইতে গোময়াদি সার এক সময়ে বা বর্ষে বর্ষে দিতে পারে। এক সময়ে দিলে মূল্যবান্ ফসল তামাক ভাল হইবে, বর্ষে বর্ষে দিলে অপেক্ষাকৃত কম হইবে। রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কিন্তু অন্যবিধ। ইহাতে প্রতি শস্যের প্রয়োজনীয় পদার্থ ঐ শস্য বা উদ্ভিদ্ উৎপন্ন করিবার সময়ে দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে দুইটি উপকার হয়। প্রথম খরচ কম পড়ে, দ্বিতীয় প্রতি ফসলেই অবস্থানুযায়ী প্রচুর শস্য পাওয়া যায়।

পূর্ণাঙ্গ সার সকল ফসলেই অবিচারিত ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে না। উদ্ভিদের প্রকৃতি বিবেচনায় সারকে পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করার উপকার আছে, যথা—তামাক, গোধূম ইত্যাদি ফসলে যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ অধিক পরিমাণে দিতে হইবে। কিন্তু মটর প্রভৃতি শিম্ব জাতীয় পদার্থে কেবল ধাতব পদার্থই দিতে হইবে. মটর ইত্যাদি শিম্বজাতীয় ফসল বায়ু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে, সেই জন্য শস্য পর্য্যায়ে কেবল ধাতব সার অথবা উদ্ভিদের প্রথম বিবর্দ্ধন জন্য সামান্য একটু যবক্ষারজানময় পদার্থ ঐ ধাতব সারের সঙ্গে জমিতে দিয়া প্রথমে কোন শিম্বজাতীয় ফসল উৎপন্ন করিলে, ঐ ফসল দ্বারা মৃত্তিকাতে যথেষ্ট পরিমাণে যবক্ষারজানময় পদার্থ রক্ষিত হইবে। তৎপর তামাক কিংবা ওদন শস্য আবাদ করিলে ঐ ফসলের মুখ্যাঙ্গ যবক্ষারজানময় পদার্থ সারে অপেক্ষাকৃত কম দিতে হইবে। অথবা ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী ফসল পুষ্পোদ্গম সময়ে জমিতে হাল দিয়া পুঁতিয়া দিলে, আর কোন সার না দিয়াও অথবা অল্প পরিমাণে সার দিয়াই, উত্তম ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারিবে। অতএব রাসায়নিক সারে অতি সহজেই, এবং অল্প খরচেই, যে শস্যের যে উপকরণের প্রয়োজন, তাহা দিয়া প্রচুর ফসল পাওয়া যাইতে পারে।

রাসায়নিক সার অতি সহজে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উহার কার্য্যকারিতা অধিক হইলেও গোময়াদি সারের তুলনায় ব্যয়াধিক্যের আশঙ্কায় অনেকেই ইহার ব্যবহারে পশ্চাৎপদ হইতে পারেন, সুতরাং গোময়াদি সারের তুলনায় ইহার ব্যয় কত, তাহার আলোচনা অসঙ্গত হইবে না।

গোময়াদি সারের ব্যয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতবিরোধ আছে। অনেকেই বলেন, গোময়াদি সারের আবার ব্যয় কি? বাড়ীতে আবাদের হাল এবং গাড়ীর বলদ আছে, দুগ্ধের জন্য গাভী আছে; পাটা, ছাগী, ভেড়া আছে; কুক্কুট, হংস, পারাবত ইত্যাদি পক্ষী আছে; ঘোড়া আছে; তাহাদিগের মলমূত্র, বিচালি এবং বাড়ীর আবর্জ্জনা ইত্যাদির আবার মূল্য কি? এ সমস্ত বিনা ব্যয়ে আপনা আপনিই হইয়া থাকে এবং হইবে। বাস্তবিকই আমাদের দেশে কৃষকগণ জমিতে যে সার দেয়, বলিতে গেলে তাহার কোন ব্যয়ই নাই। দরিদ্র প্রজা ব্যয় করিয়া জমিতে সার দিতে পারে না। কিন্তু এই প্রকার বিনা ব্যয়ে যে সার হয়, তাহা অল্প জমির জন্যও যথেষ্ট নহে। আমাদের দেশে কৃষকগণ কেবল বিশেষ বিশেষ শস্যে সামান্য মাত্র সার দিয়া থাকে। যাহারা অধিক জমি আবাদ করে, তাহারা ইচ্ছা করিলেও সমস্ত জমিতে সকল ফসলের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিয়াও সার সংগ্রহ করিতে পারে না। কারণ সকল কৃষকই আপন আপন জমির জন্য সার রক্ষা করে, কেহই সার বিক্রয় করিতে পারে না, অথবা চাহে না। বিবেচনা কর, কোন অবস্থাপন্ন কৃষক অথবা কৃষিকার্য্যাভিলাষী কোন ভদ্র ধনী ৫০০ বিঘা ভূমিতে প্রতি বর্ষে মূল্যবান্ ফসল ইক্ষু, অথবা আলু আবাদ করিতে প্রয়াসী। বিঘা প্রতি ন্যূনকল্পে ২০০/ মণ গোময়াদি সার তাহাকে জমিতে দিতে হইলে, তাহাকে বৎসরে ১,০০,০০০ এক লক্ষ মণ সার সংগ্রহ করিতে হইবে। ৫০০ বিঘা জমি আবাদ করিতে যত গো-মহিষ তাহার প্রয়োজন, তাহাতে ঐ এক লক্ষ মণ সার সংগৃহীত হইতে পারে না। সার কিনিতেও পাওয়া যায় না। সুতরাং এই এক লক্ষ মণ সার সংগ্রহের জন্য, তাহাকে অতিরিক্ত বহু গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ ইত্যাদি পশু সংগ্রহ এবং পালন করিতে হইবে। অবশ্য এই অতিরিক্ত পশ্বাদির দুগ্ধ, মাংস ইত্যাদি বিক্রয় এবং তাহাদিগকে ভারাদি বহন কার্য্যে নিয়োগ করিয়া বার্ষিক কিছু আয় হইবে কিন্তু ঐ সমস্ত পশু ক্রয় করিতে যে মূলধনের প্রয়োজন, তাহার সুদ এবং ঐ সকল পশু পালন করিতে যে ব্যয় হইবে, তাহা হইতে আয় বাদে অবশিষ্ট যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, তাহাই ঐ পশু ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত সারের মূল্য ধরিতে হইবে।

আমাদের দেশে চা বাগান ভিন্ন বড় বড় আবাদ নাই এবং জমিতে রীতিমত সার দিবার ব্যবস্থাও নাই। কিন্তু এই কঠিন জীবনসংগ্রামের দিনে, জমিতে যথেষ্ট সার দিয়া শস্য উৎপাদন করা প্রয়োজন হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে বড় বড় খামার আছে এবং উন্নতিকামী তদ্দেশীয় কৃষকগণ জমিতে সার দিবার উপকারিতা অবগত থাকায়, সেই সকল দেশে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পূর্ব্বে তথাকার খামার বাড়ীতে সার সংগ্রহের জন্য বহু পশু রক্ষিত ও পালিত হইত। খামারস্বামিগণ তাঁহাদিগের আয়ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রাখিতেন এবং ঐ সকল খামারে উৎপন্ন সারের আয় ব্যয় হিসাবে মূল্য অবধারণ করিতেন। ঐ সকল হিসাব হইতে দেখা যায় যে, প্রতি টন (২৭/৮) "খামার বাড়ীর" সারে ৯৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ পড়িয়াছে। এই হিসাবে ন্যূনসংখ্যা ৯৲ টাকা, অর্থাৎ মণকরা ।/৩ পাঁচ আনা, তিন পাই অর্থাৎ টাকায় ৩ মণ সার অবধারণ করা যাইতে পারে।

৪০ টন ১০৮৮ মণ খামার বাড়ীর সারে, পরপৃষ্ঠায় লিখিত পদার্থগুলি থাকে:—

যবক্ষার জান	৩৫৮½	পাউণ্ড
পটাস	৩৩০	”
ফস্‌ফরিক এসিড্	১৬৫	”
চূণ	৭০৬½	”

উল্লিখিত উপকরণগুলি ঐ পরিমাণ পাইতে নিম্নলিখিত রাসায়নিক দ্রব্যগুলির প্রয়োজন।

এসিড ক্যালসিক ফসফেট	১৩২০	পাউণ্ড
পোটাসিক্ ক্লোরাইড্	৭০৪	”
এমোনিক সল্‌ফেট	১৭২৭	”
ক্যালসিক্ সল্‌ফেট	১৮৭০	”

উহাদিগের মূল্য যথাক্রমে ২ পাঃ ১৭ শিঃ ৬ পেঃ; ২ পাঃ ১১ শিঃ ২ পেঃ; ১৫ পাঃ ১১ শিঃ ১১ পেঃ; ৩ পাঃ ১৩ শিঃ ৬ পেঃ; মোট—২১ পাঃ ১৬ শিঃ ১ পেঃ।

৪০ টন—১০৮৮ মণ 'খামার বাড়ীর' সারের সমকক্ষ রাসায়নিক সারের মূল্য ২১ পাঃ ১৬ শিঃ ৮ পেন্স, ৩২৭৷৷০ টাকা, সুতরাং এক টন (২৭/৮) খামার বাড়ীর সারের সমকক্ষ রসায়নিক সারের মূল্য ১০ শিঃ, ১১ পেঃ=৮৶০। কিন্তু ১ টন খামার বাড়ীর সারে, ১২ শিঃ ৯৲ টাকা ব্যয় পড়ে। (ইহা বলা আবশ্যক যে ৪০ টন খামার বাড়ীর সারের সমকক্ষ কৃত্রিম সারে ৪৪ পাউণ্ড ফসফরিক এসিড বেশী আছে।) অপর খামার বাড়ীর সার প্রস্তুত করিতে বহু অন্তরায় আছে, সংক্রামক রোগে পশ্বাদির মৃত্যুর আশঙ্কা, পশ্বাদি ক্রয় ও পালন করিতে বহু মূলধনেরও প্রয়োজন। কিন্তু কৃত্রিম সার আবশ্যক মত যথাসময়ে বাজার হইতে ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে কোন প্রকার ক্লেশ বা বহু মূলধনেরও প্রয়োজন নাই, লোকসানের সম্ভাবনাও কম, অথচ তুল্য মূল্যে অধিক পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে।

দুই একটি উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়গুলি বিশদরূপে দেখাইতেছি। ফ্রান্সদেশে বিথেনকুন্ কৃষিক্ষেত্রে ২৭৫ একর বা ৮২৫৫৷৷০ বিঘা জমির ১২৫ একর আবাদ এবং ১৫০ একর পশ্বাদি-চারণ জন্য ঘাস রাখা হইত। এই খামারে প্রতি বৎসর ৭১০ টন বা ১৯৩১২ মণ সার পাওয়া যাইত। ১২৫ একর আবাদি জমিতে এবং ঘাসের বৃদ্ধির জন্য প্রতি বৎসর ২৫ একর মাত্র পশু-চারণজমিতে সার দেওয়া হইত। ইহাতে প্রতি একরে প্রতি বৎসর ৪টন ১৬ হন্দর অর্থাৎ বিঘা প্রতি কিঞ্চিদধিক ৪৩/০ মণ সার পড়িত। এই সারে নিম্নলিখিত হিসাবে ফসল জন্মিত।

গোধূম একর প্রতি	২০ বুশেল—১৩/
জই	৩৫ ”
বীটমূল	১০ টন, ৮ হন্দর
ঘাস	১ টন ১৬ হন্দর

খরচ পত্র বাবদ ১৩২ পাউণ্ড=১৯৮০৲ টাকা লাভ হইত। মূলধনের শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা সুদ পোষাইত। ধনী স্বয়ং ম্যানেজারের কার্য্য করিতেন। তাঁহার বেতন ধরিলে ঐ খামারে কিছুই লাভ হইত না। কিন্তু তৎপর প্রতি একর ১পাঃ ১৮ শিঃ ৪ পেঃ ২৮৶০ টাকা অথবা বিঘা প্রতি ৯৶০ আনা টাকা ব্যয়ে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া ২০ বুশেল

স্থলে ৩৩ বুশেল গোধূম অর্থাৎ ২৪০ পাউণ্ড ৩৬০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া, ১৩২ পাউণ্ডের স্থলে ৩২০ পাউণ্ড ৪৮০০৲ টাকা লাভ হইত। খামার বাড়ীতে সার উৎপন্নের যে ব্যবস্থা ছিল, সে সমস্ত ঠিক রাখিয়া তাহার উপর একর প্রতি কিঞ্চিদধিক ৯৲ টাকা অর্থাৎ বিঘা প্রতি ৩৲টাকা মাত্র রাসায়নিক সারে খরচ করিয়া লাভ প্রায় তিন গুণ হইত। কৃষিকার্য্যে লাভ করিতে হইলে কেবল খামার বাড়ীর অর্থাৎ গোময়াদি সার যথেষ্ট নহে। তাহার সহিত রাসায়নিক সারেরও ব্যবহার করা প্রয়োজন। অবশ্য যদি খামার বাড়ীতে চিনির কল কিংবা মদের ভাঁটী থাকে, তাহা হইলে সারের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও কৃষি-কার্য্যে লাভের উপযোগী সার সংগ্রহ হয় না।

এম, ক্যাণ্ডেলিয়ার সাহেবের খামারে চিনির কল ছিল, তাহাতে তাঁহার বৎসরে সর্ব্ব-প্রকারে ১০০০ টন ২৭২০০ মণ সার হইত। ইহাতে তাঁহার আবাদী ১২৫ একর ৩৭৮/২৷৷০ বিঘা জমিতে ২ বৎসর অন্তরও একর প্রতি ২০ টন ৫৪৪ মণ অর্থাৎ বিঘা প্রতি ১৮০ মণ হিসাবে সার পড়িত না। এই সারে তাঁহার একর প্রতি ১৪ টন হইতে ১৬ টন অর্থাৎ বিঘা প্রতি প্রায় ১২৫ হইতে ১৫০ মণ বীট মূল হইত। কিন্তু এক বৎসর পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া তিনি প্রতি একরে ২৩ টন ১৬ হন্দর অর্থাৎ প্রতি বিঘায় ২১৫ মণ বীট মূল পাইয়াছিলেন। সেই অবধি ক্যাণ্ডেলিয়ার সাহেব রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতেন এবং তাহাতে বিশেষ লাভবান্ও হইয়াছিলেন। আজকাল জার্ম্মাণি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের উৎপন্ন বীটমূলের চিনিতে আমাদের দেশকে যে প্লাবিত করিতেছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে সেই সেই দেশের কৃষকগণ রাসায়নিক সার প্রয়োগে অতি অল্প ব্যয়ে যথেষ্ট পরিমাণ অতি উৎকৃষ্ট অর্থাৎ শর্করাবহুল বীটমূল জন্মাইতেছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়া এই প্রকার অতি অল্প খরচে যথেষ্ট বীটমূল জন্মাইতে না পারিলে তাহারা কখনও আমাদের দেশে এত সুলভ মূল্যে চিনি আমদানি করিয়া আমাদের দেশের চিনি-শিল্প ধ্বংস করিতে পারিত না।

যে কৃষক জমিতে গোময়াদি ভিন্ন অন্য সার ব্যবহার করে না, তাহার জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়া থাকে। কারণ ঐ গোময়াদি সার কেবলমাত্র তাহার জমি হইতে উৎপন্ন হয়। জমিতে যে শস্য হয় তাহার অধিকাংশই বিক্রীত হইয়া স্থানান্তরিত হয় বলিয়া ক্যাল্সিক্ফস্ফেট, চূণ, পটাস্ এবং যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ অনেক লোকসান হইয়া থাকে। এই লোকসান, গোময়াদি সারে পূরণ হয় না। কেবল পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বৃহৎ নদীর বন্যায় যদি জমি ডুবিয়া পলি পড়ে তাহা হইলেই স্থানান্তর হইতে জলের সহিত আনিত ফস্ফেট ইত্যাদি পদার্থে জমির উর্ব্বরতা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু এরূপ অবস্থা বিরল। সুতরাং কেবল গোময়াদি সারের উপর নির্ভর করা সাধারণ জ্ঞানের বিরোধী।

ক্রমশঃ

শ্রীআশুতোষ লাহিরী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর-শাখার

অষ্টম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ।

১৩২০ বঙ্গাব্দ।

স্থাপিত—১৩১২ বঙ্গাব্দ, ১১ই বৈশাখ।

১৩২০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখা নবমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই সভার অষ্টম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল :—

সভ্যসংখ্যা।

বর্ষ	আজীবন সদস্য	বিশিষ্ট সদস্য	অধ্যাপক সদস্য	সহায়ক সদস্য	ছাত্র সদস্য	মূল ও শাখাসভার	সাধারণ সদস্য শাখাসভার	মোট
৬ষ্ঠ ১৩১৭	১	৫	০	৫	৬	২০৩	২২১	৪৪১
৭ম ১৩১৮	০	৪	০	৭	৬	২০৬	২১৯	৪৪২
৮ম ১৩১৯	১	৫	০	১২	৬	১৩৬	২৫০	৩৮৬

সদস্যের মৃত্যু।

এই সভার অন্যতম সাধারণ-সদস্য নীলফামারী-নিবাসী গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ ও প্রমথ ভূষণ বাগচী মহাশয়ের মৃত্যুতে এই সভা দুঃখিত হইয়াছেন।

সদস্যের পদত্যাগ ও সভার আর্থিক ক্ষতি।

আলোচ্য-বর্ষে মূল ও শাখা পরিষদের ৩৯ জন সদস্য ৪৫৬৲ টাকা এবং কেবল শাখা-পরিষদের ৫ জন সদস্য ২১৲ টাকা চাঁদা বাকী রাখিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। এই উভয় প্রকার সদস্যের নিকটে চাঁদা বাবদে সভার মোট ৪৭৭৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

মূল ও শাখা সভার সদস্যাধিকারের পরিবর্ত্তে কেবল শাখা সভার সদস্যাধিকার গৃহীত সদস্যের সংখ্যা।

আলোচ্য বর্ষে দুই জন সদস্য মূল ও শাখা সভার সদস্যাধিকার ত্যাগ করিয়া কেবল শাখা সভার সদস্যাধিকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের একজন এরূপ সদস্যাধিকার গ্রহণের পূর্ব্বেই মূল ও শাখা সভার দেয় চাঁদা শোধ করিয়া দিয়াছেন।

বিগত বর্ষের সহিত আলোচ্য বর্ষের সদস্য সংখ্যার তুলনা।

পদত্যাগ, মৃত্যু দ্বারা মোট ৪৮ জন সদস্যের নাম তালিকা হইতে বাদ পড়িয়া আলোচ্য বর্ষ-শেষে সদস্য সংখ্যা ৩৮৬ জন হইয়াছে। অর্থাৎ মোটের উপরে বিগত বর্ষ অপেক্ষা ৫৬ জন সদস্য কম হইয়াছে। ইহা সভার পক্ষে আশানুরূপ নহে।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের

নবনির্ব্বাচিত সাধারণ-সদস্য সংখ্যাদি

অধিবেশন	নির্ব্বাচিত-সদস্য-সংখ্যা	মূল ও শাখাসভা	কেবল শাখা	একুন
৭ম সাম্বৎসরিক	৩৬	২	১৮	২০
প্রথম মাসিক	০	০	০	০
স্থগিত প্রথম মাসিক	৩	২	০	২
২য় মাসিক	৪	২	০	২
৩য় মাসিক	১	০	০	০
৪র্থ মাসিক	০	০	০	০
৫ম মাসিক	৪	০	১	১
৬ষ্ঠ মাসিক	২	০	১	১
৭ম মাসিক	০	০	০	০
অষ্টম মাসিক	২	০	১	১
	৫২	৬	২১	২৭

উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে, বর্ষশেষ পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধেক নবনির্ব্বাচিত সদস্য তাঁহাদের দেয় চাঁদাদি প্রদান পূর্ব্বক সদস্যাধিকার গ্রহণ করেন নাই। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আশা করেন যে, শীঘ্রই তাঁহারা সভার সহিত সংসৃষ্ট হইবেন।

আজীবন সদস্য।

আলোচ্য বর্ষে কোচবিহারাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজরাজেন্দ্রনারায়ণভূপ বাহাদুর তাঁহার ১৩ই নবেম্বর তারিখের ৬৮৮নং আদেশলিপি দ্বারা এ সভার আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ পূর্ব্বক সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বিশিষ্ট সদস্য।

প্রসিদ্ধ তিব্বত-ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্রদাস বাহাদুর সি, আই, ই মহোদয় এই সভার বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় সভা উৎসাহিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

অধ্যাপক সদস্য।

মূল পরিষদের গৃহীত নূতন নিয়মাবলীর ৯ম বিধানমত আলোচ্য-বর্ষে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণকে সভার অধ্যাপক-সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জানকীনাথ তর্করত্ন।
" " বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য।
" " হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ।
যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

এই অধ্যাপক-সদস্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন-তর্ককণ্ঠ এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়দ্বয় প্রবন্ধাদি রচনা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য-সাধনে বিশেষ

সাহায্য করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাচীন অধ্যাপক-সমাজের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

সহায়ক সদস্য।

দ্বাদশ জন সহায়ক সদস্য মধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সমস্ত বর্ষ ধরিয়া কার্য্যালয়ের কর্ম্ম সম্পাদনের গুরুভার বহন করিয়াছেন। তাঁহার নিয়মিত উপস্থিতি ও সুব্যবস্থার দ্বারা সভার কর্ম্ম-শৃঙ্খলা সম্পাদিত হইয়াছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার নিকটে এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে-ছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় এই সভা-সংসৃষ্ট ছাত্র শাখার অধিবেশনে যোগদান ও ছাত্রগণকর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধের পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বার্দ্ধক্য-ক্লিষ্ট দুর্ব্বলশরীর লইয়াও যুবজনোচিত উৎসাহের সহিত সুবৃহৎ "নামকোষ" গ্রন্থ শেষ করিয়া সভার হস্তে মুদ্রণার্থ প্রদান করিয়াছেন এবং সুবৃহৎ "অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ" গ্রন্থের সম্পাদন কার্য্য যত্নের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এরূপ অদ্ভুত-কর্ম্মা প্রবীণ সাহিত্যিকের প্রতি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মদনগোপাল নিয়োগী মহাশয় কার্য্যালয়ের কার্য্য-সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত সদস্যগণের নিকটে সভা উল্লেখ-যোগ্য সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছেন।

মূল সভার প্রবর্ত্তিত নূতন নিয়মাবলীর ৩৭ দফার (গ) ও (ঘ) সংখ্যক বিধানানুসারে দুই বৎসরের অধিক কালের চাঁদা অপ্রদানকারী ১৪ জন সদস্যকে উভয় সভায় সদস্যাধিকার লাভের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে কেবল শাখা সভার সদস্যাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। বার্ষিক ৬৲ টাকা স্থলে ৩৲ টাকা চাঁদা নিয়মিত প্রদান করিতে বোধ হয় এক্ষণে আর তাঁহাদিগের কষ্ট বোধ হইবে না।

সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি ও প্রাণস্বরূপ কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ২৯শে ভাদ্র (১৩১৯) শনিবার এই সভার সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া-ছিল। ঐ অধিবেশনের সুবিস্তৃত কার্য্য-বিবরণী রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৭ম ভাগ, ২য় সংখ্যার পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল পরিষদের প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্, এ, মহাশয় ঐ অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের বিষয় বিভাগ।

মাসিক অধিবেশনে প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক একটি, বৈজ্ঞানিক দুইটি, সাধারণভাবে সাহিত্যালোচনা একটি, প্রাচীন গ্রন্থালোচনা তিনটি, ইতিহাসবিষয়ক তিনটি—মোট—দশটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে। মৌলিক তথ্যপূর্ণ-প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া লেখকগণ সকলেই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সভার চিত্রশালায় সুবৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও একখানি প্রস্তরফলক সংগৃহীত হইয়াছে। মুদ্রা-বিভাগে সংগৃহীত মোট ২০টি মুদ্রার মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর কর্ত্তৃক উপহৃত গ্রীসদেশীয় একটি স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই সভার অন্যতম ছাত্রসদস্য শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বগুড়া হইতে সংগৃহীত পরাতন সৌধের কারুকার্য্যবিশিষ্ট একখানি ইষ্টক চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে।

প্রদর্শিত দ্রব্য সম্বন্ধে মন্তব্য।

ছাত্র-সদস্যগণ যত্ন করিলে নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া চিত্রশালার গৌরব-বৃদ্ধি করিতে পারেন। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্রেইনার্ড স্পুনার সাহেব বাহাদুর সভার চিত্রশালায় বিষ্ণুমূর্ত্তির কয়েকখানি আলোকচিত্র উপহার দিয়া সভার অশেষ ধন্য-বাদের পাত্র হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বি, এ, তিন খানি চিত্র চিত্রশালায় প্রদান করিয়াছেন।

১। বঙ্গ-সাহিত্যের জনকস্থানীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের রঙ্গপুরস্থ আবাসস্থলে স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সম্পাদক মহাশয়কর্ত্তৃক প্রস্তাব।

["ক" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]

মাসিক অধিবেশনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অন্যান্য আলোচনা।

২। প্রাচীন কামরূপ অনুসন্ধানের বিশেষ ব্যবস্থা।

৩। লণ্ডনে মহামান্য ভারতসম্রাটের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক মহাসভায় রাজসাহীবিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার এফ, জে মোনাহান স্কোয়ার আই, সি, এস্ মহোদয়কে এই সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন।

৪। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুরে আহূত ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণার্থ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী বার-এট্-ল মহোদয়কে নির্ব্বাচন।

৫। ভারতগভর্ণমেণ্ট হইতে স্থানীয় চিত্রশালা স্থাপন সম্বন্ধে উৎসাহজ্ঞাপক-পত্র পাঠ এবং তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

দার্জ্জিলিং লাউইস্ জুবিলী সেনিটেরিয়াম্ হলে ডাক্তার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পি, এইচ্, ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উক্ত সভায় রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই "যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধ সভার মুখপত্রের ৭ম ভাগ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশেষ অধিবেশন ১৩ই কার্ত্তিক ১৩১৬।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ও তাহার অধিবেশন

আলোচ্য-বর্ষে সভার কর্ম্মচারী ১৫ জন, নির্ব্বাচিত সদস্য ৮ জন এবং মনোনীত সদস্য ৪ জন একুনে ২৭ জন সদস্য লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

উক্ত সমিতির পাঁচটি অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—

প্রথম অধিবেশন

৩১ ভাদ্র (১৩১৯) ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯১২)।

(১) ১৩১৯ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে।

(২) গ্রন্থাধ্যক্ষ, পত্রিকাধ্যক্ষ এবং চিত্রশালাধ্যক্ষগণের কর্ম্ম পরিচালনের নিমিত্ত, প্রণীত নিয়মাবলী পঠিত ও গৃহীত হয়।

(৩) নবসুন্দর দাসের স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থ পুরস্কার-সম্বন্ধে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ সত্ত্বেও কোন প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত হস্তগত না হওয়ায় পুনরায় ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল। আগামী বার্ষিক অধিবেশনে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত পুরস্কার বিতরিত হইবে।

(৪) মহিমারঞ্জন-স্মৃতিসমিতির সভাপতি রঙ্গপুরের সুযোগ্য কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের সহিত কাকিনার রাজা বাহাদুরের পত্র ব্যবহার চলিতেছে ইহার ফলাফল দেখিয়া উক্ত বিষয় সম্বন্ধে এ সভার কর্ত্তব্য নির্ণয় করা হইবে।

(৫) শ্রীযুক্ত শশীমোহন অধিকারী মহাশয়ের পত্নীর স্মরণার্থ তাঁহার নিজ ব্যয়ে "ভক্ত চরিতামৃত" গ্রন্থের মুদ্রণ এ সভার অনুমোদিত হয়।

(৬) কামাখ্যা-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশ ব্যয় বাবদে স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতি ৫৫৲ মাত্র প্রদান করিয়াছেন। আপাততঃ কিছু টাকা সভার তহবিল হইতে দিয়া উহার মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ করা স্থির হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

৭ই ফাল্গুন (১৩১৯), ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৩)

১। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের পত্র পঠিত হইয়া এই কেন্দ্রসভা তাঁহার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ-পূর্ব্বক দিনাজপুরে প্রাগুক্ত অধিবেশন করা স্থির করেন।

২। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিন নির্দ্ধারণ ও সভাপতি নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণের মত গ্রহণার্থ একটি সভা আহ্বান করার ব্যবস্থা।

৩। এই সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত ভক্ত কবি শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত কর্পূরস্তবের বঙ্গভাষাছন্দে মর্ম্মানুবাদগ্রন্থ গ্রন্থকারের ব্যয়ে মুদ্রণ সভার অনুমোদিত হয়।

৪। চিত্রশালাধ্যক্ষ মহোদয় নিজ দায়িত্বে কুড়িগ্রাম কৃষিশিল্প-প্রদর্শনীতে এই সভার সংগৃহীত প্রদর্শন-যোগ্য দ্রব্যাদি পাঠাইবেন। ঐ প্রদর্শনীতে দ্রব্যগুলির প্রেরণাদির ব্যয় প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ বহন করিবেন। যথাসময়ে দ্রব্যগুলি প্রেরিত হইয়াছিল।

৫। পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রবন্ধ নির্ব্বাচন।

তৃতীয় অধিবেশন

১১ ফাল্গুন, রবিবার (১৩১৯) ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯১৩)।

১। এই বর্ষে ইষ্টার ব্যতীত অন্য কোন ছুটিতে সুবিধা না থাকায় এবং নির্ব্বাচিত সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ঐ সময় ভিন্ন অন্য সময় উপস্থিত হওয়ার সুবিধা না হওয়ায় ও দিনাজপুরনিবাসিগণ অন্য সময়ে সম্মিলনের অধিবেশন করিলে নানা অসুবিধা হইবে জ্ঞাপন করায় সম্মিলনের অধিবেশন ইষ্টার ব্যতীত অন্য সময়ে করিবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গীয় এবং উত্তরবঙ্গের উভয় সম্মিলনের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গদেশ ও আসামের সমস্ত জেলাকে অনুরোধ করা হউক। এতৎসংবাদ দিনাজপুর, মুলসভা ও তাহার শাখাগুলিকে সর্ব্বপ্রথমে জানান হউক। সাহিত্যিকগণের বিশেষ অনুরোধে এই দিন পরিবর্ত্তন করিয়া দশহরার অবকাশে দিনাজপুর-সম্মিলন আহ্বান করা পরে স্থির হয়।

২। মূল সভার ১৩২০ বঙ্গাব্দের জন্য গঠিতব্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে সদস্যরূপে গৃহীত হইবার জন্য এ সভার পক্ষ হইতে শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক মহোদয়কে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়।

৩। শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রনন্দী বাহাদুরের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনসংবাদে এ সভার পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ।

৪। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মহাশয়গণকে চট্টগ্রাম-সম্মিলনে যোগদানের জন্য সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা, ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মহাশয়দ্বয় চট্টগ্রাম-সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধিবেশন

১৪ই বৈশাখ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

(১) শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের প্রস্তাবে ১৩২০ বঙ্গাব্দের জন্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস্ মহোদয়কে এ সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করা সম্বন্ধে সমস্ত সদস্যের অভিমত গ্রহণ করার ব্যবস্থা।

(২) ১৩২০ বঙ্গাব্দের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণের নিয়োগপ্রস্তাব সাধারণ সভায় উপস্থিত করা স্থির হয়।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস্, সভাপতি।

„ অনারেবল্ রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ
„ রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল্,
„ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ, প্রাজ্ঞ,
} সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
„ মদনগোপাল নিয়োগী
„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্
„ হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ
} সহঃ সম্পাদক।

„ অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমিদার — কোষাধ্যক্ষ।
„ রাজেন্দ্রলাল সেন — গ্রন্থাধ্যক্ষ।
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় — চিত্রশালাধ্যক্ষ।
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ — পত্রিকাধ্যক্ষ।
„ ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ — ছাত্রাধ্যক্ষ।
„ আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, — আয়ব্যয়-পরীক্ষক।

„ দীননাথ বাগচী বি, এল্
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্
} সহকারী আয়ব্যয়-পরীক্ষক।

(৩) সভার পক্ষ হইতে কাশিমবাজারের মহারাজকে অভিনন্দিত করা স্থির হয়।

(৪) বার্ষিক অধিবেশনের কর্ম্ম-তালিকা গৃহীত হয়।

(৫) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, মহাশয়কে বিশিষ্ট সদস্যরূপে গ্রহণার্থ সাধারণ সভায় প্রস্তাব উপস্থিত করা স্থির হয়।

(৬) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ও শ্রীসেখ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদকে সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচিত করা হয়। ২০ জন ছাত্র সদস্য গ্রহণ করা হয়।

(৭) অষ্টম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হয়।

(৭) বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই পরিষদ্-গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাবধারণ করা স্থির হয়।

(৮) ঢাকা চিত্রশালা সম্বন্ধে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত গভর্ণমেণ্টের মন্তব্য আলোচিত হইয়া স্থির হয় যে, এই চিত্রশালা-স্থাপনে সভার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এ সভার চিত্রশালায় যে নিদর্শনাদি আছে, তাহা প্রদান করা অসম্ভব। তবে উভয় সভার মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যের আলোচনার আদান প্রদান চলিতে পারে। সভার এই মন্তব্য কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের মধ্যবর্ত্তিতায় যথাস্থানে প্রেরণ করা স্থির হয়।

(৯) শ্রীযুক্ত নবসুন্দর দাস কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত ১৫৲ টাকা দ্বারা তিনটি পুরস্কার ছাত্র-সদস্যগণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

আলোচ্যবর্ষে অনিবার্য্য কারণে তিন সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, শেষ সংখ্যা

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৭ম ভাগ।

প্রকাশিত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রসিদ্ধ লেখকগণের গবেষণাপূর্ণ রচনা দ্বারা পত্রিকার গৌরব পূর্ব্ববৎ রক্ষিত হইয়াছে।

বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদ।

সাপ্তাহিক—হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বসুমতী, সঞ্জীবনী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ঢাকা প্রকাশ, বিশ্ববার্ত্তা, শিক্ষাসমাচর, হিন্দুরঞ্জিকা, প্রসূন, রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, রঙ্গপুরদর্পণ, মালদহসমাচার, গৌড়দূত, আসামবন্তী।

পাক্ষিক—কলেজিয়ান ম্যাগাজিন।

মাসিক—নব্যভারত, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন, মানসী, আর্য্যাবর্ত্ত, ভারতী, সুপ্রভাত, জন্মভূমি, উপাসনা, বিজয়া, জাহ্নবী, সাহিত্যসংবাদ, সাহিত্যসংহিতা, বসুধা, গৃহস্থ, জগজ্জ্যোতিঃ, ডনম্যাগাজিন, অর্ঘ্য, কণিকা, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, প্রতিভা, কোহিনুর, তারা, তিলিবান্ধব, শান্তিকণা, তোষিণী, হিন্দুপত্রিকা, হিন্দুসখা, বীরভূমি, বৈষ্ণবসঙ্গিনী, গৌরাঙ্গসেবক, বাহী, আলোচনী, ব্রাহ্মণসমাজ, আয়ুর্ব্বেদহিতৈষিণী, অলৌকিকরহস্য, কৃষিসম্পদ্, প্রজাপতি, ভারত-মহিলা, ব্যবসায়ী, সৌরভ, বিজ্ঞান, প্রবাসী।

ত্রৈমাসিক—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত হইয়াছে। উপহার দাতৃগণ প্রত্যেকেই সভার

মুদ্রিত ও উপহৃত গ্রন্থ।

ধন্যবাদের পাত্র:—গৌড়রাজমালা, গাইডবুক, নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন, হেড়ম্বরাজের দণ্ডবিধি, বঙ্গের কবিতা, Early History and Growth of Calcutta, পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ (উপক্রমণিকা) পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ (ভেষজ বিভাগ), শিক্ষাবিজ্ঞান ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ, নারীশিক্ষা, নিদর্শন, বঙ্গের জাতীয়

ইতিহাস, মৌণীবাবা, আদর্শপত্রলেখন, শ্রীমৎনামকোষ, Annual Report of the Northern Bengal Mounted Rifles, Twentyforth annual report of Uupper Burmah Volunteer Rifles, সামবেদসংহিতা, ভাষাতত্ব, কাব্যমালা, নিশীথ-চিন্তা, দেবসমিতি, গীতিকুঞ্জ, তারকেশ্বরতথা, প্রায়শ্চিত্তপঞ্চালিকা, কালীপদ মিত্র, প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলী, স্তবপঞ্চক, নতিনলিনী, বাঘা তেঁতুল, Research and Review, Journal and text of the Buddhist Society, Calcutta, বাঙ্গলাভাষা, গৌড়লেখমালা, Some letters on the Elevation of the Raja Benoy Krishna Dev, অনুসন্ধান, সাধনা।

গ্রন্থ-প্রকাশ।

দিনাজপুরের সাধক কবি শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কর্পূরস্তবের ছন্দ মর্ম্মানুবাদগ্রন্থ গ্রন্থকারের স্বব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় বেলপুকুর পল্লীপরিষদের পক্ষ হইতে দুই শত টাকা এই তহবিলে দান করিয়া সভার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দীঘাপতিয়ার সুযোগ্য কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ, মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে সুবৃহৎ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ গ্রন্থের ২২ ফর্ম্মার মুদ্রণকার্য্য শেষ হইয়াছে। অনুমান আর দশ ফর্ম্মায় ঐ গ্রন্থের আদিকাণ্ড শেষ হইবে।

পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে প্রাপ্ত দান।

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্রনন্দী বাহাদুর পরিষদের গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে তাঁহার প্রতিশ্রুত ৫০০৲ শত টাকা প্রদান করিয়া সভার অশেষ ধন্য-বাদের পাত্র হইয়াছেন।

রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষা।

রামমোহন রায়ের রঙ্গপুরস্থ বাসস্থান ঠিক কোন স্থানে ছিল তাহা নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস্	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, সুপারিঃ কুচবিহার ষ্টেট।
,, অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,, ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ।
,, অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার।	,, সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত আবুল ফত্তাহ জমিদার।

স্থান নির্ণীত হইলে স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে। ঐ স্মৃতিরক্ষা-তহবিলে ১৬৲ নগদ দান এবং ৩০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি, এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নাম তালিকা-পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। (ক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

আলোচ্য বর্ষে রাজসাহীবিভাগের সুযোগ্য কমিশনার শ্রীযুক্ত এফ্, সি, ফ্রেঞ্চ আই, সি, এস্ মহাশয় এই সভাসংসৃষ্ট চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীতি অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিদর্শনমন্তব্য "গ" পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় } কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমত্যানুসারে
২১ বৈশাখ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ } শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

পরিশিষ্ট। (ক)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-তহবিলে প্রাপ্ত দানের তালিকা

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র দাস, তুষভাণ্ডার ; রঙ্গপুর	১৲
„ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিতালদহ, কুচবিহার	১৲
„ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার, ভুতছাড়া, রঙ্গপুর	৫৲
„ জগদীশচন্দ্র মস্তৌফী	১৲
„ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, উকীল, নিলফামারী রঙ্গপুর	২৲
„ সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, যদুলস্কর, কাকিনা ; রঙ্গপুর)	১৲
„ কুমার জগদীন্দ্র দেব রায়কত (জলপাইগুড়ী	১৲
„ কুঞ্জবিহারী হার (রঙ্গপুর)	১৲
„ [illegible] (বগুড়া)	২৲
„ ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	১৲
	১৬৲

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-তহবিলে প্রতিশ্রুত দানের তালিকা :—

Mr. K. C. De I. C. S.	৫৲
„ A. F. M. Abdul Ali, Nawabjada M. A.	১৫৲
Rai Sarat Chandra Chatterjee Bahadur	৫৲
Sreemati Promoda Devi	৫৲
	৩০৲

"খ পরিশিষ্ট"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর-শাখার সদস্য-তালিকা

১৩১৯ বঙ্গাব্দ

আজীবন সদস্য

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণভূপ বাহাদুর, কুচবিহার

বিশিষ্ট সদস্য

১। কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, রঙ্গপুর
২। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ, গৌহাটী আসাম
৩। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি, এল, ঘোড়ামারা রাজসাহী
৪। শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন শাস্ত্রী এম, এ, কুচবিহার
৫। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, লাসা ভিলা দার্জ্জিলিং

অধ্যাপক সদস্য

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ তর্করত্ন কোড়কদী ফরিদপুর
২। " " বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য, ৭৭ জঙ্গমবাড়ী, বেনারসসিটি
৩। " " যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পোঃ বাঙ্গলা সিমুলজানি, ময়মনসিংহ
৪। " " হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ, রঙ্গপুর

সহায়ক সদস্য

৫। " " ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, রঙ্গপুর
৬। " " অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, রঙ্গপুর
৭। " " বিধুশেখর শাস্ত্রী, ৩৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮। " " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, মকদমপুর, মালদহ
৯। অধ্যাপক " বিনয়কুমার সরকার এম, এ, পাণিনি-কার্য্যালয়, এলাহাবাদ
১০। " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, বেগমপুর শ্রীহট্ট
১১। " পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবিশ নাওডাঙ্গা রঙ্গপুর
১২। " গোপালকৃষ্ণ দে কর্জ্জন হল লাইব্রেরী, গৌহাটী
১৩। " উমেশচন্দ্র দে, ডেপুটী কমিশনারের আফিস, ধুবড়ী
১৪। " কুমুদনাথ লাহিড়ী, জাতীয়বিদ্যালয়, মালদহ
১৫। " শশিমোহন অধিকারী, ভোটমারী রঙ্গপুর
১৬। " মোহিনীকুমার বসু, সবওভারসিয়ার ডি, বি, রঙ্গপুর

ছাত্র সদস্য

১। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রঙ্গপুর
২। " সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "
৩। " কালীপদ বাগচী "
৪। " শ্যামাপদ বাগচী "
৫। " সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, চতুষ্পাঠী রঙ্গপুর
৬। " জিতেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এল, "

সাধারণ সদস্য—রঙ্গপুর সদর

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, বাহাদুর
" পূর্ণেন্দুশেখর বাগছী
" আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই,
" ভবতারণ লাহিড়ী এম, এ, বি, এল,
" অনন্তকুমার দাসগুপ্ত
" উপেন্দ্রনাথ সেন
" রাধাকৃষ্ণরায় উকীল
" কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরাজ
" সত্যেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার
" মথুরানাথ দে মোক্তার
" বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুন্সেফ্
" নরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার
" দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন
" সতীশকমল সেন বি এল্,
" নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল্,
" নলিনীকান্ত ঘোষ
" কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম্, এস্,
" প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী
" উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ
" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ জমিদার।
" প্রিয়নাথ পাকড়াশী জমিদার
" যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্
" হৃষীকেশ লাহিড়ী এম্, বি,
" অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্
" এককড়ি স্মৃতিতীর্থ
" আশুতোষ মজুমদার বি, এল,
" শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্,
" নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,
" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্,
" কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল্,
" সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এল্,
" ভুবনমোহন সেন
" বিপিনচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, অনরারীম্যাজিষ্ট্রেট্
" আশুতোষ মজুমদার নায়েব
" যদুনাথ মিত্র
" রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী মোক্তার
" যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল্,
" দীননাথ বাগচী বি, এল,
" কেদারনাথ বাগচী ম্যানেজার টেপা ষ্টেট্
" বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্,
" মদনগোপাল নিয়োগী
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্,

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্,
„ নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কুচবিহার, রাজকাছারী
„ পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্,
„ প্রসন্নকুমার দাস সেনপাড়া
„ অক্ষয়কুমার সেন বি, এল্,
„ যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এল্,
„ যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্,
„ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল্,
„ সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত
„ হেমচন্দ্র সেন
„ কৃষ্ণশঙ্কর চৌধুরী, নবাবগঞ্জ
(পশ্চিমপাড়া ও গোমস্তাপাড়া)
„ শরচ্চন্দ্র মজুমদার, মার্চ্চেণ্ট
„ মুকুন্দলাল রায়
„ রাধারমণ মজুমদার জমিদার
„ শীতলাকান্ত গাঙ্গুলী এম, এ,
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্
„ চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার ডি, বি
„ হরিনাথ অধিকারী
„ ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,
ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট
„ মৌলভী খান তসলিমউদ্দীন আহাম্মদ
বাহাদুর বি, এল,
„ তৈয়বউদ্দীন আহাম্মদ
„ সৈয়দ আবুলফত্তা সাহেব
„ ডাক্তার মহম্মদ মোজাম্মল
„ মৌলবী হাফেজউল্লা
„ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কটকীপাড়া ও ধাপ
„ কুঞ্জবিহারী হার এম, এ, বি, এল,

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার
„ মহম্মদ হুরমত উল্ল্যা
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য
„ রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
„ বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন
ম্যানেজার বামনডাঙ্গা বড়তরফ
রাধাবল্লভ
„ মহম্মদ আলী চৌধুরী, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট
„ মৌলবী কোরবান্ উল্লা
স্পেসাল্সবরেজিষ্ট্রার
„ রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত শিক্ষক
„ শরচ্চন্দ্র বসু
„ এ, এফ, এম্ আব্দুল আলী এম, এ,
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
„ যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার
„ নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার
অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট
„ অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার
„ সিদ্ধেশ্বর সাহা
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টেক্‌নিকাল্ স্কুল
„ গোপীনাথ ঘোষ
আলমনগর তাজহাট ও মাহিগঞ্জ
„ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,
„ গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ,
„ গোপালচন্দ্র দাস
„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষাল
„ সতীশচন্দ্র শিরোমণি
„ রোহিণীকান্ত মৈত্রেয়
„ কিশোরীমোহন হালদার ডাক্তার
„ মোহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী
জমিদার

শ্রীযুক্ত ভৈরবগিরি গোস্বামী
" মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য
" রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
" লোকনাথ দত্ত ম্যানেজার ডিম্‌লারাজ
" নরেশচন্দ্র বসু
" কুমার যামিনীবল্লভ সেন ডিম্‌লা

মফঃস্বল (বর্ণানুক্রমিক)

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু চৌধুরী জমিদার, কামারপুকুর সৈয়দপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর
" অতুলচন্দ্র দত্ত এম্, এ, বি, এল্, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর নোয়াখালি
" অমূল্যদেব পাঠক বি, এল্, দিনাজপুর।
" অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় নায়েব, বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর
" অখিলচন্দ্র দাসগুপ্ত সব অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন্ কিশোরগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর
" অতুলচন্দ্র দাসগুপ্ত পেন্সার, গোপালপুর বড়তরফ, শ্যামপুর, রঙ্গপুর
" কুমার অমীন্দ্রনারায়ণ, মোগরা পোষ্ট, ত্রিপুরা
" অক্ষয়কুমার পাল, নিলফামারী মুন্সেফ্ কোর্ট্, নিলফামারী, রঙ্গপুর।
" মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, ওল্ড বালিগঞ্জরোড কলিকাতা
" আনন্দচন্দ্র সেন, বণিক্‌প্রেস, ৬০নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্ কলিকাতা
" আব্দুল আজিজ চৌধুরী জমিদার, মহীপুর-গজঘণ্টা, রঙ্গপুর
" মহামহোপাধ্যায় আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ—পোঃ গৌরীপুর, আসাম
" চৌধুরী আমানতুল্ল্যা আহাম্মদ জমিদার—কোচবিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, পোঃ বড়মরিচা, কোচবিহার
" মৌলবী মহম্মদ আমীর উদ্দীন খাঁ—ফরিদাবাদ, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর
" আইনউদ্দীন আহাম্মদ, সেক্রেটারী, খোলাহাটী, আঞ্জুমান হেদায়েতল ইস্‌লামিয়া খোলাহাটী, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর
" মৌলবী আমীরউদ্দীন আহাম্মদ উকীল, মেকলিগঞ্জ পোষ্ট, কোচবিহার
" আকবর হোসেন চৌধুরী, নোহালী, তুষভাণ্ডার পোষ্ট, রঙ্গপুর
" আনন্দলাল চৌধুরী ; জমিদার, রায়কালী, বাগুড়া
" ইয়ানতুল্যা সরকার, পোষ্ট কিসমত ফতেমামুদ, ভায়া হলদীবাড়ী রঙ্গপুর
" ঈশানচন্দ্র পাল চৌধুরী, জমিদার, মুজাটা, গুণেরবাড়ী, ময়মনসিংহ
" উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, মন্থনা বড় তরফ, পোঃ পীরগাছা, রঙ্গপুর
" উপেন্দ্রনাথ সরকার, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার
" উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী জমিদার, সেরপুর পোঃ, বগুঁড়া
" কুমুদবিহারী রায় জমিদার, দমদমা, পাঁচবিবি পোষ্ট, বগুড়া
" কামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টেশনমাষ্টার, রঙ্গিয়া পোঃ, গোহাটী, আসাম

শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার নায়েব ; মজুমদারের কাছারী, উলীপুর, রঙ্গপুর
" কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন, এম্, এ, বি, এল, ২০নং মির আতার লেন, ঢাকা
" কালিদাস চট্টোপাধ্যায় নিলফামারী, রঙ্গপুর
" কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী
" কিশোরীবল্লভ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর
" কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী কাব্যতীর্থ, কলিগ্রাম পোঃ, মালদহ
" কুমুদনাথ চৌধুরী জমিদার, কুঠীবাড়ী, সেরপুর পোষ্ট, বাগুড়া
" কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার, কলীতলা, দিনাজপুর
" কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার, ইংরেজাবাদ, মালদহ,
" কৃষ্ণচরণ সরকার জমিদার, পোঃ কালিগ্রাম, মালদহ
" কামিনীমোহন বাগচী জমিদার, পোঃ বরিয়া, রাজসাহী
" কাশীকান্ত মৈত্রেয়, পাতালেশ্বর, বেনারস সিটি
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার, বড়বন্দর, দিনাজপুর
" কালিদাস চক্রবর্ত্তি—সবরেজিষ্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর
" কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস শিলং, আসাম
" কানাইয়া লাল কাশীবাল ৮, গয়ঘাট বেণারস C/o পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত
" গঙ্গাচরণ সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম
" গোপালচন্দ্র দাস ডাক্তার পোঃ বদরগঞ্জ, জিলা রঙ্গপুর
" কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ বার-এট্-ল—কোচবিহার
" গোবিন্দকেলী মুন্সি জমিদার ; নলডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর
" গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, বালুরঘাট
" গোপালচন্দ্র কুণ্ডু মার্চ্চেণ্ট, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর
" গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, তুষভাণ্ডার ; রঙ্গপুর
" গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ডাক্তার, দিনাজপুর
" গোপাললাল ভাদুড়ি সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, পোঃ পাকুরিয়া, রাজসাহী
" কুমার চন্দ্রকিশোর রায় ; বর্দ্ধনকুঠী রাজবাড়ী, পোঃ গোবিন্দগঞ্জ ; রঙ্গপুর
" ছত্রনাথ চৌধুরী জমিদার দুর্গাগঞ্জ ; পুর্ণিয়া
" জগদীশচন্দ্র মুস্তফি জমিদার, পোঃ গোবরছরা, কোচবিহার
" জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি, এল, পোঃ চাপাই, নবাবগঞ্জ, মালদহ
" জগচ্চন্দ্র সরকার ডাক্তার ; হরিপুর ডিস্পেনসরি পূর্ণনগর পোঃ, রঙ্গপুর
" তারাসুন্দর রায় বি, এল, গাইবান্ধা ; রঙ্গপুর
" তারকচন্দ্র মৈত্রেয়, পোঃ বরিয়া পাকুড়িয়া ; ইটালি, রাজসাহী

শ্রীযুক্ত দুর্গাকমল সেন সবরেজিষ্টার ; রাইগঞ্জ ; দিনাজপুর
" দীননাথ সরকার মোলানখুড়ি ; ফারাবাড়ী পোঃ ; রঙ্গপুর
" কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ কোঙর পাঙ্গা ; রঙ্গপুর
" নলীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল বগুড়া
" নলিনীকান্ত অধিকারী বি, এল বালুরঘাট ; দিনাজপুর
" নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার ; থানাসিংপুর, পোঃ গাইবান্ধা ; রঙ্গপুর
" নগেন্দ্রপ্রসাদ রায় বি এল, উকিল, কোচবিহার
" নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী ; ভাগলপুর
" নবীনচন্দ্র সরকার পণ্ডিত, কালীগঞ্জ পোঃ ভবানিগঞ্জ রঙ্গপুর
" অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর গৌরীপুর আসাম
" প্রিয়নাথ লাহিড়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ কাকিনারাজ পোঃ কাকিনা, রঙ্গপুর
" প্রিয়নাথ ঘোষ এম, এ, দেওয়ান বাহাদুর কোচবিহার
" প্রিয়নাথ ভৌমিক, আইসঢাল কাছারি, পোঃ সৈয়দপুর, রঙ্গপুর
" জষ্টিস্ স্যার প্রমদাচরণ বন্দোপাধ্যায়, এলাহাবাদ
" পঞ্চানন নিয়োগী এম. এ ; অধ্যাপক রাজসাহি-কলেজ, রাজসাহী
" প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল নায়েব আহেলকার, দীনহাটা পোঃ, কোচবিহার
" প্রমথনাথ মুন্সী জমিদার, সেরপুর পোঃ, বগুড়া
" প্রিয়নাথ রক্ষিত ; পোঃ ঘাটনগর, দিনাজপুর
" প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল ; বগুড়া
" রায় চৌধুরী প্রমদারঞ্জন বক্সী জমিদার, কোচবিহার
" পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, কুণ্ডী গোপালপুর ; শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর
" প্রিয়নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল ডাক্তার গঙ্গানাথ মিত্রের বাড়ী, বর্দ্ধমান
" প্রমথনাথ খাঁন, শ্যামগঞ্জ, কুয়াপুর, মেদিনীপুর
" পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৩নং ফরডাইস্ লেন, কলিকাতা
" প্রিয়নাথ বিদ্যারত্ন বি এ, কোর্ট সব ইনস্পেক্টর অব পুলিশ, সিরাজগঞ্জ কোর্ট, পাবনা
" বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল মালদহ
" বরদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এল, দিনাজপুর
" বেণীমাধব দাস, গাইবাঁধা, রঙ্গপুর
" বিনোদবিহারী রায়, ডাক্তার মালোপাড়া ; রাজসাহী
" বীরেশ্বর সেন, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, নদীয়া
" ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, উকিল গাইবান্ধা, রঙ্গপুর

শ্রীযুক্ত ভগীরথচন্দ্র দাস, মোক্তার গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

„ ভবানন্দ সরকার জোতদার, ফলিমারী, গোবরছড়া পোঃ, কুচবিহার।

„ ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ম্যানেজার কাঞ্চন কাছারী, পোঃ পত্নীতলা, দিনাজপুর।

„ বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন বিদ্যানিধি, রায়কালি, বগুড়া।

„ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার, পোঃ ভূতছাড়া, রঙ্গপুর।

„ বিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা দলই পাণ্ডা, কামাখ্যা হিল, গৌহাটী, আসাম।

„ বরদাগোবিন্দ চাকী, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

„ বসন্তকুমার লাহিড়ী, বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ বিমলাচরণ সেনগুপ্ত লাইব্রেরিয়ান, ভিক্টোরিয়া-কলেজ, কুচবিহার।

„ বিনোদবিহারী দাস মুন্‌সেফী আদালত, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।

„ বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, হেড্ পণ্ডিত দমদম মধ্যইংরাজীস্কুল, পোঃ পাঁচবিবি, জেলা বগুড়া।

„ রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল, বাহাদুর, জমিদার পোঃ সৈয়দাবাদ, মুর্শিদাবাদ।

„ শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বি, এল, দিনাজপুর।

„ অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী, কাসিয়াং, দার্জ্জিলিং।

„ মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর, রঙ্গপুর।

„ মন্মথনাথ মজুমদার, সেক্রেটারী শিবাইল সারদাচরণ ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরী, হরিপুর পোঃ, পাবনা।

„ খান মোজাঃফর হোসেন চৌধুরী জমিদার, পালিচড়া, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

„ মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কানুনগো, দীনহাটা, কোচবিহার।

„ রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর জমিদার কুণ্ডী, সপ্তঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর, রঙ্গপুর।

„ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ বুক সিগন্যাল ইন্‌স্পেক্টর, সৈদপুর।

„ মনোরঞ্জন সরকার পাটকাপাড়া, হাতীবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।

„ রায় চৌধুরী মনোমোহন বক্‌সী, জমিদার, কোচবিহার।

„ অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, মোরাদপুর, পাটনা।

„ যাদবচন্দ্র দাস, পোঃ তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।

„ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ, এফ্ আর, এ, এস্, অধ্যাপক কটক-কলেজ, কটক।

„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, উকীল, জজকোর্ট, বড়বন্দর, দিনাজপুর।

„ যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

„ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী জমিদার হরিপুর, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর।

„ যদুনাথ রায় বি, এল বালুরঘাট, দিনাজপুর।

„ যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমিদার, ফতেপুর, ইটাকুমারী পোঃ, কালিগঞ্জ, রঙ্গপুর।

„ যতীন্দ্রমোহন সেন, বি, এল, দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম, এ, পোঃ মোরাদপুর, পাটনা।
" রাধাবিনোদ চৌধুরী, খোলাহাটী, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
" রজনীমোহন চৌধুরী জমিদার, মৃজাপুর, দেউলপাড়া পোষ্ট, রঙ্গপুর।
" রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী উকীল, দীনহাটা, কুচবিহার।
" রজনীকান্ত মৈত্রেয়, হেডক্লার্ক পুলিশ-অফিস, দিনাজপুর।
" রজনীকান্ত সরকার বি, এল, নীলফামারী, রঙ্গপুর।
" রজনীকান্ত নিয়োগী মুনসেফী-আদালত, নিলফামারী, রঙ্গপুর।
" রামকুমার দাস দেওয়ান, ফতেপুর ষ্টেট্, ইটাকুমারী পোঃ, কালীগঞ্জ, রঙ্গপুর।
" রামপদ ঘটক পেস্কার, মুনসেফ কোর্ট, গাইবান্ধা।
" রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, পাবনা।
" রজনীকান্ত সরকার, পোঃ রামবাড়ী, মালঞ্চী, রাজসাহী।
" রামচন্দ্র সেন বি, এল, দিনাজপুর।
" লক্ষ্মীনারায়ণ রায় কবিভূষণ, গোপালরায়, কাকিনা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
" শরচ্চন্দ্র সিংহ রায়, জমিদার, রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
" শশীকিশোর চঙ্গদার বি, এল, পোঃ নওগাঁ, রাজসাহী।
" শশিভূষণ ঠাকুর, পোঃ বরিয়া, রাজসাহী।
" কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, দয়ারামপুর, রাজসাহী।
" শশিশেখর মৈত্রেয়, তালন্দ পোঃ, রাজসাহী।
" শশিমোহন ঠাকুর, বরিয়া, রাজসাহী।
" শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মুনসেফী আদালত, কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার, পোঃ নলডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
" সূর্য্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সবরেজিষ্টার দেবীগঞ্জ, জলপাইগুড়ী।
" সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকীল, নিল্ফামারী, রঙ্গপুর।
" পণ্ডিত সারদাচন্দ্র কবিভূষণ, দিনাজপুর রাজবাড়ী পোঃ, দিনাজপুর।
" সতীশচন্দ্র নিয়োগী জমিদার, পোঃ আদমদিঘি, বগুড়া।
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদক-সাহিত্যসমিতি, নবগ্রাম, হেমনগর পোঃ, ময়মনসিংহ।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার কুণ্ডী, সদ্যঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
" সুরেন্দ্রনাথ বক্সি জমিদার, ইনাতপুর বড়তরফ, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।
" সারদানাথ খাঁ বি, এল, বগুড়া।
" সতীশচন্দ্র বড়ুয়া, জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, পোঃ আগমনি, গোয়ালপাড়া, আসাম।
" সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জমিদার, সবরেজিষ্ট্রার ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট,
পোঃ ডোমার, রঙ্গপুর।

শ্রীযুক্ত সারদাগোবিন্দ তালুকদার, পোঃ বাগদুয়ার, চৈত্রকোল, রঙ্গপুর।
„ সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী, পোঃ মুনখাওয়া, ভায়া ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর।
„ সতীশচন্দ্র গোস্বামী মোক্তার, পোঃ নওগা, রাজসাহী।
„ সারদামোহন রায়, হরিদেবপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার নিল্‌ফামারী, রঙ্গপুর।
„ হরিদাস পালিত, পোঃ কলিগ্রাম, মালদহ।
„ হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম, এ, বি, এল নায়েব, উলিপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
„ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার ববনপুর, পোঃ গোবিন্দগঞ্জ, রঙ্গপুর।
„ হরিপ্রসাদ অধিকারী, বিন্যাটাঁড়ী, হরিদেবপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
„ হেমায়েত উদ্দিন আহাম্মদ, C/o শ্রীযুক্ত বাসর মহাম্মদ চৌধুরী, সৈদপুর, রঙ্গপুর।
„ হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ, কলসকাঠী, বরিশাল।

গ পরিশিষ্ট

রাজসাহী বিভাগের সুযোগ্য কমিশনার শ্রীযুক্ত এ ফ্‌, সি, ফ্রেঞ্চ আই, সি, এস
বাহাদুরের রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালাপরিদর্শন মন্তব্য।

I had great pleasure in looking at the Collections of the Rangpur Sahitya Parishat. They have some interesting images and a large Collection of ancient documents many of which they are publishing.

SD. F. C. French.

বঙ্গানুবাদ :—রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সংগৃহীত দ্রব্যাদি দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাঁহারা কতকগুলি চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন; কতকগুলি প্রাচীন দলিলাদি তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি তাঁহারা প্রকাশিত করিতেছেন।

স্বাক্ষর—এফ্‌ সি ফ্রেঞ্চ।

সন ১৩১৯ সালের

আয়-ব্যয়ের বিবরণ

আয়

প্রবেশিকা

চাঁদা— ৯৲

(ক) প্রথম শ্রেণীর সদস্যদিগের নিকট হইতে ৭৪৬৷৶০

(খ) দ্বিতীয় ঐ ৪২৫৲

১১৭১৷৶০

ভিঃ পিঃ কমিশন আদায় ১৬৵০

বার্ষিক অধিবেশনের জন্য প্রাপ্ত সাহায্য ৮৬৲

কুড়িগ্রাম প্রদর্শনীর ব্যয় আদায় ৫৶৯

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য প্রাপ্ত সাহায্য ১৬৲

গচ্ছিত টাকার সুদ আদায় ৭৫৷০

নিমাইচরিত প্রকাশ তহবিল ৯৯৲

সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি বিক্রয়লব্ধ মূল্য

(ক) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মূল্য আদায় ১১৷৶০

(খ) অন্যান্য পুস্তকের মূল্য আদায়

(১) গৌড়ের ইতিহাস ৬৲

(২) চণ্ডিকাবিজয় ৷০

(৩) বগুড়ার ইতিহাস ৩৲

(৪) সেরপুরের ইতিহাস ১৲

(৫) সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলী ১১২৸৶০

১৩৫৲

১৬১৪৶৯ পাই

ব্যয়

বিবিধ মুদ্রণ ব্যয় ৮৪৲

বার্ষিক অধিবেশনের জন্য ব্যয় ১৩২৸৶৬

যাতায়াত ব্যয় ৩৭৸০

বেতন ব্যয় ১৯০৲

দপ্তর সরঞ্জামী ৮১৶৩

ডাকমাশুল ২১৩৷৶৬

কুড়িগ্রাম কৃষিশিল্পপ্রদর্শনীতে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি-প্রেরণ ব্যয় ৫৷৶৩

লণ্ডন আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক মহাসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যয় ১৫৶০

কার্য্যালয় মেরামত ২৸৶০

আসবাব খরিদ ৫।৶৬

পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের জন্য ব্যয় ২১৸০

মহিমারঞ্জন স্মৃতিসমিতির জন্য ব্যয় ১৶৩

গ্রন্থাগারের ব্যয় ৭৲৬

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন :—

(ক) গৌরীপুর-অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশের ব্যয় ৯৬৸৶৯

(খ) মালদহ-অধিবেশন-ব্যয় ৷৶৬

(গ) মালদহ-কার্য্যবিবরণ-প্রকাশ ১৷০

(ঘ) দিনাজপুর সম্মিলন-ব্যয় ১৶৬

(ঙ) কামাখ্যা-সম্মিলন-ব্যয় ৪৵০

১০৪৶৯

৯০৭।৶৬ পাই

আয়		ব্যয়	
জের—	১৬১৪৶৯	জের—	৯০৭।/০
খাতা বিক্রয়ের মূল্য আদায়	১৲	চিত্রশালা	
কর্পূরস্তব-প্রকাশ তহবিল	২৫৲	(ক) মূর্ত্তিসংগ্রহের জন্য ব্যয় ২০৶	
উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন কামাখ্যা অধি-		(খ) চিত্রসংগ্রহের জন্য ব্যয় ৪৶	
বেশনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশ তহবিল	৫৫৲	(গ) মুদ্রাসংগ্রহের জন্য ব্যয় ২৲	
	১৬৯৫৶৯		২৬।/০
বিগত বর্ষের তহবিল	১০১৬৸৶৩	বিবিধ ব্যয়	৭৸৶৬
	২৭১১৸/০	সাহিত্য-পরিষৎ সংক্রান্ত গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের ব্যয়	
বাদ খরচ	১৯৯৫/০	(ক) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় ৩৫৮৸৶০	
	৭১৬৸০	(খ) অন্যান্য পুস্তক প্রকাশের ব্যয়	
		(১) রঙ্গপুরের ইতিহাস প্রকাশের ব্যয় ৩৸০	
		(২) কুণ্ডীর ঐ ২০৲	
		(৩) অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণপ্রকাশ ৮৫।০	
		(৪) ভক্তচরিতামৃত প্রকাশ ৶৬	
		(৫) কর্পূরস্তব প্রকাশ ৴৬	
		(৬) আহ্নিকাচার তত্বাবশিষ্ট-প্রকাশ ।/০	
		(৭) নামকোষ প্রকাশ ১।/০	
		(৮) সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলির মুদ্রণব্যয় ৭৮৸/০	
			৫৪৮৶০
		ইরশাল মূলসভা	৫০৫।০
			১৯৯৫/০

মঃ সাত শত যোল টাকা বার আনা মাত্র।

(স্বাঃ) শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার

সহকারীসম্পাদক।

বিশেষ তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ—১৩১৯ বঙ্গাব্দ

আয়		ব্যয়	
প্রথমশ্রেণীর সদস্যগণের নিকট হইতে		মূলসভায় ইরসাল	৫০৪॥
চাঁদা আদায়	৭৪৬৷৵০	ইনসিওর ব্যয়	১৲
প্রবেশিকা আদায়	৯৲		৫০৫॥০
	৭৫৫৷৵০	শাখাসভার প্রাপ্য প্রতি টাকায় ॥০ হিসাবে	
১৩১৮ সনের উদ্বৃত্ত তহবিল	১৬৬৶৩		৩৭৭৸৵০
	৯২২৴৩		৮৮৩৷৴০

বিতং

আয়	৯২২৴৩
ব্যয়	৮৮৩৷৴০
	৩৮৸৩

মবলগে আটত্রিশ টাকা বার আনা তিন পাই উদ্বৃত্ত।

সাধারণ ও বিশেষ তহবিলের মোট উদ্বৃত্তের বিবরণ।

সাধারণ তহবিল উদ্বৃত্ত	৬৭৭৸৶৯
বিশেষ তহবিলের উদ্বৃত্ত	৩৮৸৩
মোট উদ্বৃত্ত	৭১৬৸০

তহবিল বিতং

রঙ্গপুর লোন আফিস স্থায়ী আমানত	৫০০৲
ঐ অস্থায়ী আমানত	৫৲
রঙ্গপুর ব্যাঙ্ক অস্থায়ী আমানত	৬০৲
জিম্মা সম্পাদক	১৩৯৶০
ঐ সহঃ সম্পাদক	১২॥৴০
	৭১৬৸০

মং সাত শত ষোল টাকা বার আনা মাত্র।

স্বাক্ষর—শ্রীদীননাথ বাগচী
সহকারী আয়ব্যয়-পরীক্ষক ২১।১।২০

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী-সম্পাদক।

অষ্টম সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

মাসিক অধিবেশন

(১৩১৯ বঙ্গাব্দ)

অধিবেশনের নাম ও তারিখ।	পঠিত প্রবন্ধ ও তাহার লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক।	অন্যান্য আলোচনা
সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশন। শনিবার ১৯শে ভাদ্র (১৩১৯) ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯১২)।		শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর গ্রীসদেশীয় সুবর্ণমুদ্রা ১টি। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—চীনদেশীয় তাম্রমুদ্রা ১টি। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—তিব্বতদেশীয় তাম্রমুদ্রা ১টি। „ প্রমথনাথ খান—বরোদা-ষ্টেটের তাম্র মুদ্রা ১টি। „ „ ঐ ডবল তাম্রমুদ্রা ১টি। „ „ বিকানীর ষ্টেটের তাম্রমুদ্রা ১টি। „ „ টাকি ইমাম অব মস্কট্ ও ওমানষ্টেটের তাম্রমুদ্রা ১টি। „ „ ১৮০৮সনের ইষ্টইণ্ডিয়া কোং তাম্রমুদ্রা ১টি। „ „ নেপোলিয়ন থার্ডের পঞ্চাশ সেণ্ট ১টি। „ „ পর্ত্তুগিজদের সময়ের (১৮৮২) রৌপ্যমুদ্রা ২টি। „ „ অমুদ্ধৃত পাঠ তাম্র মুদ্রা ৬টি এবং পিতলের মুদ্রা ১টি। „ রজনীরঞ্জন দেব বি, এ,—হরগৌরী মূর্ত্তি, শ্রীহট্টের অন্তর্গত গৌর গোবিন্দের নামের সাহিত সংশ্লিষ্টঃ— ১২৬২ সালের ময়ূরাঙ্কিত মুদ্রার আলোকচিত্র। ১২৬৩ „ „ „ „	
প্রথম মাসিক অধিবেশন। ১৬ই অগ্রহায়ণ (১৩১৯) ১লা ডিসেম্বর (১৯ ২)	ময়মনসিংহে স্থায়চর্চ্চা :—শ্রীঅম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ বিদ্যাবাচস্পতি। আমরাজ ও কুমার পাল,—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।		বঙ্গসাহিত্যের জনক স্থানীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের রঙ্গপুরস্থ আবাসস্থলে স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রস্তাব।
বিশেষ অধিবেশন। বুধবার ১৩ই কার্ত্তিক (১৩১৯) ২৯শে অক্টোবর (১৯১২) দার্জ্জিলিং—জুবিলী সেনিটেরিয়াম হল।	শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান।		
দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন। রবিবার ৩রা অগ্রহায়ণ (১৩১৯) ২৫শে ডিসেম্বর (১৯১২)	কবিরাজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন মহাশয়-রচিত—শারীর বিজ্ঞান বিষয়ক পঞ্চম প্রবন্ধ—সন্তানোৎপত্তি।	রাজকুমার যামিনীবল্লভ সেন বাহাদুরের আলয়ে রক্ষিত দিল্লীর সম্রাট্ সের সাহের আদেশে ৮০৮ হিজিরীতে নির্ম্মিত ভগ্ন কামান। ছাত্র সদস্য শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বগুড়া হইতে সংগৃহীত পুরাতন সৌধের কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টকাদি।	প্রাচীন কামরূপ অনুসন্ধানের বিশেষ ব্যবস্থা।
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন। ১২ই পৌষ (১৩১৯) ২৭শে ডিসেম্বর (১৯১২)।	প্রসাদ কবি ও পদচিন্তামণিমালা—শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত।		
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন। ২১শে পৌষ (১৩১৯), ৫ই জানুয়ারী (১৯১৩)।	নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে আলোচনা—শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ, সব ডেপুটি-কালেক্টর।		
পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। ২০শে মাঘ (১৩১৯), ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯১৩)।	পুরিয়্যাল্ বা গ্যাস আলোকের ইতিবৃত্ত—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। কালজেশ্বরী—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন।	পল্লীপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক সংগৃহীত সুবৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও প্রস্তরফলক।	লণ্ডনে মহামান্য ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের নেতৃত্বে অনুষ্ঠাতব্য আন্তর্জ্জাতিক ঐতিহাসিক মহাসভায় রাজসাহীবিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার এফ্, জে, মোনাহান স্কোয়ার আই,সি, এস্ মহোদয়কে এই সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়।
ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন। ২৫শে ফাল্গুন (১৩১৯) ৬ই মার্চ্চ (১৯১৩)।	বর্ত্তমান শিক্ষা ও তাহার অবস্থা, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।	ডাক্তার স্পুনার সাহেব কর্ত্তৃক চিত্রশালায় উপহৃত বিষ্ণুমূর্ত্তির কয়েকখানা চিত্র।	দিনাজপুরে আহুত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতিত্ব-গ্রহণার্থ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, (বি, এ, ক্যাণ্টাব) বার-এট্-ল মহোদয়কে নির্ব্বাচন। ইষ্টারের অবকাশে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।
সপ্তম মাসিক অধিবেশন। ২৩শে চৈত্র (১৩১৯) ৬ই এপ্রেল (১৯১৩)।	পদ্মাপুরাণ ও দ্বিজবংশীদাস ;—শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ, সব ডেপুটী-কালেক্টর।	প্রাচীন নালিকাস্ত্রের ভগ্নাংশ। রায় শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর।	ভারত-গভর্ণমেণ্ট হইতে স্থানীয় চিত্রশালা স্থাপন সম্বন্ধে উৎসাহজ্ঞাপক পত্রপাঠ। উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের দিনাবধারণ।

ঙ পরিশিষ্ট

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অনুগত

ছাত্রসভার

প্রথম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী।

১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

নব আশায় উৎফুল্ল হইয়া, নবজীবনে নবীন প্রভাতে কতিপয় মনীষী পুরুষ যখন রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়েই এই ছাত্রসভার জন্ম হয়। সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে ছাত্রসদস্যের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, বিবেচনায় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃগণ ছাত্রসভারও ভিত্তি-স্থাপন করেন।

ধীরে ধীরে যখন পরিষদ্ নানাবিধ সৎকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন পরিষদের দৃষ্টি ছাত্রসভার প্রতিও আবদ্ধ রহিল, কিন্তু অবসরের অভাবে পরিষদের উদ্যোক্তৃগণ ছাত্রসভার বিশেষ উন্নতি সংসাধনে সক্ষম হইলেন না।

পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক, অক্লান্তকর্ম্মা সাহিত্যসেবী সুরেন্দ্র বাবুর দৃষ্টি প্রথম হইতেই ছাত্রসভার প্রতি প্রখর ছিল। এতদিন তিনি ইহার উন্নতি-সংসাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। গত বৎসর তিনি ছাত্রসভার উন্নতি সংসাধনের জন্য বিশেষ প্রকারে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে গত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে একটি সভার অধিবেশন হইল। উক্ত সভায় বহু ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্র বাবুর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় আকৃষ্ট হইয়া বহু ছাত্র সদস্যপদ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সুরেন্দ্র বাবু মধুর ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন, সভার উদ্দেশ্য কি? তিনি বলিলেন, এইরূপ মহতী চেষ্টায় ছাত্রগণ যদি সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়েন, তবে তাঁহাদের চেষ্টা সত্বরেই সফলতা লাভ করিবে। এইরূপেই নবীন পর্য্যায়ে ছাত্রসভার জন্ম হইল।

বাস্তবিকই বড় পরিতাপের বিষয় রঙ্গপুরস্থ ছাত্রগণ এতদিনও এরূপ পবিত্র সাধনায় যোগদান করেন নাই। যে সমস্ত সভ্যদেশের আদর্শে আজকাল বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ অনুপ্রাণিত, সে সমস্ত দেশের কার্য্যাবলীর অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, এরূপ জাতীয় ব্যাপারে সর্ব্বত্রই ছাত্রগণ সর্ব্বাগ্রে অগ্রণী হয়েন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় ঈদৃশী কষ্টসাধ্য-সাধনা সহজ হইয়া আসে। সুরেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় উক্ত দিনে এই নবীন ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠিত হইল; ইহার পরিচালন সম্বন্ধে নিয়মাবলী তিনি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। তাঁহারই অনুমতিক্রমে ইহাই স্থির হইল যে, প্রতি মাসে এই সভায় একটি করিয়া অধিবেশন হইবে, এবং উক্ত সভায় ছাত্র-সদস্যগণ সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা করিবেন এবং যাহাতে সভার আভ্যন্তরিক সর্ব্ববিধ উন্নতি সংসাধিত হয়, উহার চেষ্টা করিবেন। সভার সভাপতির পদ

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয় গ্রহণ করিলেন।

ছাত্রসভার নবীন জীবনের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত মাত্র ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে ছাত্রসভার উন্নতি বিশেষ প্রকারে দৃষ্ট হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর উৎসাহে, পণ্ডিত মহাশয়ের নেতৃত্বে ইহার বহুল উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। এজন্য ছাত্রসভা উক্ত দুই জনের নিকট বিশেষ প্রকারে ঋণী।

ছাত্রসভার নিয়মানুসারে প্রতি মাসে এক একটি করিয়া সভা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে এবার ছয় মাসের মধ্যে তিনটির বেশী সভা হইতে পারে নাই। ছাত্রদিগের পরীক্ষার গণ্ডগোল ইহার প্রতিরোধের অন্যতম কারণ। তিনটি সভাতেই উপস্থিত ছাত্র সদস্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। অন্য পক্ষে প্রতি সভাতেই ক্রমান্বয়ে ছাত্র সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

সভার নিয়মানুযায়ী প্রতি সভায় এক একটি বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। যদিও ভাষা এবং ভাবগৌরবে প্রবন্ধগুলি পরিষদের অনুরূপ হয় নাই, তথাপি ছয় মাসের মধ্যে ছাত্রদিগের লিপিকৌশল ও রচনাপ্রণালীর যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে ছাত্র-সভার সভাপতি পণ্ডিত মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। এমন কি, তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়াও প্রবন্ধ সঙ্গে লইয়া গিয়া সংশোধন করিয়া পুনরায় প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। সভায় প্রবন্ধ পাঠ ব্যতীত দুইজন সদস্যকে নির্দ্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা করিতে হয়। সভাগুলির বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইইল।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে ছাত্রসভার প্রারম্ভিক অধিবেশন হয়। ঐ সভায় অন্যূন ত্রিশ জন ছাত্র সদস্যপদ গ্রহণ করিলেন। ছাত্র-সদস্যগণের মধ্য হইতে কতকগুলি সদস্য লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির গঠন করা হয়। তৎপর পৌষমাসের একবিংশ দিবসে মহামান্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে ছাত্রসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই সভায় পঁচিশ জন ছাত্রসদস্য উপস্থিত ছিলেন। "ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ উহার আলোচ্য বিষয় রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। আট জন সদস্য প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং এক জন এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাহার পর সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে সভা ভঙ্গ হয়।

তাহার পর কোনও বিশেষ কারণবশতঃ প্রায় তিন মাস কাল সভার কার্য্য স্থগিত ছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৩ই চৈত্র তারিখে সভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। এই সভাতে ৮ জন নূতন ছাত্র সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এই সভাতেও পণ্ডিত মহাশয়ের আজ্ঞাক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধই আলোচ্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এবং সভার কার্য্য শেষ হইলে ছাত্র-সদস্য শ্রীমান্ শ্যামাপদ বাগচী "রামায়ণী যুগে সভ্যতা" নামক এক সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ যাবৎ যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, নিম্নে উহাদিগের রচয়িতা ও প্রবন্ধের নাম দেওয়া গেল।

ছাত্র-জীবনের কর্ত্তব্য—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর চৌধুরী, নরুলহোসেন আহাম্মদ, শ্রীভবশঙ্কর চৌধুরী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর জোয়ারদার, শ্রীকালীপদ চৌধুরী।

রামায়ণী যুগে সভ্যতা—শ্রীশ্যামাপদ বাগচী।

আগামী সভার আলোচ্য বিষয় "মুসলমান শাসনের সময় ভারতের অবস্থা", পণ্ডিত মহাশয় এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

প্রবন্ধ গুলির মধ্যে বিশেষ নূতনত্ব নাই। পূর্ব্বোক্ত সভায় শ্রীমান শ্যামাপদ বাগচী পঠিত প্রবন্ধ "রামায়ণী যুগে সভ্যতা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিষদ্ প্রবন্ধের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধগুলির মধ্যে পরিষদের উপযোগী মৌলিকতা পাওয়া যায় না। আগামী বৎসরে প্রবন্ধের জন্য অনেকগুলি পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে। সমাগত ভদ্র মহোদয়গণের মধ্য হইতেও অনেকে ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং আশা করি, আগামী বৎসরে ছাত্র-সদস্যগণ মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়া প্রত্যেকেই পুরস্কার লাভের যোগ্য হইতে চেষ্টা করিবেন।

প্রবন্ধ পাঠ ব্যতীত এই অল্প সময়ের মধ্যে আর কিছুই করা ঘটিয়া উঠে নাই। পূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু আমাদিগকে মফঃস্বলে গিয়া ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমরা সময়াভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। আমাদিগের সদস্যদিগের মধ্যে অনেকেরই অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি খুবই প্রবল বলিয়া বোধ হয়। ছাত্রবৃন্দ স্বভাবতঃ পরিশ্রমশীল এবং কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া সর্ব্ব কার্য্যেই সফলমনোরথ হইবে বলিয়াই মনে হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু আমাদিগকে যেরূপ প্রোৎসাহিত করিতেছেন, এবং নানাবিধ উপদেশ দানে আমাদিগকে যেরূপ প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন, তাহাতে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বহু কার্য্য দেখাইতে সক্ষম হইব।

ছাত্র-সভার অন্যতম সদস্য শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগ্রহ-নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যেই সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় ১টি অভগ্ন প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং ৫টি বাভ্রবীকায়া মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দিয়া সভার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার প্রয়াস, আশা করি সমস্ত সভ্যবৃন্দকে প্রোৎসাহিত করিবে এবং আগামী বৎসরে আমরা এই দিনে সকলেরই সংগ্রহনৈপুণ্য সাধারণে প্রকাশ করিয়া আমাদের কর্ম্মতৎপরতার পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিব।

এই সমস্ত কার্য্য ব্যতীত আমাদিগের ছাত্রসভার দুই একটি সদস্য প্রায়ই নিয়মিতভাবে কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া কর্ম্মচারীকে নানাবিধ কার্য্যে সহায়তা করিয়া তাঁহার কার্য্যভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়াও পূজ্যপাদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু পরিষদ্-সংলগ্ন পুস্তকাগার ছাত্র-

সদস্যদিগের নিকট সর্ব্বদা মুক্ত রাখিয়া দিয়া বালকদের পাঠের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। রঙ্গপুরে ছাত্রদিগের উপযোগী কোন পাঠাগার নাই, পরন্তু পরিষদে বঙ্গদেশের প্রায় সকল মাসিক পত্রিকাই আসিয়া থাকে, ইহা সদস্যদিগের পক্ষে একটি বিশেষ সুবিধার বিষয় হইয়াছে।

রঙ্গপুরের "ছাত্র-সভা" এই জেলার বা উত্তরবঙ্গের সর্ব্বত্রই তাহার শাখা সভা খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। এ কারণ জনৈক ছাত্রসদস্য ইতিমধ্যে গাইবান্ধা গিয়া সেখানেও একটি ছাত্র-সভা খুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। যদিও এখনও উক্ত সভাটি স্থাপিত হয় নাই, তথাপি উক্ত স্থানের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন যে, অতি সত্বরেই উক্ত স্থানে একটি ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠিত হইবে। নীলফামারী এবং কুড়িগ্রামেও এই মর্ম্মে পত্র দেওয়া গিয়াছে।

এই সকল সত্ত্বেও বলিতে হইতেছে, এরূপ ছাত্রবহুল স্থানে ছাত্র-সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই, এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যদিও বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে, তথাপি তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। আগামী বৎসর হইতে যাহাতে ইহার কার্য্য আরও দ্রুত এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তাহার চেষ্টা করা যাইবে।

বর্ত্তমান ছাত্র-সদস্য-সংখ্যা প্রায় ৪০ জন। এই ছাত্র-সদস্য-সংখ্যার মধ্যে কতকগুলি জেলা স্কুলের ছাত্র, কতকগুলি নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, কতকগুলি কৈলাসরঞ্জন স্কুলের ছাত্র এবং কতকগুলি তাজহাট স্কুলের ছাত্র। মোটের উপর সব স্কুলের ছাত্রই এ সভার সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য ৬ জন ছাত্র লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করা হইয়াছে। সমিতির কর্ম্মকর্ত্তৃগণ যেরূপ ভাবে কার্য্য-পরিচালনা করিয়াছেন, তাহাতে সভা তাহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। সদস্যগণের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল—

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সরকার।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকালীশঙ্কর সরকার, শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর চৌধুরী, শ্রীনরুলহোসেন মণ্ডল।

আরও একটি সুখের এবং আনন্দের বিষয় এই যে, বহু মুসলমান ছাত্রও এই সভার সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ ও যত্ন বিশেষ আশাজনক।

ভগবানের কৃপায় ছাত্রসভা স্থাপিত হইয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু এবং পূজনীয় পণ্ডিত ললিতমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয়দিগের উৎসাহে ইহা পরিচালিত হইতেছে। এখন ভগবানের চরণে প্রার্থনা, যেন ছাত্রসভা তাহার মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধিত করিয়া আপনার কর্ত্তব্যভার লাঘব করিতে পারে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমত্যানুসারে গৃহীত হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সরকার—সম্পাদক।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ

নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

প্রথম দিন।

এই সভার সংস্পৃষ্ট ছাত্রসভার অধিবেশন।

রবিবার ২০ বৈশাখ, শনিবার, ১৩২০ সাল; ৩ মে, ১৯১৩ ইং।

স্থান রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা গৃহ

অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকা।

এই ছাত্রসভার অধিবেশনে রঙ্গপুরের গণ্যমান্য সমস্ত ব্যক্তি যোগদান করেন এবং কাশীমবাজারের মহারাজা মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ছাত্রসভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১। একতান বাদন।

২। শ্রীমান্ কালীপদ বাগচী রচিত একটি প্রারম্ভিক সঙ্গীত।

৩। আবৃত্তি।

৪। ছাত্রসদস্যগণ কর্ত্তৃক মাননীয় মহারাজ বাহাদুরকে অভিনন্দন পত্র প্রদান।

শ্রীমান্ কালীপদ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং শ্রীমান্ কালীপদ বাগচী কর্ত্তৃক সমর্থিত হইবার পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক সভাপতির আসন গ্রহণ।

৫। ছাত্রসভার সম্পাদক শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক ঐ সভার প্রথম সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ।

৭। ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের ছাত্র-সভা সম্পর্কীয় মন্তব্য-পাঠ।

ছাত্রসদস্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত পুরস্কার কয়েকটি ঘোষিত হইয়াছিল।

পুরস্কার দাতার নাম।	যে বিষয়ের জন্য প্রদত্ত হইবে।	পুরস্কারের মূল্য।
(১) মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।	নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ।	৫০৲ টাকা মূল্যের সুবর্ণ পদক।
(২) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ; আই, সি, এস	মৌলিক গবেষণামূলক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ।	১০৲ টাকা।
(৩) শ্রীযুক্ত এ, এফ, এম আবদুল আলি এম, এ, এফ, আর, এ, এস্, এম, আর, এ, এস্ ইত্যাদি	মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের দেশহিতৈষণা এবং ও রঙ্গপুরের সহিত সম্পর্ক বিষয়ক প্রবন্ধ।	সাহিত্যচর্চ্চা সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রৌপ্যপদক।
(৪) শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্	মৌলিক গবেষণামূলক দ্বিতীয় প্রবন্ধ।	৫৲ টাকা।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিতরূপে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, "ছাত্রসভা হইতে অনেক উপকারের সম্ভাবনা। ছাত্রদিগের শিক্ষার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ যখন এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ছাত্রদিগের বিশেষ কল্যাণ হইবে বলিয়াই মনে হয়।"

'ছাত্রসভার প্রথম সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, বিগত বর্ষে কার্য্য সন্তোষজনক রূপেই হইয়াছে। যদি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু ছাত্রগণের কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা হইলে কার্য্য আরও ভাল হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ভূগোল ও ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। যদি ছাত্রগণ এ বিষয় দুইটির আলোচনা করেন, তবে তাঁহাদিগের নিজের ও দেশের বিশিষ্ট উপকার হইবে। দেশের নৈতিক ও অর্থ বল কিরূপে বৃদ্ধি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাও ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।"

"যে সকল ছাত্র অম্ল সুন্দররূপে আবৃত্তি করিয়া সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

"আবৃত্তির বিষয়ীভূত উপদেশগুলি যদি ছাত্রগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করেন, তবে ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া মনে করি। আমরা পূর্ব্বে একটি বিরাট্ জাতি ছিলাম, তাহার স্মৃতি এখনও রহিয়াছে। কিন্তু সেই অতীতের স্মৃতি বহন করিলেই চলিবে না, আমাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মও করিতে হইবে। জগতের জাতিসকল চতুর্দ্দিকে যেরূপ উন্নত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আশা হয় যে, আমরাও উন্নতির পথে অগ্রসর হইব। সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতশূন্য শাসন মানিয়া শিক্ষার পথে অগ্রসর হইলে, আমাদিগের এ আশা সফল হইতে পারে। ছাত্রজীবনে শিক্ষাই একমাত্র বীজমন্ত্র হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।"

দ্বিতীয় দিন।

২১ বৈশাখ রবিবার, ১৩২০ সাল, ৪ মে, ১৯১৩ সাল ইং

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ... সভাপতি

" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ } সহঃ সভাপতি।
" রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল্ }

" কিরণ চন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস্।

" চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় সবর্ডিনেট্ জজ্

" এ, এফ্ এম্ আব্দুল আলি, এম্ এ, এম্, আর্, এ, এস ইত্যাদি।

" শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম্. এ. ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

" ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

" অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

" মহাম্মদ আলি চৌধুরী বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

" বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, মুন্সেফ্।

" শ্রীশচন্দ্র রায় বি, এল, মুন্সেফ্।

" পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ ; অধ্যাপক সদস্য।

" পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ; ছাত্রাধ্যক্ষ।

" পণ্ডিত হরেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

" পণ্ডিত এককড়ি স্মৃতিতীর্থ।

" পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, সহকারী সম্পাদক।

" অন্নদামোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, টেপা।

" যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, টেপা।

" অম্বিকামোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, টেপা।

" মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, কুণ্ডি।

" রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর, জমিদার, কুণ্ডি।

" অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমিদার, রাধাবল্লভ, সভাপতি বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ।

" বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, বামনডাঙ্গা।

" সত্যেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, টেপা।

" ভৈরবগিরি গোস্বামী, জমিদার, মাহিগঞ্জ।

" নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, থানসিংপুর।

" সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, নলডাঙ্গা।

,, মোহিনীমোহন লাহিড়ী, জমিদার, নলডাঙ্গা।

,, শরচ্চন্দ্র সিংহ রায়, জমিদার, রায়পুর।

,, শরচ্চন্দ্র রায়-চৌধুরী, জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা।

,, যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা।

,, মৌলভী আবদুল আজিজ চৌধুরী, জমিদার, মহীপুর।

,, নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র, জমিদার, রহমৎপুর

,, রাধারমণ মজুমদার, জমিদার, রঙ্গপুর।

,, অনাথবন্ধু চৌধুরী, জমিদার, কামারপুকুর।

,, নরেশচন্দ্র বসু, জমিদার, মাহিগঞ্জ।

,, সৈয়দ আবুলফত্তাহ কৈশর-ই-হিন্দ, জমিদার, মুন্সীপাড়া।

,, উমেশচন্দ্র গুপ্ত বি, এল্।

,, যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্।

,, কুঞ্জবিহারী হার এম্ এ, বি, এল্।

,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি, এল্।

,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, বি, এল্।

,, হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম্ এ, বি, এল, নায়েব, বাহারবন্দ।

,, হরিদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল্ ম্যানেজার, তাজহাট।

,, লোকনাথ দত্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডিম্লা রাজ।

,, যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল্, ভাইস্ চেয়ারম্যান্, রঙ্গপুর মিউনিসিপালিটী।

,, দীননাথ বাগচী বি, এল্।

,, আশুতোষ মজুমদার, বি, এল্।

,, উপেন্দ্রনাথ সেন, বি, এল্।

,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি, এল্।

,, সতীশকমল সেন, বি, এল্।

,, নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, বি, এল্।

,, প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী, উকীল।

,, রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী, মোক্তার।

,, মথুরানাথ দে, মোক্তার।

,, রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার।

,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, হেড্মাষ্টার, কৈলাসরঞ্জন হাই স্কুল।

,, নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কোচবিহার রাজ ষ্টেট্।

,, ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, এল্, এম্, এস্।

,, ডাক্তার যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী।

,, কবিরাজ কন্দর্পে শ্বরগুপ্ত কবিরত্ন।

নবম বর্ষের কার্য্যবিবরণ।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী, সম্পাদক বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ।
,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
,, গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ, হেড্‌মাষ্টার, তাজহাট হাই স্কুল।
,, রাজেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত, শিক্ষক রঙ্গপুর জিলাস্কুল।
,, ভুবনমোহন সেন ,, ,, ,,।
,, রজনীচন্দ্র সান্ন্যাল, বেলপুকুর।
,, গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।
,, চন্দ্রমোহন ঘোষ, ওভারসিয়ার, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড।
,, হরিনাথ অধিকারী, হেড্‌ ড্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, ট্রান্‌শ্লেটার, জজ কোর্ট, চিত্রশালাধ্যক্ষ।
,, মদনগোপাল নিয়োগী সহঃসম্পাদক।
,, সেখ রিয়াজুদ্দীন আহাম্মদ, দলগ্রাম।
,, জিতেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এ, ছাত্রসদস্য।
,, ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ছাত্রসদস্য।
,, কালীপদ বাগচী, ছাত্রসদস্য।
,, নগেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদক ছাত্রশাখা, ও অন্যান্য বহু ছাত্রসদস্য

দিনাজপুর হইতে সমাগত সাহিত্যক সদস্যগণের নাম :—
,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্‌ এ, বি, এল্‌।
,, পণ্ডিত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্‌।
,, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, ডি।

মূল পরিষৎ হইতে কলিকাতাস্থিত কোন সাহিত্যিক এই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। শ্রীযুক্ত ডাক্তার বসন্তকুমার ভৌমিক ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয়দ্বয় মূল সভার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। উল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত রঙ্গপুর নগরের যাবতীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বিষয়

১। ঐকতান বাদন।
২। রঙ্গপুর ও তাহার অনুগত বেলপুকুর পল্লীপরিষদের সদস্যবৃন্দ কর্ত্তৃক মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে অভিনন্দন পত্র প্রদান।

সভাধিবেশন

১। প্রারম্ভিক সঙ্গীত।
২। মঙ্গলাচরণ।

৩। এই সভার স্থায়ী সভাপতি কর্ত্তৃক অভ্যাগত মহোদয়গণকে সম্ভাষণ।

৪। সভাপতি বরণ।

৫। সভাপতির অভিভাষণ।

৬। সম্পাদক কর্ত্তৃক অষ্টম বাৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠান্তে সদস্যগণ কর্ত্তৃক গ্রহণ।

৭। বিগত বর্ষের সপ্তম মাসিক কার্য্যবিবরণ গ্রহণ।

৮। বিশিষ্ট, অধ্যাপক, সহায়ক, ছাত্র ও সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন।

৯। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

১০। পুরাতন কর্ম্মাধ্যক্ষগণের পদত্যাগ ও ১৩২০ বঙ্গাব্দের জন্য নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ।

১১। ১৩২০ বঙ্গাব্দের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন।

১২। সভার চিত্রশালাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক ১৩১৯ বঙ্গাব্দে সংগৃহীত ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি প্রদর্শন।

১৩। শ্রীযুক্ত নবসুন্দর দাস মহাশয়ের স্বর্গগতা পত্নীর স্মরণার্থ প্রদত্ত পুরস্কার ছাত্রসদস্যগণ মধ্যে বিতরণ।

১৪। প্রবন্ধ (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়ের রচিত "কামরূপপতি ভাস্কর বর্ম্মার নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন আলোচনা।" (খ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল সেন মহাশয়ের "বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি"।

১৫। সমাগত সাহিত্যিকগণের বক্তৃতাদি।

১৬। সভাপতির মন্তব্য।

১৭। দিনাজপুরে আহূত উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক ঐ সম্মিলনে যোগদানার্থ সাহিত্যিকগণকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন।

১৮। সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

সভাধিবেশনের পূর্ব্বে পরম বিদ্যোৎসাহী মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের রঙ্গপুরে শুভাগমন উপলক্ষে রঙ্গপুরের পরিষদের সদস্যবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়, সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, সদস্যগণের পক্ষ হইতে ঐ অভিনন্দন পত্র পাঠপূর্ব্বক যথারীতি মহারাজ বাহাদুরের করকমলে অর্পণ করেন। এই অভিনন্দন পাঠকালে পরিষদের সদস্যবৃন্দ মহারাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। অভিনন্দন পত্র পাঠের পরে এই সভার অনুগত বেলপুকুর পল্লী পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় ঐ সভার সদস্যগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র পাঠপূর্ব্বক যথারীতি মহারাজ বাহাদুরের হস্তে অর্পণ করেন। ইহার পরে যথারীতি সভাধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

এই সভার অন্যতম ছাত্র সদস্য শ্রীমান্ কালীপদ বাগচী কর্ত্তৃক রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি কতিপয় সুকুমারমতি বালক কর্ত্তৃক মিলিত কণ্ঠে গীত হইয়াছিল।

নবম বর্ষের কার্য্যবিবরণ।

সঙ্গীত।

ছন্দোবন্দে ললিত তানে ধরণী মোহন মধুর গানে,
কে দেয় রুদ্ধ কণ্ঠে মোদের শক্তি নীরব প্রাণে ;
কাহার চরণ পরশ আবেশে মানব মগন ধ্যানে।

কোরাস :—[জ্ঞান-গরিমা-দীপ্ত-সুপ্ত বধির মরমে আশা—
অমল ধবল কিরণ উজল আমার মাতৃভাষা ।]
কৃত্তির বীণা, কাশীর কণ্ঠ, চণ্ডীবিদ্যাপতির শঙ্খ,
ভারত মুকুন্দ কার পদতলে ঢালিল পুষ্প জল,
অক্ষয় রাঙ্গিল তুলিকা ধরিয়ে কাহার চরণ তল।

কোরাস :—[জ্ঞান-গরিমা-দীপ্ত-সুপ্ত বধির মরমে আশা—
অমল ধবল কিরণ উজল আমার মাতৃভাষা ।]
হেম বঙ্কিমের মাতৃমূর্ত্তি, কাহার মাধুরী কিসের স্ফূর্ত্তি,
নবীনের নব মুরজ কণ্ঠ কাহার আরতি করে,
রবির সহস্র কিরণ বরষে কাহার চরণ পরে।

কোরাস :—[জ্ঞান-গরিমা-দীপ্ত-সুপ্ত বধির মরমে আশা—
অমল ধবল কিরণ উজল আমার মাতৃভাষা ।]
কাহার বীণার ভৈরব তানে, চেতনা জাগিত সুপ্ত পরাণে,
কাহার পূজায় আজিকে মিলিল লক্ষ ভকত প্রাণ,
হৃদয়ের সব কালিমা জলদ হ'ল আজ অবসান।

কোরস :—[জ্ঞান-গরিমা-দীপ্ত-সুপ্ত বধির মরমে আশা—
অমল ধবল কিরণ উজল আমার মাতৃভাষা।

সঙ্গীতান্তে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্, মহাশয় স্বরচিত নিম্নলিখিত বাণী স্তোত্র পাঠ করেন—

সিত কমলাসন ধৃত পদকমলে
প্রোজ্জ্বল কান্তি বিমল বিধু ধবলে।
বেদ পুরাণ সুশোভিত হস্তে
জয় জয় বুধজন জননি নমস্তে ॥ ১ ॥
মাতর্ভারতি ভারতবর্ষে
তব মহিমোজ্জিত কবিকুলে হর্ষে।
জ্যোতিস্তব পদসরসিজজাতং
জ্ঞানং নাম্না যদিহ খ্যাতম্ ॥ ২ ॥
ভানুকিরণমিব দিশি দিশি কীর্ণং
চক্রে দুর্ম্মতি তিমিরং দীর্ণং।

ধরণি-নিবাসা বিস্মিত-নয়নাঃ
তব-পদ-শরণাগত-জন-শরণাঃ ॥ ৩ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নীতিরনীতিঃ
কার্য্যাকার্য্যে ভীতিরভীতিঃ।
এতৎ সর্ব্বং তব করুণাতঃ
বোদ্ধুমলং মনুজা ইহ মাতঃ ॥ ৪ ॥

ত্বং মাতর্মানবানাং নিখিলভয়হরা সর্ব্ববোধৈকদাত্রী
দেবী বাগ্বাদিনী ত্বং সুরনরমহিতা কোটিসূর্য্যপ্রকাশা ॥
দুঃখানামেকহেতুং জগতি কিলমহামোহরাশিং বিধূয়
সত্যানন্দং জনানাং জননি জনয়িতুং প্রাদুরাসীৎ কৃপা তে ॥ ৫ ॥

অস্মদর্থে মাতরিতঃ ক তে দয়া
যৈতদ্ ভুবঃ পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি-কারণম্ ॥
অশেষদুঃখৈকনিদানমদ্ভুতং
তমঃ কিমেতৎ প্রসৃতং সমন্ততঃ ॥ ৬ ॥

মাতর্বয়ং যদিহ শোচ্যদশামিদানীং
প্রাপ্তা ন কিং ত্বমপি পশ্যসি ধীশ্বরূপা।
কিং চেতনা উত জড়া বয়মেতদেব
হন্তাধুনা কৃতধিয়ঃ পরিচিন্তয়ন্তি ॥ ৭ ॥

মাতস্তদীয় করুণাকণমেত্যধীরা
মর্ত্ত্যাঃ প্রয়ান্ত্যমরতাং ভুবি ভুবি পুণ্যাঃ।
যে ত্বৎকৃপা সুরসরিত্তটসেবমানাঃ
সঞ্জীবয়ন্ত্যপি জড়ানবলোকিতেন ॥ ৮ ॥

নৈবান্তরেণ করুণাময়ি তে প্রসাদং
বিশ্বে কদাপি সুলভঃ সুখশান্তিলেশঃ।
ইত্থং বিবিচ্য শুভবুদ্ধিবলেন ভাগ্যাৎ
পাদারবিন্দসবিধে মিলিতা বয়ং তে ॥ ৯ ॥

অস্মাসু মাতরধুনা কৃপয়া প্রসীদ,
সস্নেহ মা শুচ বিলোকয় তে সুতান্নঃ।
দীপ্তিঃ স্থিরা রুচিতপাদনখেন্দুজা তে,
ধ্বান্তং নিবারয়তু, মোহভবং দুরন্তম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীবরদাকান্ত রায়, বিদ্যাভূষণ।

উক্ত স্তোত্র পাঠের পর শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলী চৌধুরী বি. এ. ডিপুটী কালেক্টর আরবিক ভাষায় একটি সুরা আবৃত্তি করেন। সভার স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের অনিবার্য্য কারণে অনুপস্থিতি হেতু সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় সভার পক্ষ হইতে সমাগত সাহিত্যিকদিগকে অভ্যর্থনাপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ বক্তৃতা প্রদান করেন। "এই সভার অষ্টম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে সমাগত সাহিত্যিকদিগকে এবম্বিধ উৎসাহ দানের নিমিত্ত অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সভার ক্রম বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ তাহার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পরিশিষ্টে রীতিমত প্রকাশিত হইতেছে। সদস্যগণ অবশ্যই তাহা অনুধাবন করিয়া থাকিবেন। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সভার সম্পাদকের ঐকান্তিকতায় প্রধানতঃ সভা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে ও হইবে। তিনি স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সভার উন্নতিকল্পে ব্রতী থাকুন ইহা আমাদিগের ঐকান্তিক কামনা। তাঁহারই নিকটে সভার বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণ আপনারা অল্পকাল পরেই অবগত হইতে পারিবেন। কাশীমবাজারের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বাহাদুর বহুশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আমাদিগের সভাধিবেশনে যোগদান করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার এরূপ অনুরাগ সর্ব্বথা অনুকরণযোগ্য। এরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে আমি আনন্দের সহিত অদ্য দিবসীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণার্থ প্রস্তাব করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি. এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীর বরপুত্র হইলেও মাননীয় মহারাজ বাহাদুর বাণীর উপাসক। কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদের গৃহভিত্তি তাঁহারই করুণাপদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এবম্বিধ মাতৃ-ভাষা-পরিপোষকের পক্ষে সাহিত্যসভার সভাপতিত্ব গ্রহণ শোভন হইবে।"

এই প্রস্তাব সানন্দে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হইলে মাননীয় মহারাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ও সম্পাদক মহাশয় সাদরে তাঁহার কণ্ঠে আশীর্ম্মালা অর্পণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয় সহকারে তাঁহাকে এই উচ্চপদে বরণ নিমিত্ত সদস্যগণকে ধন্যবাদ প্রদানের পর বলিলেন, "এই রঙ্গপুর শাখা যেরূপভাবে কার্য্য করিতেছেন, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই আনন্দ হয়। মূল সাহিত্য পরিষদের সদস্যরূপে আমি আপনাদিগকে ঐ সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকুন; নানা সদ্‌গ্রন্থের প্রচার দ্বারা মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করাই যেন আপনাদিগের ব্রত হয়। আপনারা আমাকে যেরূপভাবে অভিনন্দিত করিলেন, আমি তাহার অনুপযুক্ত হইলেও আপনাদিগের যত্ন-প্রদত্ত উপহার সানন্দে গ্রহণপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।" ইহার পরে তিনি তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন। ইহা সভার মূলপত্রে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

এই অভিভাষণ পাঠের পর সভার সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া যে সকল ব্যক্তি পত্র লিখিয়াছেন; তাঁহাদের পত্র সভায় উপস্থাপিত করা হইল।

সহানুভূতি জ্ঞাপকগণের নাম :—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্ শ্রীকণ্ঠ সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা।

,, প্রিয়নাথ ঘোষ এম্, এ, দেওয়ান কুচবিহার।

,, কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত জলপাইগুড়ি।

অভিভাষণ পাঠের পরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সম্পাদক মহাশয় সভার অষ্টম সাম্বৎসারিক কার্য্য বিবরণীর বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করিয়া সদস্যগণকে শুনাইলেন।

এই কার্য্য বিবরণ গ্রহণার্থ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া নবাবজাদা শ্রীযুক্ত এ, এফ্, এম্, আব্দুল আলী এম্, এ, এম্, আর, এ, এস্ ইত্যাদি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ ইংরাজি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি কার্য্য বিবরণের সম্যক্ আলোচনা করিয়া রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুরের তথ্য সংগ্রহে অতঃপর কি প্রণালী অবলম্বন করা সঙ্গত তাহার ইঙ্গিত করেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ মহাশয় প্রাগুক্ত প্রস্তাব সমর্থনপূর্ব্বক সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের কীর্ত্তি-জ্ঞাপক একটি সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিলেন।

সভার অত্যুজ্জ্বল কর্ম্মপরিচয়জ্ঞাপক কার্য্যবিবরণী এইরূপে সর্ব্বসম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

ইহার পরে সভার বিগত বর্ষের শেষ অর্থাৎ সপ্তম মাসিক কার্য্যবিবরণ যথারীতি পরিগৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ মহাশয় বিশিষ্ট, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত সেখ রেয়াজুদ্দীন আহাম্মদ সহায়ক এবং ৪১ জন ছাত্র সদস্য যথারীতি কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি কর্তৃক অনুমোদনের পর গৃহীত হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

সদস্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত অনারেবল্ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর পোষ্ট কাশীমবাজার, মুর্শিদাবাদ।	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস্।	সম্পাদক
শ্রীযুক্ত রাজা গোপাললাল রায় তাজহাট, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রনাথ কোঙর পোষ্ট পাঙ্গা, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ

সদস্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী ... জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রঙ্গপুর।	সম্পাদক	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী .. জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
শ্রীযুক্ত অম্বিকামোহন রায় চৌধুরী পোঃ টেপা মধুপুর, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী	ঐ
শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল, আজিজ চৌধুরী জমিদার, মহীপুর, পোঃ গজঘণ্টা, রঙ্গপুর।	এ, এফ, এম্, আবদুল আলি	সম্পাদক
শ্রীযুক্ত মৌলবী কোরবান উল্লা আহাম্মদ Special Sub-Registrar, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত গ্রন্থ উপহারদাতৃগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

উপহৃত গ্রন্থের নাম।	উপহারদাতৃগণের নাম
গৌরপদতরঙ্গিণী ...	সম্পাদক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ
বাণী (১৩১৭) বঙ্গীয় নাট্যশালা ১৩১৫ সাল, গৌরাঙ্গমঙ্গল	শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সাহিত্যসেবী, হিন্দু-সাহিত্য-প্রচারক, শিক্ষা সমালোচনা, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, মালদহের গম্ভীরা The Science of History, The Hope of Mankind, The Man of Letters, The Hindu University what it means, Science of Industrial Advancement.	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ
Discovery of Greek Ornament	রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর
মিলিন্দ প্রশ্ন	পণ্ডিত ,, বিধুশেখর শাস্ত্রী
শান্তি মেলা	,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
আরব জাতির ইতিহাস (২য় খণ্ড) ..	,, সেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ
আমিত্বের প্রসার, উপবাস, পল্লী-স্বাস্থ্য, হিন্দু জীবন	রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্তবাচস্পতি।

অতঃপর সভার নিয়মানুসারে পুরাতন কর্ম্মাধ্যক্ষগণের পদত্যাগ সংবাদ সম্পাদক মহাশয় ঘোষণা করিলেন।

১৩২০ বঙ্গাব্দের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিয়োগ প্রস্তাব শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার মহাশয় উত্থাপন করিলেন—

কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নাম।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস্	সভাপতি।
,, অনারেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী	সহকারী সভাপতি।
,, কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ	
,, কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞ	
,, রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল	
,, পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ জমিদার	পত্রিকাধ্যক্ষ।
,, অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার ...	কোষাধ্যক্ষ।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় ...	চিত্রশালাধ্যক্ষ
,, রাজেন্দ্রলাল সেন	গ্রন্থাধ্যক্ষ।
,, ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ	ছাত্রাধ্যক্ষ।
,, পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	সহকারী সম্পাদক।
,, ,, হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ	
,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল,	
,, অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ	
,, মদনগোপাল নিয়োগী	
,, আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, ...	আয় ব্যয় পরীক্ষক।
,, দীননাথ বাগছী বি, এল	সহকারী
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল	আয় ব্যয় পরীক্ষক।

এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফত্তাহ্ কৈশর-ই-হিন্দ্ মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে করতালি দ্বারা সদস্যগণের সম্মতি জ্ঞাপনের নিমিত্ত সভাপতি মহাশয় আহ্বান করিলেন। সানন্দে সদস্যগণ করতালি দ্বারা ইহার সমর্থনসূচক সঙ্কেত করিলে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

অতঃপর সদস্যগণের ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত কুড়ি জন সদস্য ও উল্লিখিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণের দ্বারা ১৩২০ বঙ্গাব্দের জন্য নব কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির গঠন সংবাদ সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইল।

সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের নাম।

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ, কটন কলেজ, গৌহাটী।

,, ,, যদুনাথ সরকার এম, এ মোরাদপুর, পাটনা।

,, ,, বিনয়কুমার সরকার এম, এ, ২৬নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

,, রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর শ্যামপুর, রঙ্গপুর।

,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, বেগমপুর, শ্রীহট্ট।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি, এল, দিনাজপুর।
,, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ৩৪ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
,, ,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, মকদুমপুর, মালদহ।
,, বসন্তকুমার লাহিড়ী, বেলপুকুর, পোষ্ট শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
,, চৌধুরী আমানত উল্লা আহাম্মদ, বড়মরিচা, কোচবিহার।
,, দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল গৌরীপুর আসাম।
,, উমাকান্ত দাস বি, এল বাঘ আঁচড়া, সৈদপুর, দিনাজপুর।
,, পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শিমুলজানি, পোষ্ট বাঙ্গলা, ময়মনসিংহ।
,, পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ।
,, পঞ্চানন সরকার এম্ এ, বি, এল।
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল।
,, কালীকান্ত বিশ্বাস।
,, রাধারমণ মজুমদার।
,, চন্দ্রমোহন ঘোষ।
,, মথুরানাথ দে।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় কর্তৃক ১৩১৯ বঙ্গাব্দে সভার চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

এই প্রসঙ্গে চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় গৃহাভাবে সংগৃহীত দ্রব্যের বিনাশ আশঙ্কার উল্লেখ করিয়া অগৌণে একটি গৃহ নির্ম্মাণার্থ সভাপতি মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেন। তদনুসারে মাননীয় মহারাজ বাহাদুর এই প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি সদস্যগণের সকলেরই মনোযোগ প্রদানের নিমিত্ত বিনীত নিবেদন জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নবসুন্দর দাস মহাশয়ের স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থ প্রদত্ত নিম্নলিখিত পুরস্কারত্রয় সভাপতি মহাশয় কর্তৃক ছাত্রসদস্যগণ মধ্যে সানন্দে বিতরিত হইল :—

পুরস্কার	যে বিষয়ের জন্য প্রদত্ত	পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-সদস্যের নাম
প্রথম পুরস্কার	সভার কার্য্যে বিবিধ প্রকারে সাহায্যের নিমিত্ত	শ্রীকালীপদ বাগচী।
দ্বিতীয় পুরস্কার	সংগ্রহ নৈপুণ্যের জন্য	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
তৃতীয় পুরস্কার	সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধরচনার জন্য	শ্রীশ্যামাপদ বাগচী।

অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, প্রণীত "কামরূপপতি ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন আলোচনা" প্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিবার পূর্ব্বে বলিলেন যে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত অধিবেশনে যে কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম পরিচয়রূপে কামাখ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর কৃপায় প্রসিদ্ধ চীন পর্য্যটক হিউয়েন সাংএর সমসাময়িক কামরূপপতি ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইয়াছে। ইহা সমগ্র বঙ্গের ইতিহাস রচনার একটি প্রধান উপকরণরূপে গৃহীত

হইয়া অচিরপ্রসূতা অনুসন্ধান-সমিতির নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই সুদুর্ল্লভ প্রবন্ধ ও তাম্রশাসনের আলেখ্য এই সভায় সর্ব্বপ্রথমে পাঠ ও প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের সম্পূর্ণ অংশ এ স্থলে পাঠের অবসর হইবে না। চিত্রসহ উহা পত্রিকায় হইলে সদস্যগণ অনুধাবনপূর্ব্বক পাঠ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। তিনি প্রবন্ধের আবশ্যকীয় অংশ এবং একাদশ উর্দ্ধতন পুরুষ পর্য্যন্ত ভাস্কর বর্ম্মার বংশতালিকা পাঠ করিয়া সদস্যগণকে শুনাইলেন, এবং হস্তি-চিহ্নযুক্ত মুদ্রা সদস্যগণকে দেখাইলেন। সদস্যগণ করতালির দ্বারা প্রবন্ধ লেখককে অভি-নন্দিত করিলেন। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষার উৎপত্তি" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য হইবে কি না বিবেচনার্থ পত্রিকা সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দিনাজপুর হইতে আগত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন, বি, এল মহাশয় নিম্নলিখিতরূপ একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন—

"আজ উপযুক্ত সভাপতির সভাপতিত্বে সভার উৎসব ষোড়শোপচারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এ সভায় আমার কোন কথা বলা শোভা পায় না, তাই আজি আমি ভীত চিত্তে আমার বক্তব্য বলিব। দিনাজপুর হইতে বলিবার জন্য যখন এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তখন কিছু না বলিয়া ফিরিয়া যাইব না। এ সভার উন্নতি করিতে হইলেই যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন। তার সঙ্গে লোকেরও প্রয়োজন। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থায় অর্থাভাবে চিত্ত দমিত; সংসারের চিন্তায় বিব্রত বাঙ্গালীর সবটুকু জাতীয় ভাব বিলুপ্ত প্রায়, ইহা সত্য কথা; কিন্তু এই দারুণ সংঘর্ষের দিনেও বাঙ্গালীকে কিছু করিতেই হইবে। এ পরিষদের কার্য্যে যেরূপ লোকবলের প্রয়োজন, তাহাতে অভাবগ্রস্ত হইলেও সকলেরই যোগদান করা কর্ত্তব্য। ইহা এক জনের কাজ নয়, বা মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা ইহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। যদি সকলেই ইহার জন্য যত্ন করেন, তবে ইহার উন্নতি হইবে। এখানে যে সভা হয়, তাহাতে বৎসরান্তে অনেকে আসেন বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই তাঁহাদের এক বৎসরের মত সাহিত্যচর্চ্চার কার্য্য শেষ হয়। আর তাঁহারা ভুলিয়াও এ সভার দিকে পদার্পণ করেন না। ইহাই কি সহানুভূতি প্রকাশের লক্ষণ? সকলের সমবেত চেষ্টা কি বৎসরান্তে প্রকাশ করিলেই এত বড় বৃহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়? কখনও হয় না।

তাঁহারা কোন প্রকার উৎসাহ কেন প্রদর্শন করেন না, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উভয় পক্ষই বলেন যে, নানা অভাবের মাত্রা অত্যন্ত বেশি, কেমন করিয়া তাঁহারা বাহিরের কার্য্যে যোগদান করেন। তাঁহারা আরও বলেন, "Charity Begins at home" আগে সংসারের অভাব দূর করি, তবে ওসব বিষয় দেখা যাইবে।

তাঁহাদের উক্ত কথার উত্তরে আমি বলিতে চাই ভারতবর্ষ যখন জ্ঞানগরিমায় উদ্ভাসিত ছিল, যখন ভারতের তপোবনে বেদগানের উদাত্তস্বর উত্থিত হইত, তখন সাহিত্য চর্চ্চার ভার একটি শ্রেণীর উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা ইহার উন্নতিকল্পেই ধন, মন,

উৎসর্গ করিতেন। সংসারের সব কাজই কোন দিন সকলের দ্বারা সম্পন্ন হয় না। সংসারীর দ্বারা কখনও সাহিত্যের উন্নতি হয় নাই। এই জন্য সমাজের কর্ম্ম বিভাগ ছিল। যাঁহারা সংসার হইতে দূরে থাকিতেন—তাঁহারাই ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হইতেন। আর অর্থশালিগণ তাঁহাদিগকে অর্থের দ্বারা সাহায্য করিতেন। তাঁহারা তখন জানিতেন "নিরাশ্রয়া ন জীবন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ"। আর এখন যিনি ইতিহাসের চর্চ্চা করেন; আপনারা তাঁহার দ্বারা বাজার সরকারের কার্য্য করান—ইহাতে সাহিত্যের উন্নতি সুদূরপরাহত। আজ যিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তিনি জমিদারগণের আদর্শস্থানীয়। আজ তাঁহার মত বঙ্গদেশের যাবতীয় জমিদারগণ যদি সাধক পুরুষ হয়েন, তবে ইহার উন্নতি দ্রুত হইতে পারে। আমার শ্রদ্ধেয় জমিদার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুও যেমন সাহিত্যের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন; তাহাও সকলেরই অনুকরণীয়।"

বরদাবাবু উপবেশন করিলে আরব জাতির ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সেখ রেয়াজউদ্দীন আহম্মদ বলিলেন—"সভায় এত লোকের সম্মুখে আমার কিছু বলা শোভা পায় না। কিন্তু বরদাবাবু যে প্রস্তাব করিলেন, আমি তাহার সমর্থন করিব মাত্র। বর্ত্তমান সভাপতির ন্যায় দানশীল ভূম্যধিকারী মুসলমান-সমাজে কেহ নাই, তাই বহু জ্ঞানী মুসলমান আপনার শক্তির সম্যক্ পরিচয় দিতে পারিতেছেন না। আমি বহুগ্রন্থ লিখিয়াছি কিন্তু অর্থাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। একখানি গ্রন্থ ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম; তাহার ফলে আজ আমি দরিদ্র। মহামান্য জেলার কালেক্টর বাহাদুর কে, সি, দে মহোদয় যদি সময় মত আমাকে সাহায্য না করিতেন তবে হয়তো এতদিন আমাকে পথে দাঁড়াইতে হইত। কাজ করিতে পারি, ইতিহাস সঙ্কলনে পরিশ্রম করিতে হয় তাহাও করিতে পারি, কিন্তু খাদ্য সংগ্রহ করে কে? সাহিত্য-পরিষৎ যদি এ বিষয়ে দৃষ্টি করেন তবে বহু উপকার হইতে পারে।"

শ্রীযুক্ত সেখ রেয়াজউদ্দীনের বক্তৃতার পর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর বলিলেন—"আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ মাত্র অষ্টম বর্ষীয় শিশু; তবু ইহা যে কার্য্য করিয়াছে, তাহা তাহার শক্তির অনুপাতে যথেষ্টই বলিতে হইবে। এই অল্পসময়ের মধ্যে যে ইহা সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে এরূপ ধারণা করা অন্যায়। তবে এ পরিষৎ সব কার্য্য করিবার জন্য সচেষ্ট আছেন। দরিদ্র গ্রন্থকারদের সাহায্য করিবার ক্ষমতা এখনও ইহার হয় নাই। আজ পরিষদের সাহায্যকল্পে টেপার অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন রায় চৌধুরী মহাশয় দুই সহস্র টাকা দান করিলেন। উক্ত টাকা ব্যাঙ্কে থাকিবে, মূলধন কখনও খরচ হইবে না। সুদ কিরূপ্ ভাবে খরচ হইবে তাহা পরে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নিদ্ধারণ করিবেন। আশা করি এই মহদ্দৃষ্টান্ত রঙ্গপুরের যাবতীয় জমিদারগণই অনুসরণ করিবেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "সভার কার্য্য প্রায় শেষ হইতে চলিল, সভায় নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা হইল, তন্মধ্যে সাহিত্যিকগণের দুর্দ্দশার কথাই সমধিক প্রয়োজনীয়

বলিয়া মনে করি। আশাকরি রঙ্গপুরের জমিদারগণ ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর যাহা বলিলেন তাহার অনুসরণ করিবেন। সভায় দরিদ্র সাহিত্য-সেবিগণের সাহায্য করিবার উপযুক্ত কোন তহবিলের সৃষ্টি হয় নাই কিন্তু একদিনে সব আশা করা যায় না, ক্রমে ক্রমে হইবে। আমাদের এই শাখা অষ্টমবর্ষে যে কার্য্য করিয়াছে মফঃস্বলের মধ্যে এরূপ কার্য্য-তৎপরতা কেহ দেখাইতে পারে নাই। শুধু তাহাই নয়, এই শাখা-পরিষৎ অনেক বিষয়ে মূল পরিষদকেও পরাজিত করিয়াছে। এখানে যে উৎসাহ দেখিলাম তাহা মূল পরিষদেও নাই। মূল পরিষদের কার্য্য যে উৎসাহের সহিত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। আজ আমাকে রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ, পল্লীপরিষৎ অভিনন্দিত করিয়া যে সম্মানিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

তৎপরে যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন, "অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্তির পূর্ব্বে আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে; আমি তাহা শেষ করিতে উঠিলাম। যে মহাপুরুষ আজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, আমি সভ্যদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। মহারাজ বাহাদুর আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। আজ তিনি সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়াও এতক্ষণ ধৈর্য্যের সঙ্গে সভার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রসঙ্গে আমি দিনাজপুরে অনুষ্ঠাতব্য উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। আশা করি উক্ত অধিবেশনে সকলেই যোগদান করিবেন।

তৎপরে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—আমি সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে আগত প্রতিনিধি এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দে
পরবর্ত্তী অধিবেশনের সভাপতি।

সভাপতির অভিভাষণ*

আদিত্যাদপি নিত্যদীপ্তমমৃতপ্রস্যন্দি চন্দ্রাদপি
ত্রৈলোক্যাভরণং মণেরপি তমঃকামং হুতাশাদপি।
বিশ্বালোকি বিলোচনাদপি পরব্রহ্মস্বরূপাদপি
স্বান্তানন্দনমস্তু ধাম জগতস্তোষায় সারস্বতম্॥

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে একদা কথাপ্রসঙ্গে আমার পূজনীয় খুল্লতাত বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এবার উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি আমাকে হইতে হইবে বলিয়া আদেশ প্রচার করিলেন। আমি মনে করিলাম, বিচারপতি হইয়া যখন এত বড় অবিচারের কথা বলিতেছেন, তখন বোধ করি, ইহা তামাসা। সম্বন্ধে খুল্লতাত হইলেও আমাদের মধ্যে বয়সের সমতা থাকায় অনেক সময় নির্দ্দোষ ঠাট্টাতামাসা হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার এ কথাটাও সেই ভাবে গ্রহণ করিয়া আমি তখনকার মত তামাসা করিয়াই উড়াইয়া দিলাম। কিয়দ্দিবস পরে রঙ্গপুর হইতে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের উদ্যমশীল সুবিজ্ঞ স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের পত্রে হঠাৎ একদিন জানিতে পারিলাম যে, নির্ব্বাচন-কমিটির অধিকাংশের মতে আমিই সভাপতির যোগ্য-পাত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছি। পৃথিবীতে অনেক সময় দেখা যায় যে, অদৃষ্ট-দেবতার নিদারুণ পরিহাসের বা অমার্জ্জনীয় ভ্রমের ফলে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি ধনসম্পদ্ ও সম্ভ্রম লাভ করিয়া "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং" প্রভৃতি মহাবাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের ন্যায় বিস্তৃত ভূখণ্ডের সমবেত বিদ্বন্মণ্ডলী ইতিপূর্ব্বে কখনও এরূপ নিদারুণ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন কি না, ইতিহাস সে সম্বন্ধে একান্ত নীরব। বৎসরান্তে একবার সরস্বতীপূজার দিনে পুরোহিত-পঠিত মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়া বাণীপদে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনরূপে তাঁহার কোন প্রকার সেবা করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এরূপ লোককে বিদ্বজ্জনসমাজে উচ্চাসনে বসাইয়া দেওয়ার মত নির্ম্মম পরিহাস আমার সঙ্গে আর কেহ কখন করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না, এবং এজন্য আপনাদিগকে কখনও ক্ষমা করিতে পারিব কি না, তাহা এখনও বলিবার সময় আইসে নাই।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি নিজকে এতই অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে করিয়াছি, তবে আপনাদের আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া এখানে আসিয়াছি কেন? আসিয়াছি, কারণ উত্তরবঙ্গ আমার জন্মভূমি। জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই উত্তরবঙ্গের সূর্য্যালোক আমার নয়নে

---

* পাবনা উত্তর-বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

প্রথম প্রতিফলিত হইয়াছে, উত্তরবঙ্গের ঘনচ্ছায়া-সমন্বিত পল্লী-জননীর শান্ত স্নেহচ্ছবি আমার নয়নের সহিত পৃথিবীর প্রথম পরিচয় করিয়া দিয়াছে। ম্যালেরিয়া-বিষদগ্ধ হইলেও উত্তরবঙ্গের বায়ুই আমার শিশু-শরীরে প্রথম প্রাণ-লক্ষণ আনিয়া দিয়াছে। তাই উত্তরবঙ্গের আহ্বান অবহেলা করিবার সাধ্য আমার নাই। বঙ্গসমাজের যে স্তরে আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, জনরব এই যে, সেই স্তরের কোন ব্যক্তিই বিশেষ ভাবে বাগ্দেবীর চরণচিন্তা করেন না, এবং বিদ্বজ্জনানুষ্ঠিত কোন ব্যাপারে প্রাণের সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছুক নহেন। আরও বিশ্বাস এই যে, দারিদ্র্যের দারুণ কশাঘাত দিবারাত্র যাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া না তুলে, তাহাদের বাণী-মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই। সরস্বতীর শতদল-কাননের শোভাসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া কোন পথ-ভ্রান্ত লক্ষ্মীনন্দন যদি কখনও এ পথে আসিয়া পড়েন, তবে পদ্মবনের পূর্ব্বাধিকারী ষট্পদ-বৃন্দের বিকট ঝঙ্কার ও বিষম হুলতাড়নায় তাঁহাকে অস্থির হইয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে হয়। এরূপ বিপদ্‌সঙ্কুল দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে দুরূহ দুঃসাহসের আবশ্যক। এখানে আজ আমার এই উপস্থিতি আপাতদর্শনে সেই দুঃসাহসের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে স্বীয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের নেতৃত্ব করিতে আসি নাই। যদি বা বাগ্দেবতার চরণনিস্যন্দি-মধুস্বাদে বঞ্চিত হই, তথাপি সারস্বত-কুঞ্জের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া সরস্বতীর চরণাশ্রিত পদ্মবনের দুরবাহী গন্ধে হৃদয়মন পুলকিত করিবার আশায় আসিয়াছি। যে পরম দেবীর চরণ সেবার জন্য আপনারা সম্মিলিত হইয়াছেন, তিনি সন্তুষ্ট হইলে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি-উল্লঙ্ঘনের শক্তি-সমন্বিত হইয়া উঠে, সুতরাং তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ও আপনাদের সমবেত সহানুভূতি আমার সম্বল। স্খলন, পতন, ত্রুটি সংসারের সর্ব্বত্রই আছে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার কৃত ও অকৃত কর্ম্মের অনেক ত্রুটিই লক্ষিত হইবার কথা, সে গুলিকে ক্ষমার চক্ষেই দেখিতে হইবে। কারণ আপনাদের নিয়োগানু-সারেই আমি উপস্থিত হইয়াছি। "বিষবৃক্ষোঽপি সংরোপ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতং" এই নীতিবাক্য আপনাদের ন্যায় সুধীসমাজে অপরিজ্ঞাত নহে।

আমাদিগের দেশে পাল, সেন প্রভৃতি প্রাচীন নরপতিদিগের রাজত্বকালে যখন সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা প্রচলিত ছিল, তখন সেই চর্চ্চা নানা কারণে সার্ব্বজনীন হইতে পারে নাই। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে সেই ভাষা শিক্ষা দিবার প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না, সুতরাং সমাজের স্তরবিশেষের কতিপয়মাত্র লোকে তাহার অনুশীলন করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতে পারিতেন। যদিও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন সার্ব্বজনীন না হউক, তথাপি রাজ-চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সময়ে বাঙ্গলায় সংস্কৃতচর্চ্চার মহাগৌরবের দিন গিয়াছে। এক সময়ে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে যেরূপ সারস্বতকুঞ্জের কলবিহঙ্গগীতি প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইত, আজও যে মধুসঙ্গীতের ক্ষীণ তান পৃথিবীর সাহিত্যরস-পিপাসুদের কর্ণে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে, গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সিংহাসনতলে

বসিয়া ধোয়ী, উমাপতি, জয়দেব, শরণ ও গোবর্দ্ধন প্রভৃতির আনন্দগীতি একদিন তেমনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, মনে হইত, যেন উজ্জয়িনীর নবরত্ন জন্মান্তর লাভ করিয়া পঞ্চরত্ন-রূপে গৌড়ের সিংহাসনচ্ছায়ায় শরণ লইয়াছে। অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেবকৃত পাণিনীয় "ভাষাবৃত্তি" লক্ষ্মণসেনের আজ্ঞায় রচিত। স্মার্ত্তচূড়ামণি হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় বিধিবিধানের বিধাতারূপে বিরাজ করিতেন। লক্ষ্মণসেনের সখা বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের "সদুক্তিকর্ণামৃত" পাঠ করিলে জানা যায় যে, যাঁহাদের নাম করিলাম, এতদ্ব্যতীত আরও বহু কবি ও বিদ্বান্ ব্যক্তি রাজাশ্রয়ে সাহিত্যচর্চ্চায় দিনপাত করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং লক্ষ্মণসেন এবং তদীয় পুত্র কেশবসেনও সুকবি ছিলেন। তাবকাৎ-ই নাসিরি-প্রণেতা মিন্‌হাজ গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনকে হিন্দ্ বা হিন্দুস্থানের খলিফা বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সেই গৌরবের দিন গত হইবার পর সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া আর কেহ তেমন যশোলাভ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিয়া, তাহার সৌন্দর্য্য-সম্ভার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতঃ আনন্দ ভোগ করা ছাড়া সেই দেবভাষায় কাব্যরচনা করিয়া ভক্তকবি জয়দেবের পরে শত শত বৎসরের মধ্যে কোনও বাঙ্গালী গ্রন্থকর্ত্তা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যে ভাষা সাধারণের ভাষা নহে, যে ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে আবশ্যকীয় ভাষা নহে, জন্মমাত্র শিশুর কাণে চতুর্দ্দিক্ হইতে যে ভাষা প্রতিদিন ধ্বনিত হয় না, জননী-হৃদয়ের বিপুলস্নেহ অনর্গল উচ্ছ্বলিত হইয়া অর্থহীন বাক্যরূপে যে ভাষা শিশুর কর্ণে অবিরাম অমৃত-বর্ষণ করে না, সে ভাষা আমাদের প্রাণপ্রকাশের ভাষা নহে, সুতরাং সে ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইবার আশা দুরাশামাত্র। এ কথা একদিন রাজা শিবসিংহের প্রিয় কবি বিদ্যাপতি বুঝিয়াছিলেন, তাই রাজসভায় বসিয়া দ্বিধাহীনচিত্তে নিজের গৃহ-কোণের চিরপরিচিত মৈথিলী ভাষায় "গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী বিহসি পালটি নেহারি" লিখিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডিদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের সুধাসিক্ত পদাবলীগুলি নিত্যব্যবহারের বাঙ্গলা ভাষায় না লিখিলে সেগুলি এমন করিয়া "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিত" কি না সন্দেহ।

গৌড়ে সেন নরপতিদিগের গৌরবময় রাজত্বের তিরোধানের পর মুসলমান-সাম্রাজ্যে বঙ্গভাষার আলোচনা হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। হুসেন সাহের সময়ে নানা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের যুগে বহুল পরিমাণে ভক্তিরসাত্মক পদাবলী ও চরিতেতিহাস রচিত হইয়া ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। তৎপরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবির কাব্য বঙ্গবাসীকে একদিন অপার আনন্দ দিয়াছে এবং ভক্তকবি রামপ্রসাদের ভক্তিপরিপ্লুত 'মা মা' রব তাপদগ্ধ জীবনে মুক্তির অমৃতধারা বর্ষণ করিয়াছে।

জগতের যাবতীয় ব্যাপারই অবস্থা এবং ঘটনার উপর নির্ভর করে, ইহা অস্বীকার

করিবার উপায় নাই। দেশে এমন এক দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন সাহিত্য গঠন করিয়া তাহার মধ্য দিয়া আত্মশক্তির বিকাশ করতঃ জীবনের সাফল্য লাভ করিবার আমাদের সময় ছিল না, বরঞ্চ নানাপ্রকারে আত্মবিনাশের বহুবিধ কারণ আমাদের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নানাদিক্ হইতে আমাদিগকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল। মুসলমান-গৌরব তখন অস্তমিতপ্রায়, এবং পশ্চিম দিক্ হইতে নবোদিত রাজশক্তি তখনও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। আমাদিগের দুর্ভাগ্য দেশ ও দেশের যাবতীয় শক্তিনিচয় এই সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিপদে ক্ষুব্ধ, প্রতিহত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। এ হেন দুঃখদুর্দ্দিনে যখন জাতির অদৃষ্টাকাশ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে, প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, নানাপ্রকারের বাধাবিঘ্নে, ত্রাসে ও বিভীষিকায় আমাদের প্রাণশক্তি ও গতিশক্তি নানাভাবে সংহত হইয়া পড়ে, কোন দিক্ হইতে কোন প্রকারের স্বাধীনতার ক্ষীণতম জ্যোতিঃটুকু আমাদের নয়নানন্দবিধান করে না, তখন সাহিত্যের বিকাশ-আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষামাত্র। বসন্তের বৈতালিক পিকবিহঙ্গ অন্ধকারের আবরণে বা পিঞ্জরের মধ্যে নানাদিক্ হইতে প্রতিহত হইয়া তাহার স্বরলহরীর আনন্দধারায় আমাদের কর্ণে মধুবর্ষণ করিতে পারে না। প্রভাতের অরুণোদয়ের সঙ্গে যখন অন্ধকারের আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়, তখন অবারিত আলোকের আসনে সীমাহীনের আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াই তাহার কলকুজনের বিমলানন্দ আমাদের সুন্দর প্রভাতকে সুমধুর করিয়া তুলে। তেমনি জাতীয় জীবনের অন্ধকার মুহূর্ত্তে কোন প্রকারের শক্তি-বিকাশের সময় হয় না। যখন কোনও কারণে সেই আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়, তখন সে সম্মুখে আশার অনন্তক্ষেত্র উন্মুক্ত দেখিতে পায় এবং তাহার শক্তি পক্ষবিস্তার করিয়া যত উর্দ্ধেই উঠুক, কোন বাধাই তাহার পক্ষকে প্রতিহত করিবে না জানিয়া তাহার মুক্তির অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, এবং সেই অনুভূতির বিমলানন্দ সে নানাপ্রকারে প্রকাশ করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশে ইংরাজ-আবির্ভাবের কিছু দিবস পরে, এদেশের শিক্ষা লইয়া বিশেষভাবে আন্দোলন চলিবার পর দেশীয় লোকের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষায় শুভফল হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া সেই ভাবে শিক্ষা দিবার অনুষ্ঠান করা হয়। বাঙ্গালীর শিক্ষাজগতে সে এক অভূতপূর্ব্ব দিনই গিয়াছে। বহুকালের পরে স্বাধীন উন্নতিশীল দেশের সাহিত্যের নব নব ভাবসমৃদ্ধির সহিত আমাদের তৃষিত আত্মার প্রথম সম্মিলন হওয়ায় আনন্দে আমাদের আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তেজনায় আমাদের মনে একটা মত্ততা আসিয়া অধিকার করিয়াছিল, এবং তাহারই ঝোঁকে আসর জমকাইয়া দিনকতক আমরা মহাসোরগোলে উৎসব করিতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু সে সঙ্গীতের সুর দীপকের ঠাটে বান্ধা এবং রুদ্রতালে তাহার বাজনা সমগ্র দেশকে শব্দায়মান ও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজী পাঠশালার 'রজতগিরিনিভ' গুরুমহাশয়ের স্বহস্তপ্রস্তুত সিদ্ধির প্রসাদ পাইয়া তাহার উন্মাদকর নেশায় তখন আমরা ভরপুর

হইয়া বসিয়াছিলাম এবং তাহারই ঝোঁকে আমরা দেশময় একটা ভূতের কীর্ত্তন সুরু করিয়া তাহার সহিত প্রলয়কালের তাণ্ডব নৃত্যের যোগ করিয়াছিলাম। সে যেন কলিযুগে আবার নূতনভাবে দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আমাদের সনাতন দেবতার পুনরায় অবমাননার উদ্যোগ। সেই প্রলয় তাণ্ডবের ভূমিকম্পে আমাদের দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের আচার-ব্যবহার, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহাকে আর যাহা হয় বল, কিন্তু কোন মতেই আনন্দোৎসব ইহার নামকরণ করা যায় না। যখন সমগ্র দেশ এই দানবোচিত মত্ত-তাণ্ডবে কম্পান্বিত, তখন একদিকে শ্রীরামপুরের কেরীপ্রমুখ পাদরীগণ এবং অপরদিকে দেশবন্ধু রামমোহন বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্য-রচনার একটি ক্ষীণ পথরেখা খুলিয়া দিলেন। ইহা আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সুমহৎ মঙ্গলের প্রথম সূচনা হইলেও গদ্যের এই ক্ষুদ্র পথটি অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের যাত্রীরা কোনও এক আনন্দতীর্থে উত্তীর্ণ হইবার আশা তখন মনে আনিতে পারেন নাই, কারণ অভাবের তাড়নায় এই গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। অন্ধকে দৃষ্টিদান করিবার জন্য, অজ্ঞানের মনে জ্ঞানসঞ্চার করিবার প্রয়োজন বোধ হইতে, ইহার জন্ম। এরূপ মুষ্টিভিক্ষার তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া মানুষের মহোৎসব চলে না। কোন উদ্দেশ্য-সাধন জন্য বা কর্ত্তব্যপালন মানসে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে সচ্ছলতার সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়গণও এই গদ্যের পথ বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অভিলষিত অনুষ্ঠান নহে ; তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায়ানুসারে ফরমাইসমত গদ্য-সাহিত্য-গঠনের অনিচ্ছার উদ্যম। ইংরাজের বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিবার উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন আবশ্যক, তাই পণ্ডিত মহাশয়গণ নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই বাঙ্গলা গদ্য লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; এই কার্য্যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও অভিরুচি ছিল না, বরঞ্চ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিত মহাশয় হইয়া, "বিষয়ী" লোকের ভাষায় গ্রন্থরচনা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্তই লজ্জাকর অপমানের কথা। সংস্কৃত ভাষার সুরম্য হর্ম্ম্য-প্রাঙ্গণে প্রাকৃতের পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিবার পাপ বোধ করি তুষানল-প্রায়শ্চিত্তেও ক্ষালন হইবার নহে, তাই তাঁহারা সেই দুষ্কার্য্যের লজ্জা যথাসম্ভব ঢাকিবার জন্য সংস্কৃতের সুদীর্ঘ সমাসখচিত অবগুণ্ঠনে আমাদের সরলা পল্লীবধূটির ললাট, চিবুক, এমন কি বক্ষ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই।

গদ্যের এই গলিপথের মধ্য দিয়া আমরা তখনও কোন মুক্তির গম্যস্থানের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই ; ইহার এক প্রান্ত সংস্কৃত টোলে ও অপরপ্রান্ত ইংরাজী স্কুলে গিয়া ঠেকিয়াছিল। যাহা হউক, পাঠশালা নামক পদার্থটির অজস্র নিন্দা করিলে চলিবে না, বর্ত্তমান সজ্জনসঙ্ঘে আমার ন্যায় দুই একজন মাত্র থাকিতে পারেন, যাহারা পাঠশালার স্তুতিনিন্দা উভয়েরই অনধিকারী ; কিন্তু অধিকসংখ্যক সাধু সুধীই উহার যথেষ্ট উপকারিতা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। কিন্তু পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মুখচ্ছবি নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় আনন্দই দান করে, প্রাণপাত করিয়াও এতবড় একটা মিথ্যাকথার অবতারণা করিতে পারিতেছি না।

মানস-সরোবরের দুর্গম তটদেশে যে নিবিড় শরবন আছে, গুরুমহাশয় সেই শরবনের ব্যাঘ্র-বিশেষ, যদি বা নিতান্তই তাহা না হন, তিনি পদ্মবনের গুঞ্জনশীল মত্ত মধুব্রত নহেন, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। এইজন্য প্রায় শতাব্দী কাল পূর্ব্বে আমাদের গদ্য-সাহিত্য যখন পাঠশালার সাহিত্য ছিল, যখন সেখানে বীণাপাণী সরস্বতীর আসন বেত্রপাণি গুরুমহাশয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন দেশে সাহিত্যরস-পিপাসুদের আনন্দ-গুঞ্জন জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের গদ্য-সাহিত্য ছাত্র-শিক্ষার সাহিত্যই ছিল, উহা দ্বারা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার কোন উদ্যম কেহই করিতেন না। সেকালে যিনি যাহা লিখিতেন, মুগ্ধবোধকারের ন্যায় তিনি বলিতেন, "পরোপকৃতয়ে ময়া"; যাঁহারা অজ্ঞানমুগ্ধ তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহারা বই লিখিতেন, কিন্তু যাঁহাদের বোধ আছে, তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রতি ঐ সকল গ্রন্থকারের কোন লক্ষ্যই ছিল না।

এইরূপ সাহিত্যের ভিক্ষাদান ও গ্রহণের দ্বারা কেবল দেশব্যাপী দৈন্যকেই লোকচক্ষুর সম্মুখে সপ্রমাণ করা হয়। ইহা কোন প্রকার ভাবসমৃদ্ধির বিকাশ করিয়া সাহিত্যের মধ্যে উৎসবের সানাই বাজিয়া উঠিবার অবসরই দেয় না। সেকালের কৃতবিদ্য লোকদিগের মধ্যে এ ধারণাও ছিল যে, দৈন্যপীড়িতা ক্ষীণকলেবরা বঙ্গভাষার কোন শক্তি-সামর্থ্যই নাই, ইহার সাহায্যে মানব-মনের কুসুমোপম ভাব-সৌন্দর্য্যের যথাযথ বিকাশ বাতুলের নিষ্ফল প্রয়াস অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর। এই মনোভাবের সাক্ষিস্বরূপ "The Captive Lady", "Raj-mohan's wife" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নের হাস্যজনক উদ্যমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্গভাষা ও বঙ্গবাসীর শুভাদৃষ্টের ফলে প্রতিভাবান্ বঙ্গসন্তানের মনে এ ধারণা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই; হইলে কি হইত, তাহা ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প হয়। আজ প্রায় অৰ্দ্ধ শতাব্দীর কথা—ইংলণ্ডের তদানীন্তন যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষে বাঙ্গলার লক্ষ্মীর দুলাল, সরস্বতীর দাস যাঁহারা ছিলেন, সকলে মিলিয়া নাট্যাভিনয়ে যুবরাজের মনোরঞ্জনের অনুষ্ঠান করিবার জন্য অভিনয়োপযোগী নাটকের কি অভাবই অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারাই জানিতেন। অগত্যা কুলীনকুমারীর দুর্দ্দশার চিত্র দেখাইয়া সে যাত্রা কোন মতে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অভিনয়কে উপলক্ষ করিয়াই "শর্ম্মিষ্ঠা", "কৃষ্ণ-কুমারী" প্রভৃতির জন্ম হয়। পরে একদিন মেঘনাদের জীমূতনাদে বঙ্গবাসী চকিত হইয়া উঠে এবং মোহনিদ্রার অবসানে বুঝিতে পারে যে, চির উপেক্ষিতা বঙ্গভাষার শক্তিসামর্থ্য কতদূর, এবং প্রতিভাবানের নিকট উপাদানের দৈন্য অভাবের মধ্যেই গণ্য নহে।

বঙ্গভাষার প্রাচীন কাব্যের পুরাতন ঝঙ্কার শুনিয়া যাঁহাদের কাণ চির অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই মধুসূদনের "মেঘনাদ" রচনার উদ্যমকে দুরাশার দুঃসাহস বলিয়া উপহাস করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কিন্তু শুভ্র শতদলবাসিনীর শুভাশীর্ব্বাদে সফলমনোরথ মধুসূদন যে দিন কাব্যজগতে যুগান্তর আনিয়া দিলেন, বঙ্গসাহিত্য-ইতিহাসের

সে এক স্মরণীয় দিন। অভিনব ছন্দে কাব্যরচনায় সাফল্য লাভ করিয়া কেবল তিনিই যে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, চিরাভ্যস্ত সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি বঙ্গবাসীকে সুপ্রশস্ত মুক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার অন্ধকারময় কবি-নিকুঞ্জে মধুসূদন যে প্রথম ঊষার অরুণ-রশ্মিসম্পাত আনিয়া দিয়াছিলেন, সেই আনন্দময় মঙ্গলালোকে চতুর্দ্দিক্ হইতে কলকণ্ঠ বিহঙ্গনিচয়ের আনন্দকূজনে নিস্তব্ধ বনবীথিকা মধুচ্ছন্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এমন সময় বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ আবির্ভাব হইল। "চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ" দেশের হৃদয় তখন কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া স্তম্ভিত অবস্থায় ছিল। সমুদ্রের বিশাল বারিরাশি যেমন চন্দ্রকর-স্পর্শে দেখিতে দেখিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সমগ্র দেশের হৃদয়স্থ আশা-ভরসা আজ আনন্দে উল্লাসিত হইয়া উঠিল। যেখানে যে শূন্য দৈন্য যাহা কিছু ছিল, সব পরিপূর্ণ হইয়া গেল; যেখানে স্তব্ধতা, সেখানে নৃত্য, যেখানে নিঃশব্দতা, সেখানে সঙ্গীত জাগিয়া উঠিল; পাঠশালার শুষ্ক সৈকত কোটালের বানে ভাসিয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের মহা-সমরশায়ী পিতামহের দারুণ পিপাসাশান্তির জন্য অর্জ্জুন যেমন বাহুবলনিক্ষিপ্ত শরাঘাতে পাতালস্থ ভোগবতীর নির্ম্মলধারা আনিয়া দিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের আনীত সাহিত্য-মন্দাকিনীর পূত ধারায় সমগ্র দেশের অতৃপ্ত সাহিত্যরসপিপাসা এক নিমেষে সেইরূপ তৃপ্তি লাভ করিল। এমন হইল কেন? কারণ 'বঙ্গদর্শন' তখন যথার্থই বঙ্গদর্শনরূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশ তখন আপন সাহিত্যের মধ্য দিয়া আপনাকে দেখিতে পাইল; এবং আত্মদর্শন করিল বলিয়াই তাহার এই আনন্দ। এতকাল পরের লেখার উপর "মক্স" করিয়া কেবল পরকেই চোখের সামনে রাখিয়াছিল, আজ নিজের আনন্দ-প্রকাশের পথ উন্মুক্ত দেখিয়া, এক মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ের বন্ধনদশা ঘুচিয়া গেল।

আমাদের মধ্যে হয় ত অনেকে ভাবেন যে, যাহা কিছু পুরাতন, যাহা কিছু সাবেক, তাহাই কেবল দেশের জিনিষ। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ আমাদের দেশের পুরাতন পদার্থ। উত্তরকালে যাহা কিছু হইবে, তাহা যদি কৃত্তিবাসী বা কবিকঙ্কণী ছন্দে না হয়, কিম্বা তাহার মধ্যে যদি আমাদের আধুনিক শিক্ষার কোন প্রবর্ত্তনা দেখা যায়, তবে তাহা দেশের জিনিষ হইল না। তাহাকে বিদেশী আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত, এবং তাহা দ্বারা আমাদের আত্মপরিচয়ের খর্ব্বতা ঘটে। জড়বস্তু সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে বটে, কারণ যাহা তাহার পূর্ব্বের পরিচয়, তাহার উত্তর পরিচয়ও তাহাই; কিন্তু প্রাণবান্ পদার্থের যথার্থ পরিচয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেই প্রকাশ পায়। আমাদের কাব্য সাহিত্য যদি আবহমান কাল কেবল কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণের পুরাতন বুলিই পুনঃ পুনঃ আওড়াইত, তবে তদ্দ্বারা আমরা প্রাণহীন কলের পুত্তলিকারই পরিচয় পাইতাম, সাহিত্যের সজীব সত্তার পরিচয়ে কখনই নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম না। ইংরাজী সাহিত্যের যখন যেখানে আমাদের প্রাণপুরুষ বাস করে, তখন সে প্রাণপুরুষ জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই জাগরণ জানিলাম কিসে? দেখিলাম

ইংরাজীর সাহিত্যরসকে সে আপনার করিয়া লইয়াছে। নির্জীবের সহিত বাহিরের পদার্থ সংযোগ করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু এক করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। জীবিত মনুষ্যই বাহির হইতে খাদ্যরস গ্রহণ করিয়া তাহার শরীরের পুষ্টি বিধান করিতে সমর্থ হয়; মৃতের পার্শ্বে নানাবিধ সুস্বাদু পুষ্টিকর আহারীয় রাখিয়া যুগ-যুগান্ত অপেক্ষা করিলেও সঞ্জীবনক্রিয়া দেখিবার আশা করা যায় কি? এই গ্রহণ-ক্ষমতাই আমাদের প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়, ইহা দ্বারাই আমাদের রসভোগের তৃপ্তি হয় এবং ইহা দ্বারাই আমাদের প্রাণশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া আত্মপরিচয়ের সহায়তা করে। যতদিন ইংরাজি সাহিত্যকে পাঠশালার ছাত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতেছিলাম, যতদিন তাহার সত্তাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতঃ নিজের করিয়া লইতে পারি নাই, ততদিন নিজের প্রাণশক্তির অনুভব করিতে পারি নাই। বাহির হইতে এই সাহিত্যের রসধারা নিজের অন্তরের গভীর তলে সঞ্চিত হইয়া উৎস আকারে যথন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তথন নিজের অন্তরের সেই প্রাণবান্ বেগটিকে অনুভব করিতে পারিলাম। সেই জ্ঞানই আমাদের যথার্থ আত্মপরিচয়ের জ্ঞান। প্রাচীন বাণীর প্রতিধ্বনিকে যদি চিরদিন বিস্তার করিয়া আবৃত্তি করিয়া চলিতাম, তবে নিজের সজীব সত্তার পরিচয় তাহাতে পাইতাম না। সকলেই জানেন, ইটালীতে একদিন যথন নবসঞ্জীবন-বেগ (Renaissance) আইসে, এলিজাবেথের রাজত্বকালের ইংলণ্ডও সেই বেগের আঘাতে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন ইংরাজী সাহিত্যেও নবজাগরণের আবির্ভাব হয়। এরূপ না হইলে ইংলণ্ডের প্রাণশক্তির পরিচয় আমরা পাইতাম না। সেক্সপিয়ার যদি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেথক চসর প্রভৃতির অবিকল পুনরাবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতেন, তাহা হইলে গুণিগণগণনায় আজ তাঁহার নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইত কি না সন্দেহ। তিনি তদানীন্তন ইতালীর সাহিত্য হইতে তাঁহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি খাঁটি ইংরাজী কবি নহেন, এ কথা বলিবার সাহস কি কাহারও হয়? দেশ দেশান্তর হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে তাহাতে লেথকের কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভারবাহীর স্কন্ধে ঝাঁকার মধ্যে যে উপকরণ থাকে, তাহা তাহার দৈন্যেরই পরিচয় দেয়, কিন্তু সেইগুলিই আবার ধনীর গৃহসজ্জায় নিয়োজিত হইয়া তাহার সমৃদ্ধিরই সাক্ষ্য দান করে। উপকরণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলাম তাহা লইয়া বিচার করিলে চলিবে না; সেই উপকরণগুলিকে আপনার করিতে পারিয়াছি কি না, তাহাই দেখিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিলেন, তাহার মধ্যে স্কটের প্রভাব কতথানি মুখ্যভাবে আলোচনার বিষয় নহে। কাদম্বরী, বাসবদত্তা বা দশকুমারচরিতের ছাঁদে বঙ্কিমের পুস্তক রচিত হইলে সাঁচ্চা ভারতবর্ষের পরিচয় দিত কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের প্রাণশক্তির কোন পরিচয় পাইতাম না। যদি দেখিতাম ইউরোপের জীবনবেগের অভিঘাতে ভারতবর্ষ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই, আঘাতের পর আঘাত

বাহির হইতে আসিতেছে, কিন্তু ভিতর হইতে তাহার কোন জবাবই নাই, তাহা হইলে বুঝিতাম, আমরা নিঃশেষে ও নিরুপায়ভাবে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছি। সে মৃত্যুর পরিচয় ত আনন্দের পরিচয় নহে।

ইউরোপীয় সাহিত্যের উপন্যাস পাঠ করিয়া বঙ্কিমের কল্পনাশক্তি যে তাহার রস ও ছাঁদকে আপন করিয়া গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছে, ইহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি। বাহিরের উপকরণকে আত্মসাৎ করার দ্বারাই তিনি আপনার প্রাণ-শক্তিকে উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ। ইউরোপীয় সাহিত্যে যে প্রাণের স্পন্দন আছে, তাহার সুললিত ছন্দে আমাদের সাহিত্যও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভা যখন এই বার্ত্তা ঘোষণা করিল, তখনই বঙ্গসাহিত্য-লক্ষ্মীর উটজপ্রাঙ্গণে আনন্দময় মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

তাহার পর হইতে আমরা দেখিতেছি, সাহিত্যেই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। আর সকল দিকেই দেশের শক্তি নানা প্রকারে প্রতিহত হইতে পারে, সাহিত্যেই বাঙ্গালী তাহার প্রকাশের পথকে উত্তরোত্তর কেবল উদ্ঘাটিত করিয়া তুলিয়াছে। এইখানে তাহার জাতীয় জীবনে এমন একটি বাতায়ন খুলিয়া গিয়াছে, যেখানে তাহার আশার অন্ত নাই, যে বাতায়নের ছিদ্রপথ দিয়া সে সীমাহীনের দর্শনলাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

সাহিত্যের নবোদ্ঘাটিত পথে আমাদের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইবে, সুতরাং সেই পথই আমাদের গৌরবের পথ। বাঙ্গলার সাহিত্যের দ্বারাই আমাদের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠিবে, সেই জন্যই তাহারই তোরণদ্বারে আমাদের পূর্ণ মঙ্গল-কলস স্থাপিত হইয়াছে; এবং এই সাহিত্যই আমাদিগের সকল দৈন্য দূর করিয়া মনুষ্যলোকে আমাদের যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবে বলিয়াই আমরা তাহারই দ্বারে নহবৎ বসাইয়াছি। এই যে আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের উৎসবকে আমরা বর্ষে বর্ষে বাঙ্গলার প্রদেশে প্রদেশে বহন করিয়া বেড়াইতেছি, ইহার মত সত্যকার উৎসব আমাদের আর নাই; ইহা আমাদের আশা ও আমাদের উৎসব; এইখানেই আমাদের বর্ত্তমানকালের আনন্দবেগ সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া অনন্ত ভবিষ্যৎকে পুণ্যধারায় অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে।

যে সাহিত্যের উপর আমাদের সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছি, যাহার পুণ্য প্রভাব আমাদিগকে মুক্তির বাঞ্ছিত ফল দান করিয়া সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ করিবে, সেই শিশু-সাহিত্যের লালনভার এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ছিল; এবং বঙ্কিমের প্রতিভা তাহাকে শৈশব উত্তীর্ণ করাইয়া কৈশোরের সুখময় বয়ঃসন্ধিতে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। এই পুষ্টিবিধান করিতে তাঁহাকে দেশান্তরের ভাবসমৃদ্ধি নিজের মধ্যে কেমন করিয়া পরিপাক করিয়া আপনার করিয়া লইতে হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি দেশের দিকে দেশের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাহাকে একেবারে বন্ধনমুক্ত

করিতে পারেন নাই। ধনীগৃহের কোন বালককে শিক্ষকের শাসনের অধীনে সর্ব্বতোভাবে আবিষ্ট হইয়া, দীর্ঘকাল কাটাইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও তাহার সেই বাল্যের গুরুমহাশয়ের শাসন-গণ্ডীর একেবারে বাহিরে আসিতে সময় লাগে। সে যেমন দীর্ঘকাল মনে মনে সেই শিক্ষক মহাশয়ের প্রভাবের দ্বারায় অভিভূতই থাকে, আমাদের কিশোর-সাহিত্যেরও অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় গিয়াছে। বাল্যকাল হইতে যে পাঠশালায় পড়িয়াছি, তাহার গুরুমহাশয়ের প্রভাব আমাদের মন হইতে তখনও দূরীভূত হয় নাই। স্তুতি-নিন্দার জন্য তখনও আমাদিগকে পশ্চিমাভিমুখী হইয়াই থাকিতে হইত। তখনও আমরা মিল্, বেন্থাম, কোঁত, (কোম্ত্) মিলটন্, বাইরণ, স্কটের মধ্য দিয়া জগতের সমস্ত পদার্থ দেখিতাম; কারণে অকারণে যদি কখনও আমাদের পাশ্চাত্য গুরুর প্রতি তীব্র কটাক্ষও করিয়াছি, তথাপি সেই ঔদ্ধত্যের দ্বারা আমাদের হৃদয়ের বন্ধনদশাই সূচিত হইয়াছে। রাগ এবং দ্বেষ উভয়ের দ্বারাই আমরা পুনঃ পুনঃ সপ্রমাণ করিতাম যে, তখনও আমাদের মুক্তি ঘটে নাই, গুরুতর প্রভাব আমাদের উপর যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। এমন কি স্বদেশের কোন গুণী ব্যক্তিকে প্রশংসা করিতে হইলেও আমরা তাঁহার বিলাতি নামকরণ করিতাম। যথা বাঙ্গলার মিল্টন্, বাঙ্গলার বাইরণ, বাঙ্গলার গ্যারিক, বাঙ্গালার স্কট্। আমরা দেশানুরক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম সত্য, কিন্তু ঐ দেশানুরাগ জিনিষটাই বিদেশের রচনা। তাই আমাদের কাণ বাইরণের "Isles of Greece" এর তানের প্রতি অবহিত ছিল, তাই আমাদের স্বদেশপ্রেমের গান আমরা খাঁটি স্বদেশী সুরে তখনও গাইতে পারি নাই। এই জন্য তখনকার সাহিত্যের মূলদেশ আমাদের দেশের মাটীর সহিত সংলগ্ন ছিল না, সে যেন "অরকিডের" মত আর এক গাছে উচ্চ শাখায় ঝুলিতে-ছিল। সে সাহিত্য যে প্রাণবান্ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার প্রাণরস অন্যদেশের সাহিত্য হইতে সঞ্চারিত হইত। তাই তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে আমাদিগকে রূপনগরের মরুপ্রান্তরে যাইতে হইত; কিম্বা অম্বরের রাজকুমারের সহিত আফগানিস্থানের পর্ব্বতবাসিনী পার্ব্বতীর প্রণয় ঘটাইবার জন্য উভয়কেই বাঙ্গলার বিষ্ণুপুরে আনিবার প্রয়োজন হইত; দুরন্ত ঝড়জল মাথায় করিয়া তিলোত্তমার দূতীকে শৈলেশ্বরের প্রতি অকারণ ভক্তি দেখাইবার জন্য অসময়ে রাজপথ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে হইত।

যাহাই হউক, এ সমস্ত আয়োজন বৃথা হয় নাই। যে পুষ্টিসাধনের জন্য এই সব আহার্য্যের আহরণ, তাহা সার্থক হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নানাবিধ ভোজ্য দিয়া আমাদের শিশুসাহিত্যে রসরক্তের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন—তাহাকে শৈশব পার করিয়া কৈশোরে আনিয়া খাড়া করিয়াছেন। আর এখন তাহার যৌবন সমুপস্থিত। এখন আর সে অন্তঃপুরের গণ্ডীর মধ্যে ধাত্রীর অঞ্চলতলে নিজকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তাহার যৌবনের উদগ্রতেজে সে এখন বিশ্বের সম্মুখে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যৌবনোচিত পৌরুষের বলে সে আপনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া মুক্তির উৎকট আনন্দ শর্ত

প্রকারে সহস্রদিকে প্রকাশ করিবার পথ অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কৈশোরের পরে যৌবন স্বভাবতঃই আইসে। এই আনন্দময় যৌবনসমাগমের বার্ত্তা যাহার দৈব-প্রতিভা সর্ব্বপ্রথমে ঘোষণা করিয়াছে, সেই কবিকুলচূড়া রবীন্দ্রনাথের নিকট বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য অপরিশোধ্য ঋণজালে শতপ্রকারে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ কেবল বঙ্গসাহিত্যে বসন্তসমাগমের সূচনা ও ঘোষণা করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, সাহিত্যকুঞ্জের প্রত্যেক বৃক্ষের ও ব্রততীর কুসুমকলিকা তাহার সমগ্র সৌন্দর্য্যসম্ভার লইয়া যাহাতে পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে, তৎপ্রতি তাঁহার আলস্যহীন উদ্যমকে চিরউদ্যত করিয়া রাখিয়াছেন। কৈশোরসাহিত্যের আসন্ন-যৌবন অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাহার সময়োচিত বেশভূষা প্রস্তুতের অনুষ্ঠানে তিনি একদিনের জন্যও উদাসীন হন নাই, এবং তাহার ভবিষ্যৎ গৌরব অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার মানসখনিপ্রসূত মহার্ঘ রত্নরাজি-খচিত কিরীট, কুণ্ডল, কেয়ূর প্রভৃতি দিব্যাভরণে তাহার সর্ব্বাবয়ব সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যের এই সাজসজ্জা করিতে রবীন্দ্রনাথের যাদুকরী কল্পনাকে বিদেশ হইতে বিভিন্ন জাতীয় সাহিত্যের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হয় নাই। তিনি জানিতেন ঋণকরা রাজবেশ পরাইয়া কাহাকেও রাজমর্য্যাদা দেওয়া যায় না। তাহার নিজের রত্নভাণ্ডার হইতে যে অলঙ্কারের সংগ্রহ হইবে, তাহাই তাহার নিজস্ব সম্পত্তি; সেই সম্পত্তির বিকাশই তাহার আত্মশক্তির যথার্থ বিকাশ এবং তদ্দারাই তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অলোকসামান্য কল্পনার প্রভাবে এবং দৈবশক্তির বলে আমাদের বাঙ্গলা দেশের অরণ্যকান্তারে, সাগরভূধরে, ঘনচ্ছায়াসমন্বিত পল্লীচিত্রে এবং পল্লীজীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখের মধ্যে যেখানে যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তাহাই আহরণ করিয়া রাজ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশের ঘনপল্লবিত আম্রকুঞ্জের পত্রান্তরালে বসন্ত-বৈতালিকের কুহুস্বর, রৌদ্রদীপ্ত বৈশাখের তপঃক্লিষ্ট উগ্র তাপসমূর্ত্তি, হেমন্তের রৌদ্রপীত-হিরণ্য-অঞ্চলাচ্ছাদিত উদাসীন বসুন্ধরার সৌম্যমুখচ্ছবি, পল্লীনিবাসের মূক বালিকা সুভা-ষিণীর মর্ম্মান্তিক হৃদয়বেদনা, কিছুই তাঁহার কবিহৃদয়ে অনুভূতির বহির্ভূত নহে। সুর-সভাতলে নৃত্যপরায়ণা উর্ব্বশীর নৃত্যচ্ছন্দের তালে তালে সাগরের তরঙ্গভঙ্গ কেমন করিয়া নাচিয়া উঠে এবং শস্যশীর্ষে ধরার অঞ্চল কেমন করিয়া কম্পিত হয়, কবির অলৌকিক কল্পনা আমাদিগকে তাহা প্রত্যক্ষবৎ দেখাইয়া দিয়াছে। প্রকৃতির স্বহস্তলালিত অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন অমর কবি আজীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গসাহিত্যকে এমনই সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন যে, আজ তাহাকে লইয়া দশের মধ্যে গৌরব করিতে আমাদের আর কোন সঙ্কোচের কারণ নাই। সাহিত্যের যে কোন অংশে রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক পড়িয়াছে, তাহাই সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ঐকান্তিক দেশনিষ্ঠা তাঁহার নানাবিধ রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর স্বদেশবৎসলতা শতগুণে বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার পরম-

রমণীয় কাব্যসৌন্দর্য্য দেশের সমগ্র কবিসম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। ফলতঃ বর্ত্তমানে দেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহারই মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, যেভাবেই হউক, দেখিতে পাইবই, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অলৌকিক প্রতিভা ও দৈবশক্তির কার্য্যই এই। দেশকাল-নির্ব্বিশেষে এইরূপই হইয়া থাকে এবং ইহাই স্বাভাবিক। অতিমানুষপ্রতিভা স্বদেশের গতি নিয়মিত করিবে ইহা খুব বড় কথা নহে, কিন্তু যদি কাহারও প্রতিভা বিশ্বমানবের চিরন্তন বাঞ্ছিত ধনকে স্বীয় সঙ্গীতের মধ্যে জাজ্বল্যমান করিয়া চিরতৃষ্ণাতুর বিশ্বের উপভোগের জন্য উপস্থিত করিতে পারে, সেই ধন্য, তাহার দেশ ধন্য, তাহার দেশবাসী ধন্য! আজ প্রভূত আনন্দে আমরা প্রকাশ করিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের দৈবপ্রতিভা বিশ্বমানবের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে এবং বঙ্গসারস্বতকুঞ্জের প্রস্ফুট পারিজাত-সৌরভ পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে ধ্রুবসঙ্গীত শুনিবার জন্য যুগযুগান্ত বিশ্বমানব উৎকর্ণ, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আজ সেই সুর বাজিয়া উঠিয়াছে; যে সত্যের অনুসন্ধান কি করিয়া পাওয়া যায়, না জানিয়া সুদীর্ঘ-কাল মানব যাহার বৃথা অন্বেষণে ব্যস্ত, সেই দুর্ল্লভ সত্য রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল প্রতিভার আলোকে আজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। যে কথা বলিবার জন্য চিরদিন বিশ্ব ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে, অথচ কেমন করিয়া বলিবে জানে না, আমাদের বাঙ্গলাদেশের দৈব-প্রতিভাসম্পন্ন ঋষি রবীন্দ্রনাথের অস্খলিত বাণী আজ তাহা অভ্রান্তভাবে ঘোষণা করিয়াছে।

বঙ্গসরস্বতীর পদ্মসরোবর রবিরশ্মিপাতে হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্গের বিহঙ্গকুল জাগ্রত হইয়া কুঞ্জে নিকুঞ্জে শুভ সংবাদ ঘোষণা করুক, আর সাহিত্যের যে সিন্দুরচন্দনাঙ্কিত পাদপীঠ রচিত হইয়াছে, বঙ্গলক্ষ্মীর হাস্যসমুজ্জ্বলা কল্যাণচ্ছবি চিরন্তনী হইয়া সেইখানে বিরাজ করুক। যেখানে আমাদের গৌরব, সেইখানেই আমাদের দায়িত্ব সমধিক, এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। যেখানে সিদ্ধি দেখা দিয়াছে, সেইখানেই সাধনাকে চিরজাগ্রত রাখিতে হইবে। যেখানে আমরা বিধাতার বরে সত্য সামগ্রী পাইয়াছি, সেখানে কোন প্রকারের শৈথিল্যই ক্ষমার্হ নহে, ইহা যেন আমাদের মনে থাকে। দেশের নব্যকবিসম্প্রদায় আজকাল তাঁহাদের কবিতায় বাঙ্গলা দেশের ছবি আঁকিতেছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, বাঙ্গলাদেশ বাঙ্গালী কবির চিত্তকে কিরূপ অবহিতভাবে স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু এইখানেই কর্ত্তব্যের শেষ নহে। বঙ্গদেশের চিত্তের মধ্য দিয়া যেখানে ভাগ্যদেবতা আমাদের সমস্ত সুখ-দুঃখ মান-অপমানের ভিতরে ভবিতব্যতাকে সৃজন করিয়া তুলিতেছেন, সেইখানে কবির দৃষ্টি প্রবেশ করাইতে হইবে এবং কেবল বর্ত্তমানের কোন বাহ্য ছবি নহে, দেশের চিরন্তন সত্যকে তাঁহাদের সঙ্গীতের মধ্যে ধ্বনিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে যাহা পাইয়াছি তাহা থাকিবে; নচেৎ বর্ত্তমান গৌরব বিলয়-ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুৎরেখার ন্যায় চকিতে বিলীন হইয়া যাইবে। অতএব তাঁহাদের চিত্ত উদার হউক, দৃষ্টি দূরগামিনী হউক, চিন্তা অবরোধমুক্ত হউক এবং বাক্য সত্য হউক, তবেই বাঙ্গলার বাণী বিশ্বের

বাণী হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে; এবং তাঁহারাও যুগপ্রবর্ত্তক আদর্শ সাহিত্যিক কবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন; নচেৎ দুর্ব্বল অনুকরণ অকালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

আজ আনন্দের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যেথানে অন্তর্গূঢ়রসে কাব্য-বসন্তের কল্পবৃক্ষ আপনিই পূর্ণ হইয়া উঠে, সেইখান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়াই আমাদের দিন কাটিতেছে না। যে সকল তপোলভ্য অমৃতফলের জন্য দুষ্কর তপস্যা করিতে হয়, তাহার তাপসেরাও উদাসীন হইয়া বসিয়া নাই। এমন একদিন ছিল, যখন আমরা আমাদের পাশ্চাত্য গুরুর নিকট হইতে দেশের সম্বন্ধে পুরস্কার বা তিরস্কার যাহাই লাভ করিয়াছি, তাহাই দ্বিধাবিহীন চিত্তে অঞ্জলি ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছি; বিচার করি নাই, বিবেচনা করি নাই, সমস্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। সুকুমার সাহিত্য সম্বন্ধে যে বন্ধন-দশার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইতিহাস-ক্ষেত্রেও সে বন্ধন আমাদিগকে সম্পূর্ণ বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু একদিন, এক শুভ প্রভাতে দেখিলাম, বাঙ্গলা দেশের সিরাজদ্দৌলার সময়ের ইতিহাসে এক নবীন আকারে বাঙ্গলা ভাব বাহির হইয়াছে; দেখিয়া আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিল। অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতখানি ছিল বা ছিল না, সেকথার বিচার তখন মনে আইসে নাই। তিনি যে সাহসপূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্যের পতাকা হস্তে লইয়া দেশকে অনুসরণ করিতে ডাকিতেছেন, ইহাই যথেষ্ট। ইহার মধ্যে যে যৌবনোচিত পৌরুষ ছিল, যে আত্মশক্তির উপর শ্রদ্ধা প্রকাশ ছিল, উহাই দেশের পক্ষে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। এতদিন আমরা দেশের বিষয়ে মুখের কথায় গৌরব করিব, কিন্তু সেই গৌরব করিবার অধিকার যে তপস্যার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে তাহাতে পরাঙ্মুখ রহিব, এই অসত্য আমাদিগকে বহুকাল ধরিয়া লোকসমাজে লাঞ্ছিত করিয়াছে; সেই লাঞ্ছনা যাঁহারা দূর করিয়াছেন, আপনার শক্তির প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাইয়াছেন, অনুসন্ধানের পথ পুস্তকের মধ্যে নিহিত নহে, উহা দেশের অরণ্যে, কান্তারে, ভূগর্ভে নানাশাখায় নানাদিকে প্রসারিত, সেই পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, অদ্যকার সাহিত্য-সম্মিলন-সভায় আমরা তাঁহাদের জয় কীর্ত্তন করি। সত্য চেষ্টা দ্বারাই সত্য ফল লাভ করা যায়। সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায়-প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিপ্রমুখ সভাসমিতির সমবেত চেষ্টায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেশের সত্য ইতিহাস যাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, যে অতীত গৌরবের চিত্র আমাদের সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া দিয়াছে, তাহা আর কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে, মিথ্যার আবরণ শত চেষ্টা করিয়াও আর তাহা আবৃত করিতে পারিবে না।

ভ্রমপ্রমাদশূন্য ইতিহাস হয় কি না বলা কঠিন। যে সমস্ত ঘটনা চক্ষের উপর ঘটিতেছে, তাহাই বর্ণনা করিতে বসিলে লেখকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যাইবার সর্ব্বদাই সম্ভাবনা থাকে। তাহার উপর যেখানে জেতাজিত সম্বন্ধ আছে, সে স্থলে কল্পিত কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। আত্মদোষ গোপনের

চেষ্টা মানবমনের একরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম, শত্রুর গুণকথন ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও সে বিষয়ে উৎসাহ জগতে দুর্লভ। এরূপ স্থলে পুরাতন দেশের প্রাচীন ইতিহাস সত্যমূলক করিবার একমাত্র উপায়—পুরাতন দেশের ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি, শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতির আবিষ্কার ও রক্ষা এবং সেই সব উপাদানের সাহায্যে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাসের রচনা। দেশের যে সকল সুসন্তান এই পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া নানা ক্লেশ ও বিবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়া দেশের চিরন্তন অভাব মোচন করিয়াছেন ও বাঙ্গালীর ললাট হইতে দুরপনেয় চিরকলঙ্ক মুছাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা যথার্থই বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম ভক্তিভাজন। বরেন্দ্রের বনে প্রান্তরে, ভূগর্ভে ভূধরে, যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি, শিলালিপি ও তাম্রফলকে অনুশাসন অনুসন্ধান করতঃ বাহির করিয়া রাজসাহীর কলা-ভবনে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে যথার্থই আশ্চর্য্য হইতে হয়। এলোরা, অজন্তা, সাঁচি ও সারনাথের মূর্ত্তিগুলি যাঁহারা দেখিয়াছেন, অনুসন্ধান-সমিতির সংগৃহীত বাঙ্গালী ভাস্কর ধীমানের গঠিত মূর্ত্তির সহিত তুলনায় সেগুলি সৌন্দর্য্যে হীন বলিয়াই অনুমিত হইবে। এই দেশহিতকর মঙ্গলময় দুঃসাধ্য কর্ম্ম যাঁহাদের অক্লান্ত শ্রমে ও অকাতর অর্থব্যয়ে সাধিত হইয়াছে, বাঙ্গলার ইতিহাস চিরদিন তাঁহাদের এই অক্ষয়কীর্ত্তির ঘোষণা করিবে। কেবল ইহাই নহে, ইউরোপীয় মনীষাসম্পন্ন ঐতিহাসিকগণ বাঙ্গলার মধ্যযুগের যে ইতিবৃত্ত উদ্ধার একরূপ অসাধ্যসাধন বলিয়া নিরাশার সহিত উদ্যম ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহার দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায় ও বিচক্ষণ বিচারশক্তির গুণে সেই ইতিহাস রচনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। দুষ্কর তপশ্চরণ করিয়া যে সকল মহানুভব মনীষিগণ দেশের লুপ্তপ্রায় ইতিহাস উদ্ধার করতঃ আমাদের চিরলাঞ্ছনা বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন, এই তপস্যার যথাযথ ফল তাঁহারা এখন না পাইলেও আমাদের উত্তরপুরুষদিগের জীবনের সর্ব্বপ্রকার সফলতার মধ্যে ইহার সাফল্যের বীজ নিহত হইয়া রহিল।

দেশের সাহিত্য-গঠনকল্পে মাসিক পত্রিকা নানাপ্রকারে সাহায্য করে, একথা অস্বীকার করা যায় না। একদিন আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু (তাঁহার নাম নাই করিলাম) আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমান মাসিক পত্রিকাগুলি আমাদিগকে আর তেমন আনন্দ দিতে পারে না কেন? যদিও সুলেখক সংগ্রহ করিতে পত্রিকার অভিভাবকদিগের যত্ন চেষ্টা ও স্থানে স্থানে অর্থব্যয়েরও ত্রুটি দেখি না, তথাপি আশানুরূপ হয় না দেখিয়া মনে বেদনা পাই। তখন তাঁহাকে এ কথার কোন উত্তর দিই নাই। আমার মনে হয়, সকল জিনিষেরই ফুল ফুটিবার, ফল ফলিবার একটা সময় আছে। অসময়ে চেষ্টা করিয়াও যে গাছের ফুল ফুটান যায় না, উপযুক্ত সময় আসিলে দেখি একরাত্রিতে তাহার শাখা-প্রশাখা সব ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। আশ্বিন মাসে আমের গাছে মুকুল ধরান সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু বসন্তের এক দিবসের দক্ষিণ বাতাস তাহার আপাদমস্তক মুকুলে ছাইয়া দেয়। 'বঙ্গদর্শন' যখন বাহির হয়, তখন আমাদের সাহিত্যকুঞ্জে বসন্তের হাওয়া দিয়াছিল, তাই

বিচিত্র বর্ণের ও বিবিধ গন্ধের নানা ফুলের সাজি লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে উপহার দিতে পারিয়াছিলেন। 'সাধনার' শুভ্র শতদল রবি-কর-প্রফুল্লিত হইয়া আমাদের সম্মুখে বাহির হইয়াছিল বলিয়াই উহা আমাদিগকে তত আনন্দ দিতে পারিয়াছে। যে দুটি লোক 'বঙ্গদর্শন' ও 'সাধনার' নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা বিস্মৃত হইয়া অপরের বিচার করিতে বসিলে চলিবে না। এখন যে নানাবিধ বিচিত্র চিত্রসমন্বিত পট্টশাটী পরিহিত মাসিক পত্রিকায় দেশ ছাইয়া দিয়াছে, তাহারও মধ্যে আনন্দবার্ত্তা নাই, এ কথা বলিতে পারিব না। ফুল ফুটিবার, ফল ফলিবার সময় আইসে নাই, সুতরাং আমরা এখন ফল ফল পাই না। কিন্তু গাছ যদি পাতায় ভরিয়াও থাকে, তাহার মধ্যে আমরা কি তাহার জীবনীশক্তির পরিচয় পাই না? আজ যাঁহারা বৃক্ষতলে জলসেচন করিয়া পাতার বাহারে তাহাকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, সময় আসিলে যখন সেই গাছেই ফুল ফুটিবে ও ফল ফলিবে, তখন তাহার আনন্দ-ভোগে তৃপ্ত হইয়া আমরা বর্ত্তমান সম্পাদক-সম্প্রদায়কে শত ধন্যবাদ নিশ্চয় দিব। দেশে সাহিত্যের যে আনন্দ-চাঞ্চল্য আসিয়াছে, তাহার উত্তেজনায় স্থির থাকিবার উপায় নাই; তাই আবশ্যক-অনাবশ্যকের প্রতি দৃষ্টি নিপাতমাত্র না করিয়া বঙ্গদেশে সেই জীবন-চাঞ্চল্য বিচিত্র-ভাবে নানাদিকে প্রকাশিত হইবার উদ্যম করিতেছে। এ লক্ষণ শুভ লক্ষণই বলিতে হইবে।

এই সভায় পরলোকগত কবি দ্বিজেন্দ্রলালের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। বঙ্গসাহিত্যের একদেশ একদিন তাঁহার প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। শিষ্টসম্প্রদায়ের অনুমোদিত নির্দ্দোষ হাস্যরসের কোন কবিতা তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ বাঙ্গলাভাষায় লিখিয়াছিলেন কি না জানি না। তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক নাটকের ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রীতি জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই প্রীতিরঞ্জিত চক্ষে বঙ্গের বিহঙ্গগীতি, জাহ্নবীর জলকলতান, মেঘান্তরালে ক্ষণপ্রভার হিরণ্ময় জ্যোতিঃ, বাতকম্পিতশীর্ষ শস্যক্ষেত্রের হরিৎ-শোভা, মেবার মরুবাসীর মৃত্যু-মহোৎসব তিনি যেমন করিয়া দেখিতেন তেমন আর কে পারে জানি না। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার মধ্যলীলার শেষ না হইতেই জীবন-মধ্যাহ্নে তিনি অস্তমিত হইয়াছেন, বঙ্গবাসীর ইহা পরম দুর্ভাগ্যের কথা।

দেশের চিত্তক্ষেত্রে যে যৌবন-সুলভ আত্মনির্ভরতা, আত্মশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, এবং স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ তাহারই একতম নিদর্শন। দেশের সমগ্র চিত্তের ঐকান্তিক ইচ্ছার বীজ ইহার মধ্যে নিহিত ছিল বলিয়াই এই বনস্পতি ইহার শাখা-প্রশাখা দেশের সর্ব্বত্র এত সহজে ও সবেগে প্রসারিত করিতে পারিয়াছে।

উদয়াস্ত, দিবারাত্রি, পতন, অভ্যুত্থান প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে চক্রনেমির মত পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছে। এক সময়ে আমাদের বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্র একান্ত উষর হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল। জীবনের বন্ধুর পথে ভ্রমণশীল শ্রান্ত পান্থের আনন্দ-বিধানের উপযোগী গ্রন্থের প্রায় একান্ত অভাবের মতই ঘটিবার সূত্রপাত দেখা গিয়াছিল। সাহিত্যরসপিপাসুর অন্তরাত্মা রসধারার অভিসিঞ্চনে বঞ্চিত হইয়া নিদাঘশুষ্ক কুঞ্জলতিকার মত একান্ত ম্রিয়মাণ

হইয়া পড়ে। আজ আর সে দিন নাই। আষাঢ়ের নবমেঘ-দর্শনে বিচিত্রপুচ্ছ শিখণ্ডীর যে আনন্দ, সাহিত্যের নানা উৎস হইতে উৎসারিত সুশীতল সঞ্জীবনধারা আমাদের হৃদয়-তলে সিঞ্চিত হইয়া আমাদিগকে তেমনই আনন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। সম্মিলনে সমবেত হইয়া আমরা বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি সাহিত্য-মন্দারের শাখাগুলিকে পরিপুষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি, কিন্তু সুকুমার সাহিত্যের কবিকে বিরলে বসিয়া ধ্যানপরায়ণ হইবার অবসর দিতে হইবে। তবেই তাঁহারা ভগীরথের ন্যায় তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ঋষিকোপানলে ভস্মীভূত সগরসন্তানের মত তাপদগ্ধ মানব-সন্তানের উদ্ধারের নিমিত্ত বাগ্দেবতার গোপন নির্ঝর হইতে কাব্যের নির্ম্মল মন্দাকিনীধারা ধরাতলে আনিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভা ও জীবনব্যাপী তপস্যায় আমরা যে সিদ্ধির দর্শন পাইয়াছি, জগতের কাব্যসভায় বাঙ্গালীর কাব্য যে স্থান অধিকার করিয়াছে, সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়েও সেই সাফল্য লাভ করিব এই আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ের মধ্যে জাগ্রত রাখিয়া জীবনব্যাপী কর্ম্মের পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং প্রতিনিয়ত মনে রাখিতে হইবে যে, এই সাহিত্যের পথ দিয়াই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইতে হইবে। কারণ এই পথই আমাদের পক্ষে বিধিনির্দ্দিষ্ট পথ, এবং এই পথেই আমরা সিদ্ধি-সবিতার অরুণ-কিরণের প্রথম সন্দর্শন লাভ করিয়াছি।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

শঙ্করদেব

[উপক্রমণিকা—আসামের বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের পূর্ণতা ও অবতারত্বে বিশ্বাসবান্। শঙ্করদেব স্বয়ং কোনও সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তক নহেন। তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া মহাপুরুষ মাধবদেব "মহাপুরুষীয়" সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। মহাপুরুষীয় পন্থাবলম্বীরা শঙ্করদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ স্বরূপই মনে করিয়া থাকেন। অন্যেরা শঙ্করদেবের ততদূর প্রাধান্য স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সুতরাং ধর্ম্মের আদি প্রদর্শক একথা কেহই অস্বীকার করেন না। এই যুগ-প্রবর্ত্তক মহাত্মার অনেকগুলি চরিত-গ্রন্থ আছে। এতদ্ভিন্ন তৎসম্বন্ধে অসমীয়, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত অনেক মন্তব্য ও প্রবন্ধাদি প্রচারিত হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে শঙ্করদেব সম্বন্ধে মতভেদ অনেক। ইহার প্রধান কারণ তৎসম্বন্ধে লেখকদিগের মনঃকল্পিত ধারণার অত্যধিক সংমিশ্রণ। শঙ্করদেব সম্বন্ধে মৌলিক অনুসন্ধানের জন্য আসামের প্রত্নতত্ত্বপারদর্শী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় আমাকে সর্ব্বপ্রথম উৎসাহিত করেন। দুইবৎসরকাল শঙ্করদেব সম্বন্ধে যে কোন ভাষায় যে স্থানে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে বলিয়া সন্ধান পাইয়াছি, যতদূর সম্ভব তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া ছয়টি প্রবন্ধ রচনা করি। ঐগুলি গৌহাটী-বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত হয়। তৎপর ঐ সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে সংগৃহীত পুস্তক ও পত্রিকার তালিকা। ঐ গুলির মূলানুসন্ধান ও পরবর্ত্তী প্রবন্ধ-নিচয়ের সঙ্কলন-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। অভিজ্ঞ লোকদিগের সমালোচনার পর প্রথম প্রবন্ধটির মুদ্রাঙ্কণ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল ; তৎপরিবর্ত্তে ঐ প্রবন্ধের সিদ্ধান্তগুলি পাদটীকায় মূলের সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং পূর্ব্বের ছয়টি প্রবন্ধ এখন পাঁচটিতে পরিণত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি গৌহাটী-বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভাকর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিতব্য বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্ব্বে ঐগুলি সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় কি না দেখা আবশ্যক। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলে ঐ গুলির বহুল প্রচার ও সমালোচনার সম্ভাবনা। যদি এই প্রবন্ধগুলির দ্বারা শঙ্করদেব সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবধারণের পথ সুগম হয়, তবেই শ্রম সফল মনে করিব।]

প্রথম প্রবন্ধ

পূর্ব্বকালে কামতানগর(১)নামে এক রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যের অধীশ্বর স্বীয় মিত্র গৌড়েশ্বরের নিকট দশঘর ব্রাহ্মণ ও দশঘর কায়স্থ চাহিয়া পাঠান। গৌড়েশ্বর(২)মিত্র-

(১) আসামের ইতিহাসে উল্লিখিত কামতাপুর। পূর্ব্বে সমগ্র কামরূপ রাজ্যও কামতা নামে উল্লিখিত হইত। আনুমানিক ১২৫০।৬০ শকে নীলধ্বজ নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা কামতাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশের শেষ হিন্দু রাজা নীলাম্বর ১৪২০ শকে মুসলমানদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপর কোচবংশীয় বিশ্বসিংহের অভ্যুদয় হয়। তিনি বর্ত্তমান কোচবিহারে রাজধানী স্থাপন করেন।

(২) গৌড়রাজ্য পূর্ব্বদিকে করতোয়ানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মালদহের নিকটে গৌড়রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে।

রাজের সন্তোষবিধানার্থ চৌদ্দঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রেরণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কায়স্থ লণ্ডাদেব ও তাঁহার পুরোহিত কৃষ্ণপণ্ডিত স্বদেশে প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি ছিলেন। লণ্ডাদেবের পূর্ব্বপুরুষেরা কনৌজপুর (কান্যকুব্জ) হইতে গৌড়ে আনীত হন। ইঁহারা কামতানগর গমনে প্রস্তুত হইলে পর গৌড়েশ্বর কহিলেন, "তোমরা এই রাজ্যের অলঙ্কার-স্বরূপ; শুধু মিত্ররাজের সন্তোষের জন্যই তোমাদিগকে পাঠাইতেছি। আশা করি বৎসরান্তে তোমরা এদেশে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়া যাইবে।" রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ইঁহারা সকলে কামতানগরে গমন করিলেন। কামতেশ্বর লণ্ডাদেব ও কৃষ্ণ পণ্ডিতের পরিচয় পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন এবং ইঁহাদের বাসের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ইঁহারা ম্লেচ্ছাদি ইতর জাতি দ্বারা অধ্যুষিত নানা স্থান অতিক্রম করিয়া লঙ্গা মাগুরা (৩)নামক গ্রামে উপনিবিষ্ট হইলেন। অন্যেরা যদৃচ্ছাক্রমে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন।

লণ্ডাদেবের সঙ্গে তাঁহার চণ্ডীবর নামে এক পুত্র কামতা রাজ্যে আগমন করেন। ইনি পিতৃতুল্য গুণবান্ ও পরম পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বহুলোকের পালনকর্ত্তা ছিলেন এবং ইঁহার অনেক ধনুর্দ্ধারী পাইক ছিল। কথিত আছে ৮০ জন ঢালি ইঁহার অনুবর্ত্তন করিত। পূর্ব্বনির্দ্ধারণ অনুযায়ী ইনি বৎসরান্তে গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইতে অবহেলা করেন। তজ্জন্য গৌড়েশ্বর কুপিত হইয়া কৌশলে ইঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া কারারুদ্ধ করেন। দৈবাধীন স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশের সুযোগ পাইয়া ইনি কারাবাস হইতে মুক্ত হন।

নদীয়া হইতে এক পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া গৌড়েশ্বরের রাজধানীতে উপস্থিত হন। এই দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য এক রাশি পুঁথি বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিতেন। গৌড়েশ্বরের সভায় আসিয়া ইনি সদম্ভে বলিলেন, "মহারাজ! আমার সহিত শাস্ত্রবিচারের জন্য যোগ্য পণ্ডিত নির্ব্বাচন করুন!" গৌড়েশ্বর যাহাকে বিচারে নিযুক্ত করেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাহাকেই অবলীলাক্রমে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার প্রশংসা ধ্বনিতে সমস্ত নগর শব্দায়মান হইয়া উঠিল। কারারক্ষকদিগের মুখে চণ্ডীবর সে সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। বিচারে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি কারাধ্যক্ষকে স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন। গৌড়ের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী বিচারে পরাজিত হইলে পর কারাধ্যক্ষ রাজার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! কারাগারে এক বন্দী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছে। তাহাকে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি অনুমতি করেন তাহাকে রাজসকাশে উপস্থিত করি। গৌড়েশ্বর তৎক্ষণাৎ বন্দী চণ্ডীবরকে আনিতে কহিলেন। ক্ষৌরকর্ম্ম ও স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক রাজদত্ত পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া চণ্ডীবর বিচারার্থ সভাস্থ হইলেন। প্রথমে চণ্ডীবর

(৩) বর্ত্তমান কামরূপ জিলার বড়নদীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নিবাস কোথায়?" দিগ্বিজয়ী উত্তর করিলেন "পতনিপুর(৪)।" চণ্ডীবরের বাস কোনগ্রামে জিজ্ঞাসিত হইয়া চণ্ডীবর কহিলেন গোগরিয়াগ্রামে(৫)। গ্রামের নাম শুনিয়াই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গো শব্দের পুনরুক্তি করিয়া চণ্ডীবরেরদিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। চণ্ডীবরও নিরুত্তর রহিলেন না। তৎক্ষণাৎ পতনি শব্দের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন পতনি অর্থাৎ পান্তা ভাতের জল পড়িলে গোময় দ্বারাই পরিশুদ্ধ করিতে হয়!" এই কথায় সভায় উপস্থিত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত লজ্জিত হইয়া নির্ব্বাক ও অধোবদন হইলেন। দৈত্যারি ঠাকুর(৬) লিখিয়াছেন:—

কুটবুদ্ধি কথা দেবীদাসে (চণ্ডীবরের নামান্তর) কহিলন্ত।
আছে শাস্ত্রবাদ এতেকতে জিনিলন্ত।

শাস্ত্রবিচারেও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চণ্ডীবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

রাজদ্বারে সম্মানিত ও রাজদত্ত বহু ধন, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া চণ্ডীবর গৃহে ফিরিয়া গেলেন। চণ্ডীবর দেবীর উপাসক ও পরম ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে, ইনি ধ্যানস্থ হইলে দেবী তাঁহাকে সশরীরে দর্শন দিতেন। এই হেতু লোকসমাজে ইনি দেবীদাস নামে প্রখ্যাত হন।

স্বদেশে কিয়ৎকাল পরম সুখে বাস করিয়া চণ্ডীবর কামতারাজ্যে যাত্রা করিলেন। নৌকায় ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া যাইতে যাইতে লৌহিত্যের উপকূলে টেম্বুয়ানিবন্ধে(৭)বাসোপযোগী উৎকৃষ্ট ভূমি দেখিয়া তন্মধ্যবর্ত্তী বটদ্রবা নামক স্থানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলেন। চণ্ডীবরের বংশে বটদ্রবা গ্রামে **শ্রীমন্তশঙ্করের** জন্ম হয়।

চণ্ডীবরের মহদ্‌গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া কামতেশ্বর ইঁহাকে শিরোমণিভূঞা(৮) নিযুক্ত করেন। চণ্ডীবরের পুত্র রাজধর। ইনিও ভূঞাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন।

(৪) পতনিপুর কোথায় ও এই দিগ্বিজয়ী কে জানা যায় না।

(৫) গোগরিয়া গ্রাম কোথায় ছিল জানা যায় না।

(৬) দৈত্যারিঠাকুর ব্রাহ্মণ নহেন কায়স্থ। শঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য গয়াপাণি—দীক্ষার পর নাম রামদাস। তৎপুত্র রামচরণ, তৎপুত্র দৈত্যারিঠাকুর। ইনি ভক্তদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া 'শঙ্কর ও মাধব দেবের চরিত্র' পুঁথি রচনা করেন। গ্রন্থরচনাকালে শঙ্করদেবের পৌত্র চতুর্ভুজ বিষ্ণুপুর সত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি প্রধানতঃ মাধবদেবের শিষ্য গোবিন্দ আতৈ এবং স্বীয় পিতা রামচরণের মুখে শুনিয়া স্বীয়গ্রন্থ রচনা করেন। মহকুমা বড়পেটার অন্তর্গত বামুনা সত্রে দৈত্যারিঠাকুরের বংশ আছেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত গুরুচরিত্র পুথি অধুনা ভবানীপুর সত্রে রক্ষিত হইতেছে শুনা যায়।

(৭) এই স্থান আধুনিক নগাও জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী। ব্রহ্মপুত্র এখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। বরদোয়ার মহাপুরুষীয় সত্র বিখ্যাত।

(৮) ভূঞারাই রাজাধীনে থাকিয়া দেশ শাসন ও সীমান্তরক্ষা করিতেন। ভূঞাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী তিনিই 'শিরোমণি ভূঞা' হইতেন। আসামে বার ভূঞার উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য বিধ মতও

ইঁহার যশঃ ও খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। ইঁহার চারিপুত্র, সূর্য্যবর, হলায়ুধ, জয়ন্ত ও মাধব। সূর্য্যবরের পুত্র কুসুম; তৎপুত্র শ্রীমন্তশঙ্কর। হলায়ুধের সন্ততির উল্লেখ নাই। জয়ন্তের পুত্র শতানন্দ, তৎপুত্র জগদানন্দ। ইনি আসামরাজ কর্ত্তৃক **রামরায়** নামে অভিহিত হন।

মাধবের পুত্রের নাম অজ্ঞাত, তৎপুত্র **রতিকান্ত দলৈ**। লণ্ডাদেবের পুরোহিত কৃষ্ণ পণ্ডিত কামতা রাজ্যে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কৃষ্ণপণ্ডিতের পুত্র যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র নরোত্তম। নরোত্তমের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র চতুর্ভুজ। ইঁহারই পুত্র **রামরাম গুরু**।

সূর্য্যবর ভুঞা-শ্রেষ্ঠ রাজধরের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। তৎপুত্র কুসুম—কুসুমগিরি নামে পরিচিত। ইনি ভুঞাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আঢ্য ছিলেন এবং শিরোমণি ভুঞারূপে প্রখ্যাত হন। ইঁহার সম্বন্ধে দৈত্যারিঠাকুর লিখিয়াছেন :—

সন্তজন রঞ্জন গঞ্জন দুষ্টজন।
গৌরবর্ণ শরীর পরম সুশোভন॥
তান গুণ গান কিবা কহিব সাক্ষাৎ।
শঙ্কর স্বরূপে কৃষ্ণ অবতার যাত॥

কুসুমগিরি পরম শিবভক্ত ছিলেন। পুত্র কামনায় তিনি বহুকাল নিষ্ঠা সহকারে বিবিধ বিধানে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। দৈত্যারিঠাকুর বলেন, শঙ্করের বরে পুত্রলাভ করিয়া কুসুমগিরি পুত্রের শঙ্কর বা গদাধর এই নামকরণ করেন। কিন্তু কণ্ঠভূষণ(৯) লিখিয়াছেন, কুসুমগিরির ঐকান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং শঙ্কর শঙ্কররূপে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হন(১০)। একদা রজনীতে কুসুমপত্নী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন :—

প্রচলিত আছে। "আদি ভুঞার চরিত্র" নামক প্রাচীন পুঁথিতে উক্ত হইয়াছে, লক্ষ্মীমপুরের রাজমন্ত্রী মনোহরের কন্যার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে সুমন্ত্র ও শান্তামুর জন্ম হয়। ইঁহাদের এক জন শাক্ত ও একজন বৈষ্ণব। প্রত্যেকের দ্বাদশ পুত্র বার ভুঞা নামে খ্যাত হন। বৈষ্ণব সুমন্ত্রের বংশে শঙ্করদেবের আবির্ভাব হয়। 'আদিভুঞার চরিত্র' মহাপুরুষীয় দিগের সম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে। উহা অনিরুদ্ধ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

(৯) কণ্ঠভূষণ শঙ্কর দেবের চরিত্রলেখক। ইঁহার পিতামহ দ্বিজ চক্রপাণি শঙ্করদেবের প্রভাবকালে সশিষ্য বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র বৈকুণ্ঠ তৎপুত্র দ্বিজভূষণ। ইনি প্রহ্লাদোপম কৃষ্ণভক্ত নারায়ণ দাসের পুরোহিত বংশীয় ছিলেন এবং তাঁহারই মুখে শঙ্কর-চরিত-কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। গ্রন্থ রচনাকালে শঙ্করদেবের পৌত্র চতুর্ভুজ বিষ্ণুপুর সত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। এখন ইঁহার বংশে কেহ আছেন কি না জানা যায় না। ইঁহার সাচিপাতে লিখিত যে পুথি আমরা দেখিয়াছি তাহা ৩০০ শত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

(১০) মাধবদেব স্বরচিত গুরুভটিমতে লিখিয়াছেন, "জগজনতারণ দেবনারায়ণ শঙ্কর তাকেরি অংশ।"

বৈষ্ণবকীর্ত্তন।

জটাজূট শিরে শোভে অর্দ্ধচন্দ্রকলা।
গলত শোভয় মনুষ্যর মুণ্ডমালা॥
কটীত বাঘরছাল সর্প অলঙ্কার।
ভস্মে বিভূষিত অঙ্গ দেখি চমৎকার॥
মহাভয় হুয়া সতী চাহিয়া আছন্ত।
দিয়া তযুগৃহে স্থান মহেশে মানন্ত॥ কণ্ঠভূষণ ২ পৃঃ

অচিরে সতীর স্বপ্ন সফল হইল—গর্ভের লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইল। কুসুমগিরির আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সন্তান-লাভের আশায় নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

কাল পূর্ণ হইলে শুভদিন, শুভক্ষণ ও শুভনক্ষত্রের সম্মিলন হইল। কুসুমগিরির পত্নী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মেঘসকল মৃদুগর্জ্জন করিল। অশ্বগণ উচ্চৈঃস্বরে হ্রেষারব করিল। মরি মরি শিশুর কি সুন্দর জ্যোতির্ম্ময়রূপ! তমোময় অর্দ্ধ-নিশীথে সুতিকা-গৃহটি শিশুর দেহনিঃসৃত প্রখর জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া কুসুমগিরি সর্ব্বাগ্রে স্নান করিলেন; পুত্রের কল্যাণোদ্দেশে বহু দান-দক্ষিণাদি স্বকুলোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন; ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ ও জ্ঞাতিগণকে অহ্বান করিলেন। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া কহিলেন, শিশু অতি শুভ লগ্নে জাত হইয়াছে এবং উত্তরকালে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবী, জ্ঞানী, ধীর, শুদ্ধমতি ও পরম পণ্ডিত হইবেক।

সুন্দর ও সুলক্ষণযুক্ত শিশু দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। এই নয়ন-মনোহর শিশুর সমাগমে শিরোমণি ভূঞার নিরানন্দময় গৃহ আনন্দকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। কুসুম আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি ও কুটুম্বগণ তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এখন ভাগ্যলক্ষ্মী কুসুমগিরির প্রতি অনুকূলা হইয়াছেন। কালক্রমে তিনি আর একটি পুত্র লাভ করিলেন। ইঁনিই উত্তরকালে **বনগঞা-গিরি** নামে প্রসিদ্ধ হন।

অধিক বয়সের সন্তান পিতা-মাতার অত্যধিক প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শঙ্করের বিদ্যারম্ভই হইল না(১১)। সমবয়স্ক বালকেরা বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল আর শঙ্কর ক্রীড়া-কুর্দ্দনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। খেলিতে গেলে তাঁহার

(১১) দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন অতি শৈশবে শঙ্করের পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হয় ও তাঁহার পিতামহী বুড়ী গোসানী শঙ্করকে মানুষ করেন। এই কথাটি সম্ভবতঃ তাঁহার লিখা হইতেই মহাপুরুষীয় সমাজে প্রচালত হইয়াছে। দৈত্যারিঠাকুর শঙ্কর-মাধব-সম্মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং কণ্ঠভূষণ হইতেই এই সময়ের সবিস্তার বিবরণ গৃহীত হইল। অন্যান্য চরিত্র-গ্রন্থেও কণ্ঠভূষণের মতেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

আহার-নিদ্রা জ্ঞান থাকিত না। ভোজনে বসিয়া কুসুমগিরি অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। ক্রীড়াস্থল হইতে বালককে ধরিয়া আনিতে হইত :—

ধূলি ধূসরিত তনু রাতুল পরাই।

ধূলিলিপ্ত সোনার পুতুলটির ন্যায় শঙ্করকে ধরিয়া আনিয়া যখন অঙ্গনে দাঁড় করান হইত তখন তাঁহাকে দেখিয়া পরিজনের প্রাণ উল্লাসে নাচিয়া উঠিত। পরিজনেরা স্নান করাইয়া বালককে পিতার সহিত ভোজনে বসাইয়া দিতেন।

ক্রীড়ায় কোন বালকই শঙ্করের সমকক্ষ ছিল না।

ঢোপ ঘিলা খেরি দলি যুদ্ধ খেলায়ন্ত।
মোক ছুইবি বুলি কতো বেগে লড় দেন্ত ॥
ছুইবি বুলি কত শিশু লগতে লররে ॥
আচোক ছুইবেক কতোদূর পাছে পড়ে ॥
হাসিয়া উলটি আসি সাবটি ধরন্ত।
কতো হাতাহাতি বাহু যুদ্ধ খেলায়ন্ত॥

বালকেরা জলে নামিয়া যখন সাঁতারিয়া খেলা করিত তখন কোন বালকই শঙ্করের ন্যায় অধিকক্ষণ জলে ডুব দিয়া থাকিতে পারিত না। দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হইলে কেহই শঙ্করের অগ্রে যাইতে পারিত না। কটা চরাই (পক্ষি-বিশেষ) ধরিতে গেলে অন্য বালকেরা একটিও খুঁজিয়া পাইত না। শঙ্করের হাতে দুই চারিটি ধরা পড়িত। কিন্তু এই ক্রীড়াশীল বালক পাখী ধরিয়া আনিয়া তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিত না। খেলা শেষে সমস্ত পাখী উড়াইয়া যথা স্থানে রাখিয়া আসিত। কুকুর-শাবক ধরিয়া আনিয়া বাসা দিয়া রাখিত। পাছে শীতে কষ্ট পায় এই জন্য শাবকগুলিকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিত।

বিদ্যাশিক্ষায় পুত্রের অযত্ন দেখিয়া কুসুমগিরি অপ্রসন্ন ও চিন্তিত হইলেন। বিদ্যাশিক্ষায় পুত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য এক দিবস অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন, "বাছা! তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি পরম পণ্ডিত হইবে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না। আমার বংশে পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণ সকলেই বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন এবং বিচারে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হইতেছে সেই মহদ্বংশের মধ্যে তুমিই মহামূর্খ হইবে।" কথাগুলি শঙ্করের মর্ম্মস্পর্শ করিল। চঞ্চল মতি বালক তৎক্ষণাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিল, "আমায় পাঠশালায় যাইতে দিন, আমি পড়িতে পারি কিনা দেখিতে পাইবেন।" এই অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া কুসুমগিরি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং কহিলেন :—

ধন্য ধন্য বাপু তুমি কুলর নন্দন।
পড়িবাক শুনি মোর তুষ্ট কৈলা মন ॥

রূপ যৌবন যদি কুলবন্ত হয়।
বিদ্যাহীন ভৈলে বাপু কিছু ন শোভয়॥
আন ধন ধান্যর ভ্রাতৃয়ে বণ্টা লয়।
বিদ্যাধন মহারত্ন নিবে না পারয়॥
দানে ক্ষয় ন যাইবে চোরে না পারে নিবাক।
স্বদেশত পূজে মাত্র মহন্ত রজাক॥
বিদ্যাবন্ত পুরুষক পূজে সর্ব্ব ঠাই।
বিদ্যা যে ভূষণ বাপু অধিকে সহাই॥

কুসুমগিরির অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তীক্ষ্ণধী বালক শঙ্করের প্রতিভা স্রোতো-গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাবী মহত্বের পথে প্রধাবিত হইল। যে সকল শাস্ত্রকার হিন্দুজাতির চিরকল্যাণের জন্য এই নীতিবাক্য গুলি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের লেখনী জয়যুক্ত হউক!

কুসুমগিরি স্বয়ং শঙ্করকে গুরু-গৃহে (১২) লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের দ্বারা শুভদিন, বার, নক্ষত্রাদি দেখিয়া শঙ্করের পাঠ আরম্ভ করাইয়া দিলেন। বালকের পাঠানুরাগ ও উজ্জ্বল প্রতিভা গুরুর বিস্ময় উৎপাদন করিল। গুরু প্রত্যহ যে পাঠ দেন, বালক তাহা অপেক্ষা অধিক শিখিয়া আসে। দ্রুতগতি পাঠশালার ছাত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া শঙ্কর অগ্রগামী হইলেন। অন্য বালকেরা এক এক খানি করিয়া পুথি পড়িত, শঙ্কর দুই দুই খানি করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

শুনিয়োক তান যেন পড়িবার রীতি।
শয্যার দুই পাশে লগায়ন্ত দুই বাতি॥
দুখান ঠনিত দুই পুস্তক থয়ন্ত।
দু গোটা সফুরা ভরি তাম্বুল লয়ন্ত॥
ডাহিনের সফুরাত ভুঞ্জি তাম্বুলক।
ঠনির পুস্তক মেলি পড়ন্ত শ্লোকক॥
তেহং মতে বাসর পুস্তক মেলি চান্ত।
প্রভাতে উঠিয়া পুনু ছাত্রশালে যান্ত॥

পড়িতে পড়িতে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। শঙ্কর কত কাব্য ও কোষ অধ্যয়ন করিলেন—চৌদ্দ শাস্ত্র(১৩) পাঠ করিলেন—পুরাণ মহাভারত ও রামায়ণ ব্যাখ্যা করিলেন। গুরুর বিদ্যা নিঃশেষ হইল, তিনি শঙ্করকে "বিজয়ী পণ্ডিতমস্তু" বলিয়া আশির্ব্বাদ করিলেন।

(১২) কণ্ঠভূষণ বা দৈত্যারিঠাকুর ইঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। পরবর্ত্তী চরিত-গ্রন্থাদিতে ইনি পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

(১৩) চৌদ্দ শাস্ত্র যথা:—শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, মীমাংসা, ন্যায়, দণ্ড, ব্যাকরণ, আয়ুর্ব্বেদ, ছন্দ, স্মৃতি, নিরুক্ত, গান্ধর্ব্ব ধনুর্ব্বেদ ও কাব্য।

শঙ্কর এখন আর বালক নহেন। তরুণ যৌবনের সহিত পাণ্ডিত্যের সম্মিলনে তিনি অতি মধুরদর্শন হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীমন্ত শঙ্কর গৌর কলেবর চন্দ্রর যেন আভাস।
বৃহস্পতি সম পণ্ডিত উত্তম যেন শূর পরকাশ॥
ছত্রাকৃত মাথ শোভে কেশ তাত কাপোল সুষম আতি।
নাসিকা সুন্দর অধর রাতুল দশন মুকুতা পান্তি॥
পদ্মপুষ্প সম বদন প্রকাশে সুন্দর ঈষৎ হাসি।
গম্ভীর বচন মধু যেন শ্রবৈ নব পঙ্কজর পাসি॥
কর্ণ দুই খান পরম সুঠান প্রকাশে হেম কুণ্ডল।
গল কম্বুকণ্ঠ সুন্দর রুচির বহু লয়ে বক্ষঃস্থল॥
আজানু লম্বিত দুই খান ভুজ সুন্দর পরম পুষ্ট।
সুবর্ণর টার বলয়া আঙ্গুঠি দেখন্তে মন সন্তুষ্ট॥
বহল হৃদয় হার প্রকাশয় গায়ত পাট পাসরি।
হিঙ্গুলিয়া ভুনি কটিত প্রকাশে শোভে নীল বর্ণোপরি॥
উরু জানু জঙ্ঘা চরণ সুঠান গজর সম গমন।
গুণে গুণবন্ত মহামান্যবন্ত সমস্তে লোক রঞ্জন॥
মহাযশী ধীর যৌবন শরীর রূপে নোহে কেহো সরি।
শঙ্করর নাম কেহো ন কাঢ়য় বোলে সবে ডেকাগিরি॥

এই রূপবান্ গুণবান্ যুবকের সম্ভ্রম ব্যঞ্জক মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, ইঁহাকে কেহ নাম ধরিয়া ডাকিত না। সকলে ডেকাগিরি বলিয়া আহ্বান করিত। ডেকাগিরি শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রালোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুরোহিত ও সহপাঠী রামরাম গুরু সর্ব্বত্র তাঁহার অনুষঙ্গী ছিলেন। উভয়ে সতত শাস্ত্রচর্চ্চা ও বিতর্ক করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিতেন। ক্রমে শঙ্কর যোগাভ্যাস (১৪) আরম্ভ করিলেন। কঠোর সাধনা দ্বারা প্রাণ, অপাণ, সমান, উদান ব্যান বায়ু বশীভূত করিলেন। ধ্যান, ধারণা, সমাধি, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির সাধন করিলেন। কথিত আছে, যোগাভ্যাসে তিনি এরূপ সিদ্ধি লাভ করেন যে, শ্বাসরোধ করিয়া তিন চারি দিবস বসিয়া থাকিতে পারিতেন। জলের ভিতরে ডুবদিয়া দীর্ঘকাল থাকিতেন, বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেন। যোগাভ্যাস দ্বারা তাঁহার দেহশ্রী আরও সুন্দর ও সুগঠিত হইয়া উঠিল। তখনও তাঁহার বাল্য চপলতা দূর হয় নাই। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে গিয়া তিনি রামরাম গুরুকে কহিলেন, "গুরো! চল ব্রহ্মপুত্র সাঁতরাইয়া পার হই।" তৎক্ষণাৎ নৌকা সজ্জিত হইল;

(১৪) গুরু কে জানা যায় না।

সকলে ব্রহ্মপুত্রে নামিয়া সাঁতার দিলেন। নৌকা পিছু পিছু চলিতে লাগিল। একজন দুই জন করিয়া সকলেই নৌকায় উঠিয়া পড়িলেন। কেবল শঙ্কর ও রামরাম গুরু সাঁতরাইয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলেন। শঙ্কর শুধু পার হইলেন এমন নহে, সাঁতারিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন! রামরাম গুরুও ততদুর সাহস করিতে পারিলেন না।

পুত্রের 'রূপ গুণ বিদ্যা গতি, বয়স আকৃতি মতি' সর্ব্বজন প্রশংসিত দেখিয়া কুসুমগিরি শঙ্করের বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর নূতন কুটুম্বের যথা-যোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া পুত্রের সদৃশ বধূ গৃহে আনিলেন।

দিন দিন ডেকাগিরি অতি লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া দিব্য পট্টউত্তরীয় ধারণ করিয়া সুগন্ধি চন্দন অনুলেপন করিয়া মস্তকে মালতী পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া ডেকাগিরি যখন পথে বাহির হইতেন, পথিকেরা অগ্রগামী হইয়া তাঁহার চরণে নমস্কার করিত। এই মহারূপের প্রভাব দেখিয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাও অবনত হইতেন। এই তেজস্বী দিব্যদর্শন যুবককে পরম পণ্ডিত জানিয়া পাছে তৎসহ বিতর্ক উপস্থিত হইলে লজ্জা পাইতে হয়, এই ভয়ে ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করিয়াই শীঘ্র শীঘ্র সরিয়া পড়িতেন। ডেকাগিরি কাহাকেও একটা রূঢ় কথা বলিতেন না, সুমিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ না করিয়া কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতেন না।

একদিন ডেকাগিরি পথে চলিয়াছেন। এক ভৃত্য ঝারি ও কম্বল লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে। কিয়দ্দূর গিয়া তিনি এক সোজাপথে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বারণ করিল। কহিল, "প্রভো! এই পথে যাইবেন না। এই পথে মহিষের ন্যায় ভয়ঙ্করমূর্ত্তি এক ষাঁড় আছে, পথিক দেখিলেই এই বিকটাকার জন্তুটা ভীষণ বেগে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহার ভয়ে কেহ এই পথে আসে না।" শুনিয়া ডেকাগিরি কহিলেন, "আমি পথিকদিগের ভ্রমণের বিঘ্ন দূর করিব।" এই বলিয়া তিনি অগ্রগামী হইয়া দেখিলেন মস্তক আন্দোলন করিয়া ষাঁড়টা ভীষণ বেগে আসিতেছে। লম্ফদিয়া ডোকাগিরি ষাঁড়ের শৃঙ্গ ধরিলেন।

শরীরর বলে আটি ধরিলা মেরাই।
করে ছটফট যাইতে না পারে এড়াই॥
গাবর সন্ধানে মুণ্ড উচাট করিল।
আছোক এড়াইব লারিবাকো ন পারিল॥
টান করি পৃথিবীত ধুধুরি থেকচি।
ঘাড় পাক দিয়া তাক পেহলাইলা হেচুকি।
মর মর করি হাড় ঘারর ভাঙ্গিল।
মহা পীড়া পাইয়া মূত্র পুরীষ এড়িল॥

পাচুয়াই কতো দূরে পড়িলেক যাই।
যেন অরিষ্টক কৃষ্ণে পেহলাইলা তুনাই॥

এইরূপে যণ্ডের দমন করিয়া ডেকাগিরি এই পথ নিষ্কণ্টক করিলেন। পথিকেরা নির্ভয়ে যাতায়ত করিতে লাগিল। ইহার পর ডেকাগিরি আসিতেছে এইমাত্র বলিলেই যণ্ডবর ভয়ে দৌড়িয়া পলাইত।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর কুসুমগিরি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শঙ্করের জীবনে এই প্রথম শোকের আঘাত পড়িল। তিনি ধৈর্য্যধারণ করিয়া পিতার যথাবিধি সংকার করিলেন, দশদশা করিলেন, মাসান্তে শুদ্ধ হইলেন। পিতার স্বর্গকামনায় বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধ করিলেন, বহুদান ও দক্ষিণার দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন, জ্ঞাতিদিগকে ভোজন করাইলেন।

অনতিবিলম্বে শঙ্কর-জননীও স্বামীর অনুগমন করিলেন। এইটি শোকের দ্বিতীয় আঘাত। শঙ্কর শাস্ত্রদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ, তথাপি তাঁহার প্রশান্ত হৃদয় স্নেহময়ী মাতার বিয়োগে আলোড়িত হইল। তিনি বিধি-ব্যবহারে মাতার ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন করিলেন; আর ভাবিতে লাগিলেন

মুহিকে স্থায়িত্ব ইতো অনিত্য সংসার।
কৈর পিতৃ মাতৃ বন্ধু পুত্র পরিবার॥
কৈর পরা জীব আসি হোয়ে একঠাই।
ধরয় সম্বন্ধ পিতৃ মাতৃ খুড়া ভাই॥

তত্ত্বজ্ঞানের একটা মর্ম্মান্তিক আলোড়ন আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু শঙ্কর সংসারের প্রধান আকর্ষণ এড়াইতে পারিলেন না। পরম গুণবতী ভার্য্যার যত্ন ও আনুগত্য তাঁহাকে সংসারের দিকে টানিয়া রাখিল। তিনি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিয়া কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার এক কন্যা জন্মিল। তিনি মনের আনন্দে কন্যার মনু নাম রাখিলেন। কন্যা বয়স্থা হইলে কায়স্থকুলোদ্ভব হরি নামক এক সচ্চরিত্র যুবককে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। আর সন্তানাদি হইল না।

কথিত আছে ভগবান্ যাহাকে কৃপা করেন, সর্ব্বাগ্রে তাহার সংসারে অশান্তিস্বরূপ প্রিয় ব্যক্তিদিগকে হরণ করিয়া থাকেন। এক একটি প্রিয়জন চলিয়া যায় আর সংসার সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত মানব ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া যিনি প্রিয় হইতেও প্রিয়তর তাঁহার নিকট যাইতে চায়। প্রাণের সমস্ত আবেগ একীভূত করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাকে। যাঁহাকে ভুলিয়া আত্মহারা জীব সংসারে খেলা ধূলায় নিমগ্ন ছিল, ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করে।

বিপৎ সম্পাতে বৈষ্ণবদিগের মুখে এই পদটি প্রায়ই শুনা যায়:—

যে করে তোমার আশ।
কর তার সর্ব্বনাশ॥

তবু করে তোমার আশ।
হও তার দাসের দাস ॥

ভগবান্ শঙ্করের সর্ব্বনাশ করিলেন। যে পত্নীর প্রেমডোরে তিনি বাঁধা ছিলেন—তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হেতু সংসার অনিত্য ও দুঃখময় ইহা বুঝিয়াও তিনি যাহার মমতায় আকৃষ্ট ছিলেন, ভগবান্ তাহাকে এই পৃথিবী হইতে সরাইয়া লইলেন। শঙ্করের পত্নী শঙ্করকে ত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। শঙ্করের সংসারের বাসাঘরটি ভাঙ্গিয়া পড়িল - বৈরাগ্যের উদয় হইল।

উদাস মনে শঙ্কর পত্নীর শবদেহের সংকার করিলেন, পরলোকগত আত্মার সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিলেন। পিতার মৃত্যুতে যে আগুন ধরিয়াছিল মাতার মৃত্যুর পর যাহা ধূমায়মান হইয়া জ্বলিতেছিল, এইবার তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ধনসম্পত্তি শঙ্কর দুই হাতে বিলাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। হৃষ্টপুষ্ট বৎস সহ তিন শত ধেনু ছিল, তাহা রাখালদিগকে দান করিলেন—চাষের জন্য ষাটিজোড়া বলদ ছিল, তাহা বিতরণ করিলেন। অন্য সম্পত্তি সমস্ত খুল্ল পিতামহ জয়ন্ত ও মাধবকে সমর্পণ করিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জামাতা হরির গৃহে রাখিয়া তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশ্যে শঙ্কর স্বদেশ ত্যাগ করিলেম।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

স্বজন বিয়োগে পাশমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় শঙ্করদেব গৃহ ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত সংসারক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চরিত-গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে :—

দ্বাদশ বৎসর তীর্থ করি ফিরিলন্ত।
অনন্তরে আসি নিজ গৃহক পাইলন্ত ॥

এই দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি কোন্ কোন্ তীর্থে কতকাল বাস করিয়াছিলেন, তাহার কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহার চরিতগ্রন্থগুলিতে তৎকর্ত্তৃক শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন ও কিয়ৎকাল বাসের কথা ব্যতীত বিশেষ কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই। তৎকালে শ্রীক্ষেত্র যাইতে দুইমাস সময় লাগিত(১৫)। তীর্থযাত্রিগণ শ্রীক্ষেত্রে চতুর্মাস্য অর্থাৎ বর্ষার

(১৫) কণ্ঠভূষণের গ্রন্থে একথার প্রমাণ আছে। জগন্নাথ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এক ব্রাহ্মণ শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ শঙ্করদেবকে পাঠ করিয়া শুনাইতে আসেন। তিনি শঙ্কর-সন্নিধানে আসিয়া বলিতেছেন—

দুইমাস পূর্ণ ভৈলেক পথত আসিলোঁ গো রঙ্গমনে।
মহাভাগ্য মোর মিলিল তোহ্মাক দেখিলোঁ আমি নয়নে ॥

চারিমাস যাপন করিতেন। তীর্থ পর্য্যটনমাত্র উপলক্ষ্য হইলে শঙ্করদেবের জগন্নাথ-দর্শন, শ্রীক্ষেত্রবাস ও স্বদেশ প্রত্যাগমনে একবৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইত না। কিন্তু তীর্থদর্শনমাত্র মূলতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, এই সময়ে শঙ্করদেব ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সমস্তই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তৎকালে মুসলমান প্রাধান্য হেতু ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাংশে হিন্দু তীর্থ-যাত্রীর গতায়াত বিশেষ ছিল না। উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন হিন্দুভূপতিগণ রাজত্ব করিতেন, সুতরাং তখন দলে দলে হিন্দু তীর্থ-যাত্রিগণ ঐ সকল রাজ্যেই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিনে তৎকালে দর্শনীয় স্থানগুলি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্করদেব শ্রীক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিলেও যে স্থানে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন ইহাতে সংশয় নাই।

এই সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন? কি করিয়া ছিলেন? তৎসমস্ত জানা অতি আবশ্যক। কারণ এই তীর্থ ভ্রমণকালীন শিক্ষা ও ভূয়োদর্শন তাঁহাকে স্বদেশের ধর্ম্মসংস্কারে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত এই গ্রন্থদ্বয়ের অশেষ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শঙ্কর দেব প্রধানতঃ এই গ্রন্থদ্বয় হইতেই স্বীয় ধর্ম্মমত আহরণ করিয়াছিলেন। কণ্ঠভূষণ এই গ্রন্থদ্বয় শঙ্করদেব কোথায় পাইলেন উল্লেখ করেন নাই। দৈত্যারিঠাকুর লিখিয়াছেন, জগন্নাথ এক অজ্ঞাত নামা বিপ্রের দ্বারা শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রেরণ করেন। গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত হইলে ঐ বিপ্র প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ ইনিই কণ্ঠভূষণ-বর্ণিত ত্রিহুতদেশীয় ব্রাহ্মণ জগদীশ মিশ্র। কিন্তু কণ্ঠভূষণ লিখিয়াছেন, জগদীশ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শঙ্করদেবকে পাঠ করিয়া শুনাইতে আসিয়া দেখিলেন ইতিপূর্ব্বেই শঙ্করদেব ঐ গ্রন্থের পদ রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং জগদীশ মিশ্রের নিকট শঙ্কর দেব শ্রীমদ্ভাগবত পাইয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

গীতা-শাস্ত্রসম্বন্ধে দৈত্যারিঠাকুর এক অদ্ভুত গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ গ্রন্থ শঙ্করদেব ব্রহ্মপুত্র গর্ভে প্রাপ্ত হন এবং উহার স্পর্শে তাহার একটি ছিন্ন কর্ণ জোড়া লাগিয়া যায়।

এই সকল বৃত্তান্ত হইতে প্রকৃত সত্য অবধারণ করা সুকঠিন। প্রাচীন কামরূপ তন্ত্র-শাস্ত্রের বীজভূমি। এই কামরূপে বহু তন্ত্র ও উপপুরাণ রচিত হইয়াছিল। শঙ্করদেবের সম-কালে কামরূপের ব্রাহ্মণসমাজে শিক্ষাবিষয়ে দৈন্য পরিলক্ষিত হইলেও এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই যে, গীতা ও ভাগবত তৎকালে এদেশে সম্যক্ অপরিজ্ঞাত ছিল। গ্রন্থ

ছিল বটে, কিন্তু চর্চ্চা ছিল না। তীর্থভ্রমণের পর দেশে আসিয়া শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবতের পদরচনা ও উহার প্রচারে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তীর্থভ্রমণকালে শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত গঠন করিয়াছিলেন।

আসামের বৈষ্ণব-সাহিত্য আমরা যতদূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে শ্রীক্ষেত্র ব্যতীত অন্য অন্য তীর্থের বিশেষ বিবরণ কিছুই দেখিতে পাই নাই। তৎকালে আসাম হইতে দলে দলে তীর্থযাত্রিগণ শ্রীক্ষেত্র যাইত, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কেহ কেহ অধ্যয়ন-মানসে কাশীতে যাইতেন, কেহ কেহ গয়ায় পিণ্ডদান করিতে যাইতেন, এরূপ উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং আসামের বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোড়ন করিয়া শঙ্করদেব কোথায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার নির্দ্ধারণ সম্ভবপর হইবে না।

বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে তদানীন্তন প্রধান প্রধান তীর্থ এবং কোন্ কোন্ স্থান কোন্ কোন্ শাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত চর্চ্চা অতি অল্প স্থানেই হইত। তখন প্রধান প্রধান শিক্ষার কেন্দ্র ভূমিতে দর্শন ও বেদান্তের চর্চ্চাই বিশেষ প্রবল ছিল। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তৎকালে

গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাই তাহার জিহ্বায়॥

বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্য ব্যতীত বৈষ্ণব-প্রভাব তখন অন্যত্র ছিল না বলিলেই হয়। বৃন্দাবন ত তখন বিজন অরণ্যে পূর্ণ। মথুরাও মুসলমানদিগের অত্যাচারে বিধ্বংশপ্রায়।

শঙ্কর দেবের—

দৈবকীনন্দন এক　　বেদমাত্র শাস্ত্র এক
দৈবকীনন্দনে কৈলা যাক (১৬)।

ইত্যাদি উক্তি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, শঙ্করদেব বেদ পাঠ করিয়াছিলেন এবং এক বেদবিহিত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, দৈবকীনন্দনের সহিত বেদের কোনও রূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। বেদের 'কৃষ্ণ' একজন ঋষি মাত্র। বেদের সহিত না হইলেও বেদান্তের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য রচিত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের কোনও সুস্পষ্ট দার্শনিক ভিত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্বাচার্য্য 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন' নামক বেদান্ত-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া অপর সম্প্রদায়ের মত গঠন করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই মূল কাণ্ডগুলি শাখা-প্রশাখা সহকারে দক্ষিণ ও মধ্যভারতে কিছু কিছু বিস্তৃত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর

(১৬) শ্রীমদ্ভাগবত ২।৫।১৪।১৫ ও ১৭—"নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণাঙ্গঃ।" ইত্যাদি শ্লোক।

শেষাংশে বর্ত্তমান আকারে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। শঙ্করদেব খৃষ্টীয় ১৪৪৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে মূল শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার জন্মের ২০০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে রচিত হয় নাই।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইলে পর উহার ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতানুসারিণী টীকারও রচনা আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে শ্রীধর স্বামীর টীকাই আসামে ও বঙ্গদেশে সমাধিক প্রচলিত দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য-সংসৃষ্ট সাহিত্যে দেখা যায় যে, শ্রীধরস্বামীর টীকা শ্রীচৈতন্যের বিশেষ প্রিয় ছিল। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য শ্রীধরস্বামীর টীকা মানেন না বলাতে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"প্রভু হাসি কহে "স্বামী না মানে যেই জন
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন।"

চৈতন্য-চরিতামৃত ৩২৫ পৃঃ।

শঙ্করদেবও শ্রীধরস্বামীর টীকা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন তাঁহার নিজ রচনা এবং মহাপুরুষীয় সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

শঙ্করদেবের সময় নবদ্বীপ নগরী শাস্ত্র চর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তথায় পণ্ডিত-মণ্ডলী বেদান্ত ও ন্যায় দর্শনের চর্চ্চাতেই নিমগ্ন ছিলেন। মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের তদানীন্তন প্রধান গুরু শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আগমন করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যান। ইঁহারই শিক্ষায় বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। ইনি ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় তৎকালে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। দক্ষিণ দ্রাবিড় হইতে শ্যামদাস, শ্রীহট্ট হইতে রাজা দিব্যসিংহ, দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীনাথ আচার্য্য, পুরী হইতে কর্ণাটরাজবংশীয় মুকুন্দদেব, পুরুষোত্তম ও কামদেব প্রভৃতি, বূঢ়ন হইতে হরিদাস এবং সপ্তগ্রাম হইতে যদুনন্দন আচার্য্য প্রভৃতি সমাগত হইয়া ইঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইঁহার সংসৃষ্ট প্রাচীন সাহিত্যে শঙ্কর নামক এক শিষ্যেরও উল্লেখ দেখা যায়।

এই শঙ্কর আসামের শঙ্করদেব কিনা নিশংসয়ে বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্যে একবার মাত্র ইঁহার নামোল্লেখ আছে। উক্ত হইয়াছে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মত বিরোধ হেতু শঙ্কর প্রভৃতি তাঁহার কতিপয় প্রধান প্রধান ছাত্র শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া যান এবং ঐ সকল স্থানে স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

কি উপলক্ষে মতভেদ হইয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত এই। শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সহিত যোগদান করিলে পরই বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজ মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠে। শ্রীচৈতন্য তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক প্রেমের দ্বারা অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার দলন করিয়া ছিলেন। তিনিই নাম-সংকীর্ত্তনের জন্মদাতা। "শুষ্ক পত্রের ন্যায় শাস্ত্র-চর্চ্চা নিষ্ফল" এই বলিয়া গৌরহরি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহোরাত্র শুধু নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেন। হঠাৎ অদ্বৈত তাঁহার দল ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গিয়া ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা

আরম্ভ করেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয় তৎপ্রণীত "অমিয় নিমাই-চরিত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এই উপদেশ (জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব) শুনিয়া হরিদাস টলিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের কোন কোন প্রধান শিষ্যের মন টলিয়া গেল, যথা শঙ্কর, কামদেব নাগর, আসল পাগল ইত্যাদি। শ্রীঅদ্বৈতের শঙ্কর নামক শিষ্য আসামে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের ছায়া প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন সেই দেশে লইয়া গেলেন কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার করিলেন না।" (১ম খণ্ড 'অমিয় নিমাই চরিত' ৫৩ পৃষ্ঠা)। স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ও তৎসঙ্কলিত "চৈতন্যলীলামৃত" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত ঠিক এইরূপই উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি মাধব নামক অন্য শিষ্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য অশেষ বৈষ্ণবশাস্ত্রদর্শী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়কে লিখিয়াছিলাম। তিনিও শঙ্করদেব সম্বন্ধীয় এই বৃত্তান্ত ঠিক অনুরূপ ভাবেই বর্ণন করিয়াছেন সুতরাং দেখা যাইতেছে অতিভক্ত বঙ্গীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা এই বৃত্তান্তে দৃঢ় বিশ্বাসবান্। মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের নামোল্লেখ প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শঙ্করদেবের নামোল্লেখ নাই। তত্ত্বনিধি মহাশয় ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করেন। প্রথমতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণব দিগের মধ্যে যাহারা শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বে বিশ্বাসবান্ ছিলেন না, শ্রীচৈতন্য সংসৃষ্ট প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহাদের বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈত-গোবিন্দবাদী ছিলেন অর্থাৎ যাহারা শ্রীঅদ্বৈতই গোবিন্দ এরূপ বিশ্বাস করিতেন, শ্রীঅদ্বৈত-সংসৃষ্ট প্রাচীন পুঁথিতে তাঁহাদেরই বৃত্তান্ত অগ্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভক্ত-বৈষ্ণব লেখকেরা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের শতমুখে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের নিন্দাবাদ দ্বারা জিহ্বা কলুষিত করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে বঙ্গীয় বৈষ্ণব-পণ্ডিতেরা প্রায়শঃ এক মত হইয়া শঙ্করদেব সম্বন্ধে এই কয়টি সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন :—

১। শঙ্করদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

২। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই, গৌরহরি অবতার রূপে স্বীকৃত হইবার পূর্ব্বেই শান্তিপুর ত্যাগ করেন।

৩। তিনি অদ্বৈত-গোবিন্দ বাদী ছিলেন না।

৪। তিনি জ্ঞান শূন্য ভক্তিমার্গের অনুরাগী ছিলেন না।

৫। তিনি শ্রীঅদ্বৈত বা অন্য কোনও বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তদ্দেশীয় কোনও সুম্প্রদায়ভুক্ত হন নাই।

এই সকল সিদ্ধান্তের কোনটিই শঙ্করদেবের পরবর্ত্তী জীবনেতিহাসের বিরোধী নহে। আধুনিক অসমীয় লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই মনে করেন শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যের বহুপূর্ব্বে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এই বিশ্বাসের প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে শঙ্করদেব

বয়সে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা অনেক বড়। কিন্তু ইতিহাস ও চরিত-গ্রন্থগুলি এই কথার সমর্থন করে না। শঙ্করদেবের চরিতগ্রন্থগুলিতে দেখা যায়, তিনি বড়পেটায় (১৭) অধিষ্ঠান করিলে পরই তাঁহার প্রধান প্রধান ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। রাজা নরনারায়ণ ১৪৬২ শকে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার পরবর্ত্তী ২১৩ বৎসর মধ্যে শঙ্করদেব বড়পেটার অন্তর্গত পাটবাউসীতে (১৮) উপনিবিষ্ট হন এবং ঐ স্থানই কেন্দ্রভূমি করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। সুতরাং পাটবাউসীতে শঙ্করদেবের গমনের সময় তাঁহার বয়ক্রঃম অন্ততঃ ৯১ বৎসর হইয়াছিল। তাহার ৭ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যের তিরোভাব হইয়াছে।

অদ্বৈত সভায় ১৪৩০ শকে শঙ্করদেব উপস্থিত ছিলেন এরূপ অনুমান হয় এবং ঐ সনেই তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। "জোনাকী" পত্রে শঙ্করদেবের যে ধারাবাহিক জীবনী প্রকাশিত হয়, তাহার লেখক অনুমান করিয়াছিলেন যে, শঙ্করদেব ৪৪ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রথম তীর্থ যাত্রা করেন। শঙ্করদেবের জন্ম, দ্বাদশ বৎসরের পর বিদ্যারম্ভ, বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ, পিতৃবিয়োগ, মাতৃবিয়োগ, কন্যালাভ, কন্যার বিবাহ দান ইত্যাদি ঘটনার পর পত্নী বিয়োগ হইলে তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া তীর্থযাত্রা করেন সুতরাং তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৪ বৎসরের কম হইতেই পারে না। তিনি দ্বাদশ বৎসরান্তে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন সুতরাং তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৬ বৎসরের কম নহে। তাঁহার চরিতগ্রন্থগুলিতে জন্ম-শকের উল্লেখ নাই। ঐ শক ১৩৭১ বলিয়া এখন এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিলে ৫৬ বৎসরের স্থলে ৫৯ বৎসরের সময় অদ্বৈত-সভায় শঙ্করদেবের উপস্থিতি সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তাহা হইলে প্রথম তীর্থ-যাত্রার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৪ না হইয়া ৪৭ হয়।

অদ্বৈত-সভায় শঙ্করদেবের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহা শ্রীধরস্বামীর টিকা সহ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন ব্যতীত অধিক নহে। তিনি শ্রীচৈতন্য বা শ্রীঅদ্বৈতের প্রদর্শিত পথের অনুবর্ত্তন করেন নাই। যদি করিতেন তবে তাঁহার আত্মলোপ ব্যতীত উহা সম্ভবপর হইত না। বস্তুতঃ শঙ্করদেব অন্য নিরপেক্ষ থাকিয়াই নিজ প্রচার-ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য, অদ্বৈত ও শঙ্কর স্ব স্ব প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের তারতম্য অনুসারে স্ব স্ব অধীত শাস্ত্র-নিচয় যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। ইঁহারা যে স্ব স্ব আলোক অনুযায়ী স্ব স্ব অনুসঙ্গীদিগকে বিভিন্ন পথে লইয়া গিয়াছিলেন, একথা ক্রমেই পরিস্ফুট হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র দে

(১৭) বর্ত্তমান কামরূপ জিলার মহকুমা। ইহার অন্তর্গত বড়পেটাসত্র মহাপুরুষ মাধবদেবের স্থাপিত, মহাপুরুষীয়দিগের বৃহত্তম সত্র। ইহা মহাপুরুষীয়দিগের শ্রীধাম। এখানকার কীর্ত্তন-ঘর দর্শনীয়।

(১৮) বর্ত্তমান বড়পেটা সহর হইতে ২৸০ মাইল দূরে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত;—শঙ্করদেবের পাটবাউসী ও দেব দামোদরের পাটবাউসী। শঙ্করদেবের জীবদ্দশায় পাটবাউসী ব্যতীত অন্যত্র কোনও সত্র স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার তিরোভাবের পর তৎপথাবলম্বী ধর্ম্মাচার্য্যগণ স্থানে স্থানে সত্র স্থাপন করিয়াছেন।

নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ

(কৈফিয়ৎ)

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৬ষ্ঠ ভাগ, ২য় সংখ্যা) আমার "নারায়ণদেব ও পদ্মা-পুরাণ" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রীহট্ট করিমগঞ্জ মহকুমার সুযোগ্য সব্‌ডেপুটী-কালেক্টর সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ মহাশয় ৭ম ভাগ, ২য় সংখ্যা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ও শ্রীহট্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের ৩য় ভাগ, ৫ম সংখ্যা সাহিত্য-সংবাদপত্রিকায় নারায়ণদেব সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ দুইটির মধ্যে প্রথমটি আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রকারান্তরে প্রথম প্রবন্ধের সমর্থনের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রবন্ধ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে লিখিত হইলেও উহাদের উদ্দেশ্য এক এবং পরস্পরের মধ্যে এত সাদৃশ্য ও সংস্রব বিদ্যমান যে, একটিকে ত্যাগ করিয়া অন্যটির আলোচনা চলিতে পারে না। তজ্জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি ঐ দুইটিরই একত্রা-লোচনাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রতিবাদের বিষয়ীভূত "নারায়ণদেব ও পদ্মাপুরাণ"—শীর্ষক প্রবন্ধ দ্বারা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অভিনব মতের প্রচার বা কোনও প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত প্রচারের ইচ্ছা কি প্রয়াস আমার ছিল না। বরং উদ্দেশ্য উহার সম্পূর্ণ বিপরীতই ছিল। প্রাচীন হস্তলিপির আলোচনা করিতে করিতে আমি সময় সময় যে সকল জটিল সমস্যার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম, নিজের চেষ্টা-দ্বারা ঐ সকলের উপযুক্ত সমাধান সম্ভবপর নহে, মনে করিয়াই উহা বঙ্গীয় সাহিত্যিক সমাজের গোচরীভূত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে চেষ্টা বিপরীত ফলপ্রসূ হইয়াছে। যাঁহারা আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা কেহই আমার উদ্দেশ্য সরল ভাবে গ্রহণ করেন নাই। বিরজাবাবু আমার প্রবন্ধে দুইটি উদ্দেশ্যের আরোপ করিয়াছেন,—(১) নারায়ণদেব ও সুকবিবল্লভ (কবিবল্লভ) বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন, একই ব্যক্তি। সুকবি-বল্লভ উপাধিব্যঞ্জক পদ। (২) নারায়ণদেব খাঁটি ময়মনসিংহবাসী। এই উদ্দেশ্যের আরোপ করিয়া তিনি লিখিতেছেন, "ময়মনসিংহ জেলার সহিত পদ্মাপুরাণের সবিশেষ পরিচয় স্থাপন করিতে সতীশবাবু যাদৃশ বদ্ধপরিকর, কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্গদেশ ও আসামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নারায়ণদেবের বাসভূমি এবং জন্মস্থান নির্দ্দেশের চেষ্টায় তাদৃশ বদ্ধপরিকর হইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই।" বিরজাবাবুর এই উক্তি কতদূর সত্য ও নিরপেক্ষতার পরিচায়ক প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পত্রের কথা আমার প্রবন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অচ্যুত বাবুর এতদ্বিষয়ক চেষ্টার পরিচয় স্বয়ং বিরজা বাবুই স্বীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, অতঃপর এ বিষয়ের

প্রবন্ধলেখক আরও দুই চারি জনের উল্লেখ আমি এস্থলে করিতেছি। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মত প্রকাশের পর শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব মহাশয় "শ্রীহট্টের সাহিত্যসম্পদ্" নাম দিয়া যে পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, উহাতে তিনি ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি নারায়ণদেব ও মহিলা কবি চন্দ্রাবতী প্রভৃতিকে সগৌরবে শ্রীহট্টের সাহিত্যিক তালিকাভুক্ত করিয়াছেন, গৌহাটী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার পঞ্চম অধিবেশনে আসামের শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় "সুকনান্নি" নামক নারায়ণী পদ্মাপুরাণের যে অসমীয় অনুবাদের বিবরণসূচক প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই গ্রন্থ দরঙ্গরাজের অনুজ্ঞায় তাঁহার সভাপণ্ডিত কবিবর নারায়ণদেব রচনা করেন; এবং উক্ত রাজা কর্ত্তৃক এদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞ লোক সংগ্রহ করিয়া গায়কের দল সংগঠনপূর্ব্বক নবরচিত গীতসকল শিক্ষা দান করেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম দরঙ্গজেলাতেই এই সমস্ত গীতি সুরসংযোগে প্রচারিত হয় এবং ক্রমশঃ বর্ত্তমান কামরূপ জিলা পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকারের পরিচয় আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। দরঙ্গরাজ-পরিবারের বংশধরগণের সমীপে অনুসন্ধান করিলে তাহার পরিচয় জানা যাইতে পারে।" শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে ও শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়দ্বয়কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধের বিস্তৃত পরিশিষ্ট যোজিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় উহা মুদ্রিত হইয়াছে(১)। ঐ পরিশিষ্টে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন "আমি বাল্যাবধি পদ্মা-পুরাণ রচয়িতা নারায়ণ দেবের কথা স্বদেশে (শ্রীহট্টে) শুনিয়াছি, তাঁহাকে আমাদের অঞ্চলের লোক বলিয়াই ভাবিয়াছি, তাহাই উত্তম বাবুকে নারায়ণদেবের জন্মস্থানাদির সন্ধান জিজ্ঞাসা করায় তিনি লিখিয়াছেন যে, নারায়ণদেবের জন্মস্থান কোথায় ছিল, তাহা তিনি অবগত নহেন। তবে তাঁহার রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ কামরূপীয় কথার অনুযায়ী এবং তিনি দরঙ্গের রাজার অনুজ্ঞায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এইমাত্র বলিতে পারেন(২)।" উত্তম-বাবু গ্রন্থকারের পরিচয় বিশেষ কিছু অবগত নহেন, তজ্জন্য দরঙ্গরাজের বংশধরগণের নিকট এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও গোপালকৃষ্ণ বাবু দরঙ্গ-রাজবংশধরগণের নিকট কোনই অনুসন্ধান না করিয়া পুনরায় উত্তমবাবুর নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কেন ভাল বুঝা গেল না। দরঙ্গরাজ বংশধরগণের নিকট অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফল পরিশিষ্টে সংযোজিত করিলেই পরিশিষ্ট লেখা সার্থক হইত, তাহা না করিয়া তিনি এক কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। গোপালকৃষ্ণ বাবুর বক্তব্যের অসম্পূর্ণতা শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নিম্নলিখিত উক্তিদ্বারা দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—"আমাদের শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রবাদ এই যে, নারায়ণদেব ও কবিবল্লভ শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী

(১) কথাভাগবত ও সুকনান্নিনামক প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকার অষ্টাদশভাগ, ২য় সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৮শ ভাগ, ২য় সংখ্যা ১১২ পৃঃ।

হবিগঞ্জের উপবিভাগস্থিত নগরগ্রামে বাস করিতেন, উঁহারা উভয়ে মিলিয়া পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। তাই "নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভে কয়" এইরূপ ভণিতা পদ্মাপুরাণে দেখা যায়। তৎপরে কোন কারণে নারায়ণ ও কবিবল্লভ বসতিস্থান পরিত্যাগ করিয়া যান। নারায়ণদেব পশ্চাৎ জন্মস্থানের অনতিদূরবর্ত্তী ময়মনসিংহ জেলার বোর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে নাকি আজও তাঁহার বংশধরগণ আছেন। আবার কবিবল্লভ সম্বন্ধে দেখিতে পাই, তাঁহার বংশধরেরা রঙ্গপুরের অন্তর্গত সুন্দরগঞ্জ থানার অন্তর্গত চোরতাবাড়ী গ্রামে থাকিয়া আজও পদ্মাপুরাণের গীত গাহিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন।" অতঃপর গৌহাটীতে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন কামরূপনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারানাথ কাব্যবিনোদ মহাশয় অসমীয়া ভাষায় লিখিত "অসমীয়া সাহিত্যের জাগরণ ও জাতীয়ভাবশীর্ষক" প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে 'কামরূপের অতীত কবি দুর্গাবর ও নারায়ণদেব কামরূপ দেবস্থান বলিয়া গৌরব করিয়াছিলেন(৩)' এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ অধিবেশন স্থলে কামরূপস্থিত কুরিহাটোলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মকান্ত কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত "প্রাচীন কামরূপ" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "গোবিন্দমিশ্র, অনন্তকন্দলী, সুকবি নারায়ণ দেব, মাধব, কংসারি প্রভৃতি কবিগণও নানারূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশবাসীর ধর্ম্মচর্চ্চার পথ সুগম করিয়া আর্য্যত্বের বিশুদ্ধিসাধন করিয়াছেন(৪)।" এ পর্য্যন্ত যে সকল লোকের লেখা আলোচনা করিলাম, ইহা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে কোন তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, বিরজাবাবু একটুকু ভাবিয়া দেখিবেন কি? এ সবই তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মভূমি শ্রীহট্ট ও তাহার সমীপবর্ত্তী স্থলের লেখকগণের উক্তি। আমার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় এই সকল লেখকের প্রতি মনোযোগ করিলে তিনি তাঁহার ভ্রম অতি সহজেই বুঝিতে পারিতেন। বিংশ পুরুষাধিক নারায়ণদেবের বংশধর বোরগ্রামে বাস করিতেছে বঙ্গসাহিত্যেও এতকাল পর্য্যন্ত নারায়ণদেব ময়মনসিংহের অধিবাসী বলিয়াই নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত হইয়াছেন। যে পদ্মনাথবাবুর পত্র হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, বিরজাবাবু প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকেরা যাহার মতের সমর্থন ব্যপদেশে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ রচনা, যুক্তির পর অভিনব যুক্তির অবতারণা আরম্ভ করিয়াছেন, সেই পদ্মনাথ বাবুও স্বীয় পত্রে এবং পরবর্ত্তী মন্তব্য সমূহে নারায়ণদেব বোর গ্রামবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এমতাবস্থায় নারায়ণদেবের ময়মনসিংহবাসীত্ব কোনও প্রকার প্রমাণের অপেক্ষা করে না। আমার প্রবন্ধেও উহা প্রমাণের কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমি নারায়ণদেবকে চিরদিন ময়মনসিংহবাসী বলিয়াই জানি এবং এখনও বিশ্বাস করি।

---

(৩) উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের ৫ম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ ৬২ পৃঃ।

(৪) ঐ ঐ ৭৯ পৃঃ।

"একটা কথা শুনিলাম, তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইলাম, অথচ কোন যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে তাহাকে দাঁড় করান যায় না। সাহিত্যক্ষেত্রে ইহা নিতান্ত অসমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়" ইত্যাদি ভূমিকা করিয়া বিরজাবাবু প্রবন্ধের আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার এই সারগর্ভ মন্তব্যসংযুক্ত সুদীর্ঘ ভূমিকা পাঠের পর নারায়ণদেবের সম্বন্ধে যথেষ্ট সারসত্যের সন্ধান লাভ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইব আশায় বহু উদ্যমের সহিত প্রবন্ধটির পাঠ সমাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু উহা পাঠ করিয়া একেবারে নিরাশ হইয়াছি। এত আশা উদ্যমের যে এইরূপ শোচনীয় ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে, প্রবন্ধপাঠের সময় তাহা একবারও মনে করিতে পারি নাই। লেখক মহাশয়ের এই বিপুলায়তন প্রবন্ধের মধ্যে নূতনত্বের লেশ মাত্রও নাই। ইহার আমূল কেবল চরিতবর্ণনের দ্বারাই পূর্ণ করা হইয়াছে। প্রবন্ধে যে সকল মতের অবতারণা ও যুক্তিতর্কের সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহার সমুদয় গুলিই পূর্ব্বে পদ্মনাথ বাবুর পত্রে ও অচ্যুত বাবুর গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছিল। উহার পুনরুল্লেখের জন্য এরূপ বিস্তৃত প্রবন্ধের কোনই আবশ্যকতা ছিল না। বিরজা বাবুর বিস্তৃত প্রবন্ধপ্রকাশের পর অচ্যুতবাবুর সাহিত্যসংবাদের প্রবন্ধের কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। উহাতে বৃথা কালীকলম ও কাগজের অপব্যয় এবং সময় নষ্ট করা হইয়াছে মাত্র। ফলতঃ সত্যনির্ণয়ের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইঁহাদের এই উভয় উদ্যমই সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে।

আমার প্রবন্ধে পদ্মাপুরাণরচয়িতা নারায়ণদেব ও দ্বিজ বংশীদাস ময়মনসিংহের আবালবৃদ্ধবনিতার চিরপরিচিত, ময়মনসিংহের শিশু মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণদেবের সরস পাঁচালীর সহিত পরিচিত হইয়া থাকে, ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছিলাম, বিরজাবাবু তাহাতে কাল্পনিক উচ্ছ্বাসের আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি মাতৃভূমি ও বহু পুরুষের আবাসস্থান পাবনার ক্রোড় ত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ জেলা আশ্রয় করার পর হইতে বিংশাধিক বর্ষকাল অবিচ্ছেদে পদ্মাপুরাণগীতমুখরিত ময়মনসিংহের পল্লীঅঞ্চলে আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি হইতে শ্রাবণমাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত যে স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শন ও আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি, উক্ত প্রবন্ধে আংশিকভাবে তাহাই প্রকাশের জন্য যত্ন করিয়াছিলাম। হিন্দুমুসলমানের মিলিত কণ্ঠোচ্চারিত পদ্মাপুরাণ-সঙ্গীতমুখরিত পূর্ব্বময়মনসিংহের পল্লী-অঞ্চলের সহিত বিরজাবাবুর যদি বিন্দুমাত্রও পরিচয় থাকিত, তবে তিনি এই প্রকার মন্তব্যপ্রকাশে নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত হইতেন।

পরলোকগত মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের ভূতপূর্ব্ব প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাঘ ও ফাল্গুন মাসের সৌরভপত্রিকায় বিরজাবাবুর তর্কের উত্তরে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। রামনাথ বাবু যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, উহার পুনরুল্লেখ করিলে প্রবন্ধকলেবর নিতান্ত বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভবনায় ক্ষান্ত হইলাম। কৌতূহলী পাঠক উহা সৌরভপত্রিকা হইতেই পাঠ করিবেন।

বিরজা বাবু তাঁহার প্রবন্ধের অধিকাংশ স্থানেই নানাপ্রকার অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া আমার প্রবন্ধের সরল ও সহজবোধ্য কথাকে অধিকাংশ স্থলেই জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। "শৈশবে মাতৃস্তন্যের সহিত যাঁহার কবিতার পরিচয়, তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া বিশ্বাস করা ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে অতিমাত্র স্বাভাবিক" আমার এই উক্তির প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে বিরজাবাবু যে ভাবে কবিগুরু বাল্মীকি, মহামতি চাণক্য, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যে শ্রেণীর পল্লীবালকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া আমি উহা লিখিয়াছিলাম, শৈশবে কবি গুরু বাল্মীকি, মহামতি চাণক্য প্রভৃতির কবিতার সহিত পরিচয়লাভের সুযোগ তাহাদের অতি সামান্যই ঘটিয়া থাকে। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগের "পাখী সব করে রব" ইত্যাদি কবিতার সহিত পরিচিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই তাহারা নারায়ণদেবের সরল পাঁচালীর সহিত পরিচিত হইয়া থাকে, সুতরাং ময়মনসিংহের শিশুর পক্ষে তাহাকে আপনার বলিয়া ভাবাই স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে রমানাথ বাবু লিখিয়াছেন, "নারায়ণদেবের গাথার সহিত একা ময়মনসিংহের শিশুর পরিচয় হয়, সুতরাং তাহাকে ময়মনসিংহবাসীর আপনার বলিয়া ভাবা স্বাভাবিক(৫)।" আমার প্রবন্ধের ঐ অংশে যে বিন্দু-মাত্রও অতিশয়োক্তির সংস্রব নাই, তাহা যিনি এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। ময়মনসিংহের পল্লীঅঞ্চলের সহিত যাঁহার পরিচয় ঘটিবার কোন দিন সুযোগ ঘটে নাই, তাঁহার পক্ষে এরূপ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া সঙ্গত ও সুশোভন নহে।

বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় মুদ্রিত পদ্মাপুরাণের গ্রন্থসংখ্যা যে পাঁচখানির অনেক অধিক তাহা বিরজা বাবু একটু কষ্ট-স্বীকারপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে সে সংবাদ তাঁহার গোচরীভূত করিতে যত্ন করিব। এক্ষণে তাঁহাকে জানাইতেছি যে, আমার প্রবন্ধে উল্লিখিত ৭০ খানির অধিক পদ্মাপুরাণের হস্তলিপির সকলগুলিই এক ময়মনসিংহ জেলায় সীমাবদ্ধ নহে। ইহার মধ্যে পাবনা, রাজসাহী, রঙ্গপুর ও ঢাকা প্রভৃতি জেলার হস্তলিপিও আছে। তবে বেশীর ভাগ ময়মনসিংহ জেলাতেই প্রাপ্ত। পদ্মাপুরাণের লিখিত বিষয়ের সমালোচনা উপলক্ষে ভবিষ্যতে সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা আমি করিব। বাঙ্গালার যত জেলায় পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি পাওয়া যাইতে পারে, সকলগুলির সংগ্রহ ও নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা ব্যতীত পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা চলিতে পারে না। সে পক্ষে আমার গবেষণা যে অগভীর তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মল্লিখিত প্রবন্ধের অসমীচীনতা-প্রদর্শনের জন্য লেখক প্রবন্ধোক্ত "নারায়ণদেবের স্বহস্তলিখিত" গ্রন্থের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে বন্ধুবর শ্রীকেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের

(৫) সৌরভ ২য় ভাগ, মাঘ ১৩২০।১৩০ পৃষ্ঠা।

পত্রাংশেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কেদার বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সত্য, প্রবন্ধের ঐ অংশ আমার ভ্রমবশতঃই উহার অঙ্গীভূত হইয়াছিল, ঐ ত্রুটির জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। আমার ঐ উক্তি যে ভ্রমসঙ্কুল এবং প্রবন্ধে উহার মূল্য যে অতি সামান্য, তাহা বিরজাবাবু নিরপেক্ষতার সহিত আলোচনা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যে তাহা করেন নাই, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় হইয়াছে। কোনও গ্রন্থকারের রচনাদির বিষয়ে, গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। সে প্রকার গুরুতর দলিল থাকিতে অন্যরূপ প্রমাণ প্রদর্শনের বা নানাপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণার কোনই প্রয়োজন থাকে না। সেরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করিলেও গ্রন্থকারের হস্তলিপির পোষক প্রমাণরূপেই তাহার উল্লেখ করা হয়। আমার প্রবন্ধে তাহা কিছুই করা হয় নাই। সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যের প্রকাশ যাহাদের উদ্দেশ্য, আমার ঐ অনিচ্ছাকৃত ভ্রম তাঁহাদের নিকট উপেক্ষিত এবং ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিরজাবাবু তাহা না করিয়া ঐ ভ্রমকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া প্রমাণের জন্য শ্রীযুক্ত গগণচন্দ্র হোম মহাশয়ের এক পত্রাংশের উল্লেখ করিয়াছেন। গগণবাবু লিখিয়াছেন, "সেই প্রাচীন পুথিখানি (যাহা নারায়ণদেবের বংশধরগণের নিকট ছিল) জরাজীর্ণ অবস্থায় আমার হস্তগত হয়, কোন সনের লেখা, কাহার হস্তের লেখা ইত্যাদি পরিচয়সূচক কথা থাকিলেও আমার স্মরণ নাই। আমাদের বাড়ীর প্রাচীন পুথি হইতে সেইখানি অধিকতর প্রাচীন ছিল।" গগণবাবুর এই উক্তির দ্বারা বিরজাবাবুর যে বিশেষ লাভ হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। গগণবাবু অনুরোধ-রক্ষার্থ কোনরূপে একটি উত্তর দিয়া পাশকাটাইতে যত্ন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কেদারবাবুর উক্তি "নারায়ণদেবের বংশধরগণের নিকট যে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ ছিল, তাহা শ্রীযুক্ত গগণচন্দ্র হোম লইয়া গিয়া হারাইয়া ফেলিয়াছেন", সত্য। ঐ হস্তলিপি সম্বন্ধে নারায়ণদেবের বংশধর শ্রীযুক্ত গগণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত কেদারবাবুর ময়মনসিংহের বিবরণে ৺নারায়ণদেবের পরিচয় সূচক ভণিতা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাদের বাড়ীর ও অন্যান্য অনেক গ্রামের পদ্মাপুরাণেও দেখিতে পাই। অতি প্রাচীন, নারায়ণদেবের স্বহস্তলিখিত পুথিখানি আমাদের গ্রামের ৺মহেন্দ্রচন্দ্র দে, যখন এনে পড়ে, তখন সহিনানিবাসী শ্রীযুক্ত গগণচন্দ্র হোম মহাশয়ের সঙ্গে একত্র হইয়া ছাপাইবার জন্য বাড়ী হইতে নিয়াছিল। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকে ছাপান হওয়া দূরে থাকুক, আসল বইখানারও লোপ করিয়াছে।" বিশ্বাস মহাশয়ের এই কথা যে সত্য, তাহা হোম মহাশয়ের পত্রাংশ হইতেও অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

আমার প্রবন্ধের জয়ণসাহী পরগণাসংক্রান্ত আলোচনাতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অযথা আক্রমণ করা হইয়াছে, বিরজাবাবু মৎপ্রতি এই দোষের আরোপ করিয়া লিখিয়াছেন—"বোর প্রথমে জয়ণসাহী পরগণার অধীন, এক দিন সর্ব্ববাদিসম্মত-রূপেই গৃহীত ছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে একথা সপ্রমাণ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদারও একথাই বলিয়া আসিতেছিলেন। এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন।” নারায়ণদেবের বাসস্থান বোরগ্রাম জোয়াণসাহী পরগণার অন্তর্গত একথা আমি দীনেশবাবু ও কেদারবাবু প্রভৃতির মতের অনুসরণেই লিখিয়াছিলাম। কেদারবাবু তাঁহার প্রথম সংস্করণের ময়মনসিংহের বিবরণ গ্রন্থে ময়মনসিংহের প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবরণে ৬৫ পৃষ্ঠায় কবি নারায়ণদেবের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “বোর গ্রাম কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম।” ঐ বিবরণের গ্রন্থকার কেদার বাবু নিজে কিশোরগঞ্জবাসী, নারায়ণদেবের বাড়ীও কিশোরগঞ্জ মহকুমারই অন্তর্গত বোরগ্রাম। সুতরাং এ বিষয়ে কেদার বাবুর লিখিত বিবরণই আমার নিকট সত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে আমি নিজে কোনই অনুসন্ধান করি নাই। আমি অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম এবং কেদারবাবুর গ্রন্থাদিপাঠে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহার সহিত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তির অসাদৃশ্য দেখিয়াই তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ের প্রমাণপ্রার্থী হইয়াছিলাম, ইহার নাম যদি আক্রমণ হয়, তবে তজ্জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, পঞ্চাননবাবুকে আমি নিরতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। প্রবন্ধে পঞ্চাননবাবুর জন্য কৈফিয়ত দিতে যাইয়া বিরজাবাবু শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের শ্রীহট্টের ইতিহাসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেদারবাবুর গ্রন্থের উল্লেখ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, ময়মনসিংহের বিবরণে স্পষ্টই আছে যে, জয়ণসাহী (বা জোয়াণসাহী) এক সময় সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল এবং কেদারবাবু তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন “পরগণা শ্রীহট্ট এক সময় সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল, তাহা আমার পুস্তকেই আছে।” কেদারবাবুর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ ময়মনসিংহের বিবরণ আমি বহুবার পড়িয়াছি, এই প্রবন্ধ লেখার সময়ও উহা পুনরায় পড়িয়া দেখিলাম, কিন্তু উহাতে “জোয়াণসাহী শ্রীহট্ট-সরকারের অন্তর্গত ছিল, একথার স্পষ্ট উল্লেখ দূরের কথা, অস্পষ্ট আভাসও পাইলাম না। বিবরণগ্রন্থে ময়মনসিংহ জেলার এই প্রকার সীমানির্দ্দেশ করা হইয়াছে। “ইহার উত্তর সীমা গারোপাহাড়, পূর্ব্ব সীমা শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা, দক্ষিণ সীমা ঢাকা, পশ্চিম সীমা পাবনা, বগুড়া ও রঙ্গপুর জেলা।” ময়মনসিংহ শ্রীহট্টের সহিত এক সীমাবদ্ধ জেলা হওয়াতেই যত বিপদের কারণ হইয়াছে, সেই জন্যই নানা অবান্তর কথা লইয়া এই ভাবে আলোচনা করিতে হইতেছে। কেদারবাবু লিখিয়াছেন. “অতি পূর্ব্বকালে ময়মনসিংহ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌড়েশ্বর হুসেনশাহ কামরূপ অধিকার করিয়া এই অংশ কামরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া লন ও স্বীয় পুত্র নছরৎ সাহকে ইহার আধিপত্য প্রদান করেন। নছরৎ সাহের নামানুসারে ইহার অধিকৃত ভূমি (বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা) নছরৎসাহী নামে অভিহিত হয়। তৎপর এতদ্দেশে মোগলশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে, দিল্লীশ্বর আকবর সাহ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় রাজস্ব সচিব টোডরমল্লের বন্দোবস্ত কাগজে নছরৎসাহী “সরকার বাজুহা” নামে লিখিত হইয়াছে। ইংরাজ-শাসনকালের প্রারম্ভে “সরকার বাজুহা” জেলা ময়মনসিংহ

নামে অভিহিত হইয়াছে (৬)।” অতি পূর্ব্বকালে কামরূপের সহিত সংস্রব ব্যতীত শ্রীহট্টাদি পূর্ব্বাঞ্চলের সহিত ময়মনসিংহের সংস্রবের কোনও প্রসঙ্গ “ময়মনসিংহের বিবরণ” গ্রন্থে নাই। ইহা সত্ত্বেও কেদারবাবু ঐরূপ কথা কেন লিখিয়াছেন, ভাল বুঝিলাম না। কেদারবাবু বিবরণ-গ্রন্থের অন্য স্থানে লিখিয়াছেন “স্থাপন সময়ে ইহার আকার বর্ত্তমান আকারের দ্বিগুণ ছিল। ক্রমে এই জেলার ভূমি অন্যান্য জেলাভুক্ত হওয়ায় ইহার আয়তন বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে (৭)।” ঐ গুলিও বিরজাবাবুর সিদ্ধান্তের বিপরীত। ময়মনসিংহ জেলা স্থাপনের পর অন্য জেলার ভূমি এই জেলার অন্তর্গত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ আমরা কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই (৮)। শ্রীহট্টের ইতিহাসেও এরূপ কোনও প্রমাণ উল্লেখিত হয় নাই। এ বিষয়ে শ্রীহট্টের ইতিহাসের প্রমাণও বিরজাবাবুর প্রদর্শিত যুক্তিরই ন্যায় দুর্ব্বল। মূল প্রবন্ধের সহিত সে সকলের কোনই সংস্রব না থাকায় এস্থলে উহার আলোচনায় বিরত হইলাম।

নারায়ণদেবের বাসস্থান জোয়াণসাহী পরগণার অন্তর্গত এ কথা ভ্রম। প্রথিতযশাঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন, কিশোরগঞ্জের অধিবাসী বন্ধুবর কেদারবাবু, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হইতে এ নগণ্য লেখক পর্য্যন্ত সকলেই আমরা এ বিষয়ে ভ্রমগ্রস্ত। বোরগ্রাম নসিরুজ্জিয়াল পরগণার অন্তর্গত। বিরজাবাবুর অনুসন্ধানে এই ভ্রম সংশোধিত হওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বিরজাবাবুর পূর্ব্বে ১২৯০ সনের নব্যভারত পত্রিকায় গগণবাবু এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—“নারায়ণদেব পূর্ব্বময়মনসিংহের অন্তর্গত নসিরুজ্জিয়াল পরগণার অন্তর্গত নেত্রকোণা সবডিভিসনের অধীন বোরগ্রাম নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্ম-গ্রহণ করেন।” গগণবাবুর এই প্রবন্ধ আমি বিরজাবাবুর প্রবন্ধপাঠের পরে দেখিয়াছি। আমি পরগণার ভুল করিয়াছি, গগণবাবু মহকুমার ভুল করিয়াছেন। আমার বাড়ী নারায়ণ-দেবের বাসস্থান হইতে তিন দিনের পথ অপেক্ষাও বেশী দূর, কিন্তু গগণবাবুর বাড়ী কিশোর-গঞ্জ মহকুমায়। বিরজাবাবুর প্রকাশিত পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—“আমাদের বাড়ী সোহিলা হইতে বোরগ্রাম বেশী দূর নহে।” গগণবাবুর ন্যায় নারয়ণদেবের বাসস্থানের অদূরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীর এই ভ্রম যদি উপেক্ষার যোগ্য হয়, তবে আমার ভ্রম ক্ষমার যোগ্য হইবে না কেন? বিরজাবাবু যখন অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিয়াছিলেন জোয়ানসাহী লেখা আমার ভ্রম হইয়াছে এবং এই ভ্রম বঙ্গসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরাও অনেকেই করিয়াছেন, বিশেষতঃ নারায়ণদেবের জন্মস্থানের সহিত উহার সংস্রবও অতি সামান্য, তখন ঐ প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করা সঙ্গত ছিল, তাহা না করিয়া তিনি বিশেষ সমদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। স্বীয় প্রবন্ধের ৩৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন, “এই নসিরুজ্জিয়াল পরগণাটি কতদিনের, ইহা জয়নসাহী হইতে খারিজা কি না, যদি না হয় তথাপি তৎকালে শ্রীহট্টান্ত-

(৬) ময়মনসিংহের বিবরণ ১ম সংস্করণ ২ পৃষ্ঠা।
(৭) ময়মনসিংহের বিবরণ ৩ পৃষ্ঠা।
(৮) রঙ্গপুর জেলার পাতিলাদহ পরগণা ময়মনসিংহ ভুক্ত হইয়াছে। সম্পাদক—

ভুক্ত স্থানমধ্যে উহাও ছিল কি না, (কেননা জয়নসাহী ছাড়াও অনেক জায়গা শ্রীহট্টের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল) ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা এখনও বাকী রহিয়াছে।" বিরজাবাবু এই আলোচনা করিয়াছেন কি না? এবং আলোচনা করিয়া থাকিলেই বা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা অবগত নহি। আমাদের সিদ্ধান্ত নিম্নে লিখিতেছি, ইহার উপর কৃপাদৃষ্টিপাত করিলে বাধিত হইব। যে ময়মনসিংহের বিবরণ গ্রন্থের বিষয় তিনি তাঁহার প্রবন্ধে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন, গ্রন্থকার কেদার বাবু বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানে তাহাতে ময়মনসিংহের বর্ত্তমান পরগণাসমূহের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা পাঠ করিলেই বিরজাবাবু উল্লিখিত সমস্যার সুন্দর সমাধান দেখিতে পাইতেন। কেদারবাবুর সঙ্কলিত বিবরণে দেখা যায়, "নসিরুজ্জিয়াল জোয়ানসাহী হইতে পুরাতন ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরগণা। আইন-আকবরীগ্রন্থে নসিরুজ্জিয়াল পরগণা, নছরৎ-ও-জিয়াল নামে পরিচিত ছিল। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হোসেন সাহ কামরূপ অধিকার করিয়া তাহার শাসনভার তৎপুত্র নছরৎ সাহের হস্তে প্রদান করেন। নছরৎ সাহ কামরূপের রাজা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে, পলায়নপর হইয়া গারোপাহাড় অতিক্রম করিয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা হইতে এই পরগণা নছরৎ-ও-জিয়াল নামে অভিহিত হইয়াছে। নছরৎ সাহ ক্রমে তাঁহার সমস্ত প্রদেশ নছরৎসাহী নামে অভিহিত করেন। অকবর সাহের সময় পর্য্যন্ত, এই প্রদেশ (সাধারণতঃ সম্পূর্ণ ময়মনসিংহ জেলা) নছরৎসাহী নামে পরিচিত ছিল। অতঃপর ঈশার্খার শাসনকালে এই পরগণা ঈশার্খার হস্তগত হয়। ঈশার্খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পারিষদ্ মসজেদ্ জালাল নছরৎ-ও-জিয়াল পরগণার আধিপত্য গ্রহণ করেন। এই মসজেদ্ জালালের সুরক্ষিত আবাসবাটীর বিচিত্র ভগ্নাবশেষ বোয়ালাবাড়ীর নিবিড় অরণ্যে অন্ধকারে লয় পাইতেছে(১)।' বিরজাবাবু লিখিয়াছেন, "বোরগ্রাম চিরদিনই ময়মনসিংহের অন্তর্গত। এই কথাটি বলিবার সময় সতীশবাবু আরও একটি কথা যেন মনে করেন যে, "ময়মনসিংহ" এই নামক জেলাটিরই অস্তিত্ব আজ ১২৫ বৎসর যাবৎমাত্র। কেদারবাবুর ময়মনসিংহের বিবরণে দেখা যায় যে, ১৭৮৭ সনের ১লা মে এ জেলা স্থাপিত হয়।" এই চিরদিনের বয়ঃক্রম ১২৫ বৎসর, ময়মনসিংহ জেলার বয়ঃক্রমের সমান। ময়মনসিংহ এই রাজনৈতিক বিভাগ (Political division) হওয়ার অনেক পূর্ব্বে পরগণা বিভাগ হইয়াছিল। পরগণাবিভাগের সময় হইতেই বোরগ্রাম নসিরুজ্জিয়াল পরগণার অন্তর্ভুক্ত আছে। তৎপূর্ব্বে অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইহাও কামরূপরাজ্যেরই অংশ ছিল। পরে যখন ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হইয়াছে, তখন হইতে ইহা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত হইয়া তাহার গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে। এই ভাবে অতীত গৌরবের নির্দ্দেশ বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম নহে। আমার পূর্ব্বে এই পথে বিচরণ করিয়া "পশিয়াছে বহু যাত্রী যশের মন্দিরে"।

(১) ময়মনসিংহের বিবরণ ১ম সংস্করণ ও ২য় সংস্করণ

এ বিষয়ে আমিও যে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছি নিম্নোদ্ধৃত বিবরণের আলোচনা করিলে বিরজাবাবু তাহা বুঝিতে পারিবেন। ময়মনসিংহ ১২৫ বৎসরের জেলা, সুতরাং অনেকটা প্রাচীন। কিন্তু ময়মনসিংহের পশ্চিম সীমাস্থিত পাবনা জেলা নিতান্ত আধুনিক। উহার বয়স এখনও পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। উহা বহুদিন পর্য্যন্ত রাজসাহীর অধীনে একটি মহকুমামাত্র ছিল। সম্প্রতি পাবনার পরলোকগত সুসন্তান অগ্রজপ্রতিম রজনীকান্ত সেনের জন্মভূমি ভাঙ্গাবাড়ী গ্রাম হইতে সংগৃহীত সন ১২৭২ বঙ্গাব্দের লিখিত "ঘটকর্পর যমকাব্যে"র শেষাংশে দেখিতেছি, "লেখক শ্রীমহিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ মোকাম ভাঙ্গাবাড়ী, পরগণে ইসুবসাহী, জেলা রাজসাহী, মহকুমে পাবনা, থানা উল্লাপাড়া।" এই লেখা অনুসারে গণনা করিলে দেখা যায়, ঐ হস্তলিপির বয়স মাত্র ৪৮ বৎসর। লেখকের বাড়ীও পাবনা জেলাতেই। ঐ সময় পাবনা জেলা স্থাপিত হইয়া থাকিলে তিনি কখনই এভাবে বাসস্থানের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেন না। পঞ্চাশ বৎসরও যে জেলার বয়স পূর্ণ হয় নাই, উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক পঞ্জী-সংগ্রহ করিতে যাইয়া উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলন ও রঙ্গপুরসাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ও বগুড়া সেরপুরের সুলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডুমহাশয় নিঃসঙ্কোচে ১৬৪ শকে রচিত পদাঙ্কদূতগ্রন্থের রচয়িতা নাটোরাধিপতি মহারাজ রামজীবনের সভাসদ্ শ্রীকৃষ্ণসার্ব্বভৌম(১০) ও তৎপূর্ব্বের লিখিত রামায়ণের কবি অদ্ভুতাচার্য্য প্রভৃতিকে সেই পাবনা জেলার সাহিত্যিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন(১১)। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সাহিত্যিক পঞ্জী আবার শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ মহাশয়ের অধিনায়কত্বে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন তৃতীয় অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ প্রথম খণ্ডের অঙ্গীভূত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও সম্প্রতি তাঁহার ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ প্রভৃতি দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিল(১২)।' শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের History of Bengali Language and Literature গ্রন্থের সমালোচনা করিতে যাইয়া Royal Asiatic Society's Journalএ মাননীয় বেভারিজ (H. Beveridge) মহোদয় লিখিয়াছেন "Dinesh Chandra says that Vijaya Gupta's village is in the district of Bakarganj, but I suspect that it is now in Faridpur, for it is part of the village

(১০) সার্ব্বভৌমমহাশয়ের পদাঙ্কদূত গ্রন্থের শেষে পরিচয়াদিজ্ঞাপক এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ১। শাকে সায়কবেদষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মার্পয়। ২। নানন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি। ৩। চক্রে কৃষ্ণ-পদাঙ্কদূতমখিলং প্রীতিপ্রদং শ্রীমতাং। ৪। বীরশ্রীরঘুরামরায়নৃপতেরাজ্ঞাং গৃহীত্বাদরাৎ।

(১১) উত্তরবঙ্গসাহিত্যসম্মিলন, ৩য় অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ। গৌরীপুর, ১৩১৭।

(১২) রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

of Gaila", (1912) January number। উত্তরবঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে (মালদহনগরে) শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন "১৬১৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ পরীক্ষিৎ নারায়ণের মৃত্যু হইলে পর এই প্রদেশ (গোয়ালপাড়া, মোগলসম্রাট্‌দিগের সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং তদবধি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগলরাজ্যভুক্ত হইয়া রঙ্গপুর জেলার অধীন থাকে।" বিরজাবাবুর যুক্তি অনুসারে দেখিতে গেলে আনন্দবাবুকে অপরাধী মনে করিতে হয়, এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয়গুপ্তকে ফরিদপুরের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করায় বেভারিজ সাহেবকেও দোষী করিতে হয়। বেভারিজসাহেব এবং আনন্দবাবু বর্ত্তমান Political division ধরিয়াই ঐ সমস্ত কথা লিখিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উক্তিতেও উহারই পরিচয় আমরা পাইতেছি। উপরে পাবনার যে সকল সাহিত্যিকের বিষয় আলোচনা করিয়াছি, তাঁহাদিগকে রাজসাহীর সাহিত্যিক শ্রেণীতে স্থান দিলে বিরজাবাবুর মতে ঠিক হইত, কিন্তু তাহা করিতে গেলে সাহিত্যিক-ক্ষেত্রে বিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল। বিরজাবাবু আপাততঃ নারায়ণদেবকেই শ্রীহট্টবাসী বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় নারায়ণদেবের সঙ্গে দ্বিজ বংশীদাসকেও দাবী করিয়াছেন(১৪)। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর করিয়াছেন গৌহাটী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে আসামের গণ্ডীতে ফেলিবার মতলবে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে ৺কামাখ্যাধামে পঠিত "আসামের সম্পদ্" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "যাহা এখন বাঙ্গালার গৌরবজনক স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা এই প্রাচীন দেশের আসামের ইতিহাসেরও সীমার অন্তর্গত ছিল(১৫)।" সুদূর অতীতে কখন কোন্ স্থান আসামের অন্তর্গত ছিল, সেই সকল লইয়া যদি আজ তাঁহারা দাবী উপস্থিত করেন, তবে তাহার ফলে বিতণ্ডা ব্যতীত আর বিশেষ কোনরূপ লাভ হইবে এরূপ মনে হয় না।

বিরজাবাবু আমার প্রবন্ধে পদ্মাপুরাণের বিভিন্ন হস্তলিপি হইতে সঙ্কলিত নারায়ণদেবের পরিচয়ব্যঞ্জক কবিতাংশসমূহের দুই এক চরণ উঠাইয়া লিখিয়াছেন, "ময়মনসিংহে তাঁহার পরিদৃষ্ট হস্তলিখিত অনূ্ন ৭০ খানি পুথির মধ্যে মাত্র ৭।৮ খানি পদ্মাপুরাণে যে পরিচয়সূচক ভণিতা আছে, (তাহাও আবার পরস্পর অনেক গরমিল) তাহাই তিনি বেদবাক্য মানিয়া অন্যান্য পুস্তকে যে সকল কথা আছে, তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অধিকাংশ পুস্তকে যাহা নাই, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সাহিত্যিকেরা ধরিয়া থাকেন। পরিচয়সূচক কবিতাযুক্ত যে ৭।৮ খানি পুথি, তাহা হয়ত একই পুস্তকের নকল এবং কবিতাগুলি প্রথম পুস্তকে নারায়ণদেবের বংশধর বলিয়া পরিচিত কাহারও কীর্ত্তি।

---

(১৩) মালদহকার্য্যবিবরণ ২য় ভাগ ২৯ পৃষ্ঠা।

(১৪) সাহিত্যসংবাদ অগ্রহায়ণ। ১৩২০

(১৫) উত্তরবঙ্গসাহিত্যসম্মিলন ৫ম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

পরস্পর যে গরমিল দেখা যায়, তাহা নকলের দোষে। মিথ্যার একটা প্রমাণ এই যে, ইহার অন্যত্র বিরুদ্ধ কথা পাওয়া যায় না।" বিরজাবাবুর এই সুদীর্ঘ মন্তব্য দেখিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, তিনি বাঙ্গালা বা সংস্কৃত হস্তলিপির আলোচনা অতি সামান্যই করিয়াছেন। যদি তিনি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের—বিশেষ-ভাবে পদ্মাপুরাণের—বহুসংখ্যক হস্তলিপির যথোপযুক্ত আলোচনা করিতেন, তবে কখনই এই প্রকার আনুমানিক মন্তব্য প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেন না। আমার আলোচিত পরিচয়সূচক ভণিতাযুক্ত হস্তলিপির পরস্পর কোনই মিল নাই। উহা জেলার বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত, লিপিকর ভিন্ন ভিন্ন, নকলের তারিখেরও কোনই মিল নাই। পদ্মাপুরাণের যত হস্তলিপি এ পর্য্যন্ত আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহা আদ্যন্ত পাঠ ও আলোচনা করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে ঐ গুলি সঙ্গীতের জন্য সঙ্কলিত ও সংগৃহীত। যাহারা গানের জন্য কবিতার সংগ্রহ করিবে, তাহাদের প্রয়োজনের সঙ্গে কবিপরিচয় বা কবির লিখিত ভণিতাদির সম্বন্ধ অতি সামান্য। অনেক হস্তলিপিতে এমন দেখিয়াছি, নারায়ণদেব, দ্বিজবংশী, কবি জগন্নাথ, দ্বিজ মনোহর প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন কবিতা পর পর লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বশেষে একটি ভণিতার সংযোগ করা হইয়াছে, সর্ব্বশেষাংশে যাহার কবিতা আছে, ঐ ভণিতা তাহারই। এই হস্তলিপি দেখিয়া যদি কেহ নকল করে, তাহার পক্ষে বিভিন্ন লেখকের রচনার বিশেষত্ব রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই ভাবেই সাধারণতঃ কবিপরিচয়-জ্ঞাপক কবিতাংশের বিলোপ এবং ভণিতাদির বিকৃতি সাধিত হইয়াছে। তাৎকালিক পাঠক ও শ্রোতৃগণেরও এ বিষয়ে আগ্রহের নিতান্তই অভাব ছিল। এই সকল নানা কারণেই প্রাচীন হস্তলিপিতে নানা অসামঞ্জস্য ও অসাদৃশ্য সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক অন্য একটি প্রবন্ধে আমি এই সকল সমস্যার ইতি পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি(১৬)। সংগ্রাহক ও লিপিকরগণের যথেচ্ছাচার যে একমাত্র পদ্মাপুরাণের লেখকগণের পরিচয় ও ভণিতার বিলোপ ও বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা নহে, উহা দ্বারা প্রাচীনকালের লেখকগণের অনেকের রচনাই অল্পাধিক পরিমাণে বিকৃত হইয়াছে। রামায়ণরচয়িতা কৃত্তিবাস পণ্ডিতের যে বিস্তৃত আত্মপরিচয়মূলক কবিতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সরল কৃত্তিবাসের ভূমিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কৃত্তিবাসের কোনও মুদ্রিত গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হয় না। অতি অল্পসংখ্যক হস্তলিপিতেই উহা পাওয়া যায়। ঐ কবিতাংশ সম্বন্ধে দীনেশ বাবু তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ২য় সংস্করণে ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর আরও কতকগুলি প্রাচীন পুথিতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি পুথিতেও আমরা এই

(১৬) আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশার্থ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

বিবরণটি পাইয়াছি। এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত বলা উচিত যে, স্বর্গীয় হারাধন দত্ত মহাশয়ই আমার বিশেষ আগ্রহনিবন্ধন তাঁহার স্বীয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের একখানি প্রাচীন পুথি খুঁজিয়া এই আত্মবিবরণ আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার রচনা ও ভাব অতিসুন্দর, স্বভাবের প্রতিবিম্বের ন্যায় যিনি ইহা একবার পড়িবেন, তাঁহাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এটি একখণ্ড খাঁটি ঐতিহাসিক স্বর্ণ(১৭)।" এ বিষয়ে যোগেন্দ্রবাবুও তুল্যরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন। দীনেশ বাবু ও যোগেন্দ্র বাবুর সঙ্কলিত কবিতাংশ আমরা এতদঞ্চলে প্রাপ্ত কৃত্তিবাসের একখানা হস্তলিপিতেও পাই নাই। অধিকাংশ হস্তলিপিতে না থাকিলেও উহার সত্যতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহ কোনও রূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। কৃত্তিবাসের পরিচয় অধিকসংখ্যক পুস্তকে না পাওয়ার কারণ সম্বন্ধে বিরজাবাবু কি মীমাংসা করেন, আমাদের জানিতে বাসনা। তাঁহার বর্ত্তমান মত স্বীকার করিতে হইলে উহাকেও প্রক্ষিপ্ত বা কৃত্তিবাসের বংশধরগণের কীর্ত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কেবল প্রাচীন বাঙ্গালা হস্তলিপিতেই যে এই প্রকার অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, সংস্কৃত গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিপি বা হিন্দী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন হস্তলিপি যাহারই কেন আলোচনা করা যাউক না, তাহাতেই ঐ প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং ইংলণ্ড হইতে সংস্কৃত প্রাচীন হস্তলিপির সে সকল বিবরণী (Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts) প্রকাশিত হইয়াছে, এবং কাশীনাগরীপ্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রাচীন হিন্দী হস্তলিপির কয়েকখণ্ড বিবরণী আলোচনা করিলেই বিরজাবাবু আমাদের কথার সত্যতা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ঐ সকল বিবরণী সম্পাদক বা সংগ্রাহকগণের একজনও বহুসংখ্যক হস্তলিপিতে যাহা নাই, গ্রন্থকারের পরিচয় বা গ্রন্থের রচনাকালাদি সম্বন্ধের এমন কোনও নূতন কথা কোন দুই একখানি হস্তলিপিতে পাইলে অন্য প্রকার উপযুক্ত কারণের অসদ্ভাবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহ্য বা তাহা গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী বংশধরগণের কাহারও যোজনা বলিয়া মতপ্রকাশ করেন নাই। পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিতে প্রাপ্ত নারায়ণদেবের পরিচয়সূচক কবিতাংশ তাঁহার বংশধরগণের কীর্ত্তি এরূপ মত শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিরজাবাবু প্রবন্ধে তাহারই অনুসরণ করিয়া ঐ কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু কেহই নিজ নিজ উক্তির পরিপোষক কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। এই প্রকার গুরুতর বিষয়ে একমাত্র শুষ্ক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মতপ্রকাশ করিতে যাওয়া আমাদের মতে সঙ্গত মনে হয় না, এবং ঐ প্রকার উক্তির সত্যতাও বিন্দুমাত্র আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না।

প্রবন্ধের যে যে অংশ বিরজাবাবু তাঁহার শুষ্ক যুক্তিতর্কের সহায়তায় খণ্ডন করা শক্ত মনে করিয়াছেন সেই সেই স্থানের অবলম্বিত প্রমাণাদিতে প্রক্ষিপ্তবাদের আরোপ করিয়াছেন।

---

(১৭) বঙ্গভাষাও সাহিত্য ২য় সংস্করণ ১০৫ পৃষ্ঠা।

৬৬ পৃষ্ঠায় তিনি আমার সঙ্কলিত পদ্মাপুরাণের পরস্পর অসংলগ্ন কবিতা সম্বন্ধে "পরস্পর যে গরমিল তাহা নকলের দোষে" এই সত্য স্বীকার করিয়াও পরেই আবার লিখিয়াছেন "মিথ্যার একটি প্রমাণ এই যে, ইহার অন্যত্র বিরুদ্ধ কথা পাওয়া যায়। নারায়ণদেবের জন্ম "মগদ" যদি হয়, তবে পূর্ব্বপুরুষ "রাঢ়" ত্যজিয়া বোরগ্রামেতে আসেন কেমন করিয়া?" মগধ সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর উক্তির সমালোচনা করিতে যাইয়া তিনি রহস্যময়ী ভাষায় লিখিয়াছেন—"রাজনৈতিক কোনও অপরাধে একাধিকবার নারায়ণদেব দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন কি না, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই।" এই মগধসমস্যার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামনাথ বসু সৌরভ-পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য নিম্নে লিখিতেছি—পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিতে এই "মগদ" শব্দ মাগধ, মগধ, মগদ ইত্যাদি নানা ভাবেই আমরা পাইয়াছি। বহুসংখ্যক হস্তলিপি পর্য্যালোচনায় উহার "মগদ" পাঠটিই আমাদের মতে প্রকৃত পাঠ বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছে। নারায়ণদেবের স্বহস্তলিখিত গ্রন্থ যাহা নারায়ণদেবের বংশধরগণের নিকট হইতে লইয়া ৺মহেন্দ্রলোচন দে শ্রীগগণচন্দ্র হোম মহাশয়কে দিয়াছিলেন, উহার আলোচনা করিয়া গগণবাবু প্রথম বৎসরের নব্যভারতে নারায়ণদেব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে "নারায়ণদেবে কয় জন্ম মাগধ" এই পাঠ দেখা-যায়। এই "মাগধ" শব্দের "কবি" অর্থই গগণবাবু সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন, এবং পাদটীকায় উহার ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছিলেন। "জন্ম মাগধ = মাগধ, বন্দী, স্তুতিপাঠক, কবি, জন্মকবি।" সংস্কৃত কোষ গ্রন্থে মাগধ শব্দের তুল্যরূপ অর্থই দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মাপুরাণ পদ্মা বা মনসার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক গ্রন্থ। উহাতে পদ্মারই নানা প্রকার মহিমা প্রকটিত হইয়াছে। ঐরূপ দেবমাহাত্ম্যমূলক গ্রন্থের রচয়িতার পক্ষে মাগধরূপে স্বীয় পরিচয় দেওয়াই অতিমাত্র স্বাভাবিক। এই গ্রন্থও তিনি মনসার আদেশেই রচনা করিয়াছেন। লিপিকরমাহাত্ম্যে ঐ মাগধশব্দ, মগধ, মগদ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াই যত সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। এই শব্দকে দেশবাচক বলিয়া না ধরিলে আর কোনই গোল থাকে না। মাগধ নারায়ণদেবের পূর্ব্বপুরুষের বাস ত্যজিয়া বোরগ্রাম বাসেও কোনই সঙ্কট উপস্থিত হয় না। মাগধের এই সরল অর্থ স্বীকার করিলে তৎসঙ্গে সকল সমস্যারই উপযুক্ত মীমাংসার পথ পরিষ্কার হয়। ঐ শব্দের মাগধ অর্থ হইলে তাঁহার শ্রীহট্ট-সংস্রবের প্রমাণের জন্য যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, উহারও পরিসমাপ্তি ঘটে। নারায়ণদেবকে শ্রীহট্টবাসিরূপে প্রমাণিত করিবার জন্য বিরজাবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যথেষ্ট যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। এই সকল তর্কে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীহট্টে মগধ নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। শ্রীহট্টের মগধের নাম কামাখ্যাতন্ত্রে আছে।" প্রমাণ বৈদিকসংবাদিনীধৃত কামাখ্যাতন্ত্রের নিম্নলিখিত শ্লোক—

"ত্রিপুরা কৌকিকা চৈব জয়ন্তী মণিচন্দ্রিকা।
কাছাড়ী মাগধী দেবী অসমী সপ্তপর্ব্বতা॥"

এই বচনে দেখা যাইতেছে, মাগধী নামে একটি পর্ব্বত কামরূপ বা কামাখ্যাদেশে আছে, কিন্তু এমন কথা উহাতে কিছু নাই, যাহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি এই পর্ব্বত হইতে তথায় তন্নামে একটা খণ্ডরাজ্যও স্থাপিত হইয়াছিল। বৈদিকসংবাদিনী অথবা কামাখ্যাতন্ত্র আমরা দেখি নাই। উহাতে কি প্রসঙ্গে, কি ভাবে ঐ বচনের উল্লেখ আছে, তাহা না দেখিয়া উহার গুরুত্ব-স্বীকার করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বোক্ত কামাখ্যাতন্ত্র বচনের পোষকপ্রমাণরূপে স্বীয় গ্রন্থে অচ্যুতবাবু শ্রীহট্টের রঘুনাথ কবির বাগাম্বর নামক পাঁচালীর "শ্রীহট্ট নগরে বাস মগধ নৃপতি" এই কবিতাংশের উল্লেখ করিয়াছেন। বিরজাবাবুও এই সকল প্রমাণ স্বীয় প্রবন্ধে প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। বাগাম্বর কবিতার নায়ক "চন্দন চামর যোগানের আদেশ প্রাপ্ত হীরানন্দ সাধু" সোণামুখী কেরুয়াল (সোণামুখী নৌকা) সাজাইয়া চন্দন চামর জন্য যাত্রা করিয়া পথে ত্রিপুরা রঙ্গপুর প্রভৃতি অতিক্রমপূর্ব্বক বিরাটপাটনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিরাট পাটনাধিপের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—

"শ্রীহট্ট নগরে বাস মগধ নৃপতি।
চিরকাল করি তার রাজ্যেতে বসতি।"

বিরজাবাবু লিখিয়াছেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই মাগধী পর্ব্বত লাউড়ের পাহাড় মগধ-রাজ্য লাউড়। নগর শ্রীহট্ট অঞ্চলের এই মগধরাজ্যের রাজধানী অতএব শ্রীহট্টনগরে বাস মগধ নৃপতি ইহার অর্থ শ্রীহট্ট অঞ্চলের "নগর" নামক স্থানে মগধ নৃপতি (লাউড় রাজ্যের রাজা) বাস করিতেন।" মাগধীপর্ব্বত লাউড়ের পাহাড়, মগধরাজ্য লাউড়, নগর ঐ রাজ্যের রাজধানী ইত্যাদি উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপাদন করাই তাঁহার উচিত ছিল। "নগর নামটিতে প্রাচীনত্ব আছে এবং দেখিতেও একটি পুরাতন বসতি বলিয়াই বোধ হয়" ইহাও বিরজাবাবুর শুষ্ক অনুমান মাত্র। ইহার প্রমাণ তিনি উপস্থিত করেন নাই। যেরূপ খুটিনাটিভাবে প্রত্যেক বিষয় ধরিয়া তিনি অপরের প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছেন এবং সকল বিষয়ের প্রমাণ চাহিয়াছেন নিজের প্রবন্ধেও তাহা অনুসরণ করা উচিত ছিল। বোরগ্রামের প্রাচীনত্বাদি সম্বন্ধে তিনি দলিল পত্র প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন কিন্তু লাউড়রাজ্য ও তৎরাজধানীরূপে কথিত নগর গ্রামের প্রাচীনত্বাদি সম্বন্ধে কোনও প্রমাণের উপস্থিতি প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই। বাগাম্বরের কবিতার "শ্রীহট্টনগরে বাস মগধ নৃপতি" অর্থ আমরা শ্রীহট্টনামক নগরবাসী মগধ নামীয় নৃপতি করিতে চাই। কবিতাংশ পাঠ করিলে এইরূপ অর্থই সাধারণতঃ মনে আসে। এ বিষয় তত্ত্বনিধি মহাশয়ের ও বিরজাবাবুর ব্যাখ্যা সরল নহে। মগধ এই শ্রেণীর নাম প্রাচীন কালে যথেষ্ট দেখা যাইত কুলপঞ্জী ও ঘটক কারিকা প্রভৃতিতে অনুসন্ধান করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ মিলিবে। শ্রীহট্টে মগধ নামে কোনও নৃপতি কোনও দিন বাস করেন নাই

ইহার কিছু প্রমাণ কি বিরজাবাবু দিতে পারেন? যতদিন ইহার উপযুক্ত বিরুদ্ধ প্রমাণ দেখিতে না পাইব ততদিন বাগাম্বরের ঐ কবিতাংশকে আমাদের মতেরই সমর্থক বলিয়া মনে করিব। যে বাগাম্বরের কবিতাংশকে বিরজাবাবু অকাট্য বলিয়া মনে করিয়াছেন অচ্যুতবাবু যে তাহার বর্ণিত বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যমতাবলম্বী ও আস্থা সম্পন্ন হইতে সমর্থ হন নাই, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তেই তাহার আভাস আছে। বৈদিকসংবাদিনীও শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক কুলপঞ্জী গ্রন্থ সুতরাং উহার সকল কথাও যে খুব বিশ্বাস যোগ্য এরূপও মনে হয় না। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "এই গ্রন্থ কতদূর বিশ্বসনীয় তাহাও বলিতে পারি না(১৮)।"

প্রবন্ধের ৬৮ পৃষ্ঠায় অচ্যুতবাবুর ১৩১০ সালের নব্যভারতের প্রবন্ধ লইয়া বিরজা বাবু যথেষ্ট আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"নারায়ণ দেবকে ময়মনসিংহের বোরগ্রামের অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি কি প্রকারে তৎপ্রণীত "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে" নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিলেন?—"ময়মনসিংহ যে কবিকে লইয়া গৌরব করিতে প্রয়াসী জলসুকা পরগণার নগর গ্রামে সেই নারায়ণদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং তথা হইতে সন্নিকটবর্ত্তী বোরগ্রামে গমন করেন, ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, অতএব নারায়ণদেব প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্টের লোক। ইহা অচ্যুতবাবুর ৮ বৎসর পরের কথা। "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ। বিশেষতঃ এই ৮ বৎসরই অচ্যুতবাবু শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণয়নের জন্য উপকরণ-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন।" ইহা পাঠ করিয়া প্রথমতঃ আমি একটু গোল-যোগে পড়িয়াছিলাম। কারণ তখন পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত আমার অপঠিত ছিল। এই প্রবন্ধ রচনার পূর্ব্বেই আমি উহার পাঠ শেষ করিয়াছি, এবং দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি "নারায়ণদেব প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্টের লোক" বিরজাবাবুর কথিত ইহার অকাট্য প্রমাণ ঐ গ্রন্থের আদ্যন্ত খুঁজিয়াও পাই নাই। বিরজাবাবু তাঁহার প্রবন্ধে কামাখ্যাতন্ত্রের যে বচন ও বাগাম্বরের কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন, এ বিষয়ের তদ্‌তিরিক্ত প্রমাণ কিছুই উহাতে নাই। নব্য-ভারতের প্রবন্ধ সংশ্রবে অচ্যুতবাবুর নিম্নলিখিত পত্রাংশ বিরজাবাবু তাঁহার প্রবন্ধের অঙ্গীভূত করিয়াছেন—"পদ্মাপুরাণ সেই স্থানেই (পাথারিয়া পরগণার কাঁঠালতলী গ্রাম) পাইয়া দুই চারিটি নোট আনিয়াছিলাম। তারিখ ঠিক ৩০০ বৎসর কিনা মনে নাই, কিন্তু পুথি খুব পুরাতন ছিল, ৩০০ বৎসর অঙ্কটা হয়তো ছাপার ভুলও হইতে পারে। কিন্তু যদি অক্ষরে 'তিনশত বৎসর' লেখা থাকে তবে উহা বলা চলে না। গত রথের পর এই পদ্মাপুরাণ খানি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। হস্তান্তরিত হওয়ায় উহা আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, নারায়ণ কবি শ্রীহট্টের। আমি নব্য-ভারতে যদি পূর্ব্বে ইঁহাকে ময়মনসিংহবাসী বলিয়া থাকি সে পরের কথা শুনিয়া।"

(১৮) রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইহার পর বর্ত্তমানবর্ষের অগ্রহায়ণ মাসের সাহিত্য-সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ঐ সম্পর্কে তিনি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন "প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে আমরা একখানি নারায়ণী পদ্মাপুরাণ দেখিয়াছিলাম। উহা আর পাওয়া যাইতেছে না। উহা দেখার পর স্মৃতি হইতে একটা প্রবন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা কত দিনের প্রাচীন ছিল মনে হইতেছে না(৯)। এই সকলের আলোচনার সুবিধার্থ তাঁহার নব্য-ভারতের প্রবন্ধেরও প্রয়োজনীয়াংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ১৩১০ সনের নব্য-ভারতে "বারুণী স্নান" নামক প্রবন্ধের প্রসঙ্গাধীন অচ্যুতবাবু লিখিয়াছিলেন "২। দ্বিতীয় গ্রন্থ খানির নাম পদ্মাপুরাণ রচয়িতার নাম নারায়ণ দেব। এই গ্রন্থখানিও অতি প্রাচীন। **তিনশত বর্ষের প্রাচীন** প্রতিলিপি খানি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। নারায়ণ দেব পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন কবি, **নিবাস ময়মনসিংহের বোরগ্রামে।** তিনি স্বীয় গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত রূপে পরিচয় দিয়াছেন —

নারায়ণদেবে কহে জন্ম মাগধ। পিতামহ উদ্ধব মোর নরসিংহ পিতা।
বিপ্র পণ্ডিত নহি ভট্ট বিশারদ॥ মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥
শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎকায়স্থ ঘর। পূর্ব্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধমতি।
মদ্‌গল্য গোত্র মোর গায়ণ গুণাকর॥ রাঢ় ত্যজিয়া বোর গ্রামেতে বসতি॥

নব্যভারত, ১৩১০ শ্রাবণ।

তত্ত্বনিধি মহাশয় যখন এই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তখন নারায়ণদেব সম্বন্ধীয় শ্রীহট্ট-সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। সুতরাং তখন এ বিষয়ে প্রকৃত কথা লেখাই তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। তখন অপরের কথা শুনিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের বিপরীত কিছু লিখিয়াছিলেন উহা পাঠ করিয়া এরূপ বুঝিতে পারা যায় না। ১৩১৫ সনে কেদার বাবুর পত্রের উত্তরে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই আমরা প্রথম ঐ সমস্যার সাক্ষাৎ লাভ করি। তখন ঐ মতের প্রসার শ্রীহট্টে বেশীদূর বিস্তৃত হয় নাই। ঐ মত দুই একজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার কারণ রঙ্গপুর-পরিষৎ পত্রিকায় আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পর উপস্থিত হইয়াছে। অপরের কথা শুনিয়া যদি তত্ত্বনিধি মহাশয়ের কোনও বিষয়ে মত প্রকাশের কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা এই সময়েই হইয়াছে। তিনি যখন শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন তখন পর্য্যন্ত যে, ঐ প্রকার মত প্রকাশের কারণ তাঁহার উপস্থিত হয় নাই তাহা আমরা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়াই বুঝিয়াছি। তত্ত্বনিধি মহাশয় নব্যভারতের প্রবন্ধ যে, অপরের প্রভাববর্জ্জিতভাবে হৃদয়ের সরল বিশ্বাস অনুযায়ী প্রকৃত সত্য প্রচারের জন্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা যাঁহারা উহা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষভাবেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ঐ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন তাহাও

(১৯) সাহিত্যসংবাদ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২২০ পৃষ্ঠা।

যে অপর কোনও প্রচ্ছন্ন-শক্তির প্রবল প্রভাবের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে তাহাও আমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। উহা যে আত্ম-প্রত্যয়-বিরুদ্ধ ও অনিচ্ছাকৃত তাহাও ঐ মন্তব্যের একটির সহিত অপরটির তুলনা করিয়াই আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। নব্যভারতের ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদের ফলে উহার গুরুত্বের হ্রাস না হইলে শ্রীহট্টের সাহিত্যিকগণের আলোচনা ও গবেষণার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে না বলিয়াই যে, অচ্যুত বাবু এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশে বাধ্য হইয়াছেন তাহাও আমরা সামান্য প্রয়াসেই বুঝিতে পারিয়াছি। উপযুক্ত প্রমাণপ্রয়োগে তাঁহার এই সমস্যার মীমাংসা করিতে সক্ষম হইলে যে, কখনই তিনি এই প্রকার বক্র পন্থা অবলম্বন করিতেন না তাহাও আমরা না বুঝিয়াছি এমন নহে। তত্ত্বনিধি মহাশয় যথেচ্ছ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যত সহজে বিষয়টির মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন, আমরা উহাকে তত সহজ মনে করিতে পারিতেছি না। জীবনে মত পরিবর্ত্তন প্রায় সকলেই করিয়া থাকেন। দেশের ও বিদেশের সাহিত্যিকগণের জীবনে প্রায় সর্ব্বদাই উহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিভাগে অনুসন্ধানের দ্বারা অভিনব সত্যের আবিষ্কারের ফলে মত-পরিবর্ত্তন না করিয়া সকল সময় পারা যায় না। যখন সে প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন সরলভাবে তাহার কারণ উল্লেখ করিয়াই লোকে মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। তত্ত্বনিধি মহাশয়ের ন্যায় মত পরিবর্ত্তনে এরূপ অভিনব বৈচিত্র্যের পরিচয় কেহই কখনও দেন নাই। তিনি যে প্রকার সঙ্কোচের সহিত নব্যভারতের লেখার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা না করিয়া যদি দৃঢ়তার সহিত উহা তাঁহার ভ্রম একথা স্বীকার করিতেন তাহা হইলে কাহারই কিছু বলিবার থাকিত না। বিরজা বাবুর পত্রের উত্তরে তত্ত্বনিধি মহাশয় বলিয়াছেন "পদ্মাপুরাণ সেই স্থানে (পাথারিয়া পরগণার কাঁঠালতলী গ্রাম) পাইয়া দুই চারিটি নোট আনিয়াছিলাম, এবং তাহাই নব্যভারতের প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম।" পরে সাহিত্য-সংবাদের প্রবন্ধে ঐ কথার প্রত্যাহার করিয়া লিখিয়াছেন—"প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা একখানি নারায়ণী পদ্মাপুরাণ দেখিয়াছিলাম, উহা দেখার পর স্মৃতি হইতে একটা প্রবন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম (২০)। ইহাতে নব্যভারতের নাম পর্য্যন্ত করা হয় নাই। পূর্ব্বের উক্তির সহিত পরের উক্তির মিল অতি সামান্য। "Note" এই ইংরেজী শব্দের অর্থ অনুসন্ধানে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে কাগজ কলমের সহিতই উহার সম্বন্ধ স্মৃতির সহিত কোন সংস্রব বুঝিতে পারি নাই। স্মৃতির সহায়তায় কোনও 'নোট' আনা যায় অভিজ্ঞেরা কেহ এমন কথা বলেন না। লিখিত বিষয় হইতে যাহা লেখা যায় তাহার গুরুত্ব অধিক এবং তাহা অস্বীকার করাও সহজসাধ্য নহে, কিন্তু স্মৃতি সেরূপ নহে, সকল সময় অবিকল সত্য প্রকাশেও স্মৃতি বাধ্য নহে। এই জন্যই কি স্মৃতির

(২০) সাহিত্য-সংবাদ ১৩২০ অগ্রহায়ণ।

স্কন্ধে সকলপ্রকার দায়িত্বের আরোপ করিয়া তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীহট্টের সম্মান রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? অথবা ইহা তাঁহার পরবর্ত্তী অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফল ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া আমরা বিশেষ বিব্রত হইয়াছি? প্রথমবারের মন্তব্যে তারিখ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "তারিখ ঠিক ৩০০ বৎসর কি না মনে নাই। কিন্তু পুঁথি খুব পুরাতন ছিল, ৩০০ বৎসর অঙ্কটা হয়তো ছাপার ভুলও হইতে পারে। কিন্তু যদি অক্ষরে "তিন শত বৎসর লেখা থাকে, তবে উহা বলিলে চলিবে না" এ সম্বন্ধে পরে বলিয়াছেন "উহা কত দিনের প্রাচীন ছিল, মনে হইতেছে না।" এই পরস্পর বিসম্বাদী দুইটি কথার মধ্যে কোনটিকে সত্য বলিয়া মনে করিব? বিরজা বাবুর উক্তি "পরস্পর বিরোধী দুইটি কথার মধ্যে উভয়টি সত্য হইতে পারে না" এ স্থলেও খাটে না। পরস্পর-বিরুদ্ধ দুইটি উক্তির উভয়টিই যে সত্য হইতে পারে তাহা রামনাথবাবু তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন(২১)। এ স্থলে সেইভাবে দুইটিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং দুইটিকেই ভ্রম বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইতেছে। ৩০০ অঙ্কটা ছাপার ভুল নহে নব্যভারত হইতে নকল করার সময় অক্ষর দ্বারা না লিখিয়া অঙ্কদ্বারা লিখিয়াই আমি ঐ ভ্রম ঘটাইয়াছিলাম। নব্যভারতে ঐ স্থলে অক্ষর দ্বারাই "তিন শত বৎসর" লেখা আছে। অচ্যুতবাবু এই সকল মন্তব্য প্রকাশ করার সময় নব্যভারতখানা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই সব বুঝিতে পারিতেন। আর দেখিয়াও যদি ঐ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে কারণ সহ তাহা লিপিবদ্ধ করিলেই মহত্ত্ব প্রকাশিত হইত। প্রথম মন্তব্যে ৩০০ বৎসরের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও "পুঁথি খুব পুরাতন ছিল" বলিয়াছিলেন। এই খুব পুরাতন শব্দের প্রসার ৩০০ শত বৎসর না হইলেও উহার খুব কাছাকাছি বলিয়া অনুমান করিলেও করা যাইত; উহাদ্বারা নব্যভারতে প্রকাশিত প্রবন্ধের সত্যতাও কতকটা অনুমান করা না যাইত এমন নহে। তাই শেষ মন্তব্যে নব্যভারতের নাম একেবারেই পরিবর্জ্জিত হইয়াছে এবং "উহা কতদিনের প্রাচীন ছিল মনে নাই" লিখিয়া 'সাপ মারার পরও যে লেজটুকু' ছিল তাহাও নিঃশেষ করিয়াছেন। এক্ষণে অচ্যুতবাবু যে মত প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা যদি তাঁহার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত ও স্বাভাবিক হইত, তবে শ্রীহট্টের ইতিহাসেই আমরা উহার আভাস পাইতাম। নব্যভারতের প্রবন্ধ প্রকাশের অনেক পরে তিনি শ্রীহট্টের ইতিহাস লিখিয়াছেন। শ্রীহট্টের ইতিহাসে যখন তিনি মগধ-সমস্যা লইয়া বিব্রত ছিলেন, তখন নব্যভারতের প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রমাণের সংশোধন করা উচিত ছিল, সে সকলের কিছুই তিনি করেন নাই। এই সকল দেখিয়াই তাঁহার বর্ত্তমান মন্তব্য সরল ও স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা অপারগ।

(২১) সৌরভ ২য় বর্ষ মাঘ ১৩২০

ত্রিপুরা শশীদল গ্রামের কবি জগচ্চন্দ্র সেন মহাশয়ের গৃহস্থিত পদ্মাপুরাণে শ্রীহট্টের প্রচলিত 'উবানালে', 'জোকার' প্রভৃতি দুই একটি শব্দ পাইয়া তত্ত্বনিধি মহাশয় নারায়ণ দেবের শ্রীহট্টবাসীত্বের দৃঢ় প্রমাণরূপে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ শাব্দিক প্রমাণের মূল্য অতি কম এবং উহা তাঁহাদের কথিত সমস্যার সমাধান পক্ষেও বিশেষ অনুকূল নহে তৎসম্বন্ধে একটি প্রবল সাহিত্যিক নজির দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে উল্লেখ করিলাম। ইতি পূর্ব্বে ময়মনসিংহ আটীয়া পরগণায় কবি মুকুন্দের "জগন্নাথবিজয়" গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া টাঙ্গাইলের শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় কবিকে ভাষা বিচারে ময়মনসিংহবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ভাষার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে সেই নির্দ্দেশ যে খুব অসঙ্গত হইয়াছিল এমন বলিবার উপায় ছিল না। কিন্তু ঐ অবস্থাতেও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় রসিক বাবুর দাবি অগ্রাহ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"প্রবন্ধলেখক তাঁহার সংগৃহীত কবি মুকুন্দের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমার বিশেষ বক্তব্য আছে। এখনও যেমন কলিকাতা ও ঢাকা-অঞ্চলের কথিত ভাষায় প্রভেদ আছে, পূর্ব্বকালেও সেইরূপ ছিল। যে কোন গ্রন্থকার যে কোনও জেলার লোক হউন না কেন, তাঁহার গ্রন্থ ভিন্ন জেলার লোক দ্বারা পরবর্ত্তীকালে লিখিত হইবার সময় সেই স্থানের প্রচলিত ভাষানুসারে একটুকু রূপান্তরিত হইয়াছে, ইহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। প্রায় দুইশতবর্ষের পূর্ব্বের দুইখানি শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের পুথি দেখিয়াছি, তাহার একখানি বর্দ্ধমান অঞ্চলের লোকের লেখা, অপর খানিতে ত্রিপুরাবাসীর হস্তাক্ষর। গ্রন্থখানি এক ব্যক্তির রচনা হইলেও বর্দ্ধমানের পুথিতে রাঢ়ের ভাষার রূপ, আর ত্রিপুরার পুথিতে তদ্দেশ প্রচলিত ভাষার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য কবি মুকুন্দের "জগন্নাথ-বিজয়" সম্বন্ধে সেইরূপ ঘটিয়াছে। রসিকবাবু ময়মনসিংহ জেলাস্থ আটিয়া পরগণার পুথিতে তৎস্থানীয় লৌকিক ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া কবি মুকুন্দকে আটীয়া পরগণার লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটীর ও আমার নিজের সংগৃহীত কবি মুকুন্দের দুইখানি পুথিতে ঐরূপ প্রাদেশিক (অর্থাৎ ময়মনসিংহ অঞ্চলের) ভাষার আদৌ প্রয়োগ নাই। এই পুথি দুইখানি দক্ষিণ রাঢ়ের ভাষায় লিখিত। ইহাও জানান উচিত যে, রসিকবাবুর পুথি ও সোসাইটীর পুথি প্রায় এক সময়ে লেখা। এরূপস্থলে, রসিকবাবু আটীয়ার পুথি দেখিয়া কবি মুকুন্দকে যেমন ময়মনসিংহের লোক বলিতেছেন, আমরাও সেইরূপ অন্য দুইখানি দেখিয়া তাঁহাকে দক্ষিণরাঢ়ের লোক বলিতে পারি। এইজন্য আমার মত এই যে, গ্রন্থকারের স্বহস্তের লেখা গ্রন্থ ভিন্ন অপরের লেখা গ্রন্থের ভাষা ধরিয়া গ্রন্থকারের জন্মভূমি নির্দ্দেশ করা সহজ নহে(২২)।" নগেন্দ্রবাবুর এই মত আমাদের নিকট সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই মনে হয়। বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত পদ্মাপুরাণের হস্তলিপি আলোচনায় ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই দেখিতে

(২২) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩০৭ সন, ২০০ পৃষ্ঠা।

পাইতেছি। একমাত্র শব্দের সাদৃশ্যে নির্ভর করিয়া যে, কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিরাপদ নহে, তাহা নগেন্দ্রবাবুর মন্তব্য প্রকাশের অনেক দিন পরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ময়মনসিংহ ধারীশ্বরের কবি গঙ্গারামের "মহারাষ্ট্র পুরাণ" লইয়া যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছিল তাহা দ্বারাও বুঝিতে পারা গিয়াছে। রসিকবাবু তাঁহার প্রবন্ধে বহুসংখ্যক শব্দের আলোচনা করিয়া কবি মুকুন্দকে ময়মনসিংহবাসীরূপে প্রমাণিত করিয়াও রীতিমত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু তত্ত্বনিধি মহাশয় এ বিষয়ে দুইটির অধিক শব্দ উদ্ধৃত না করিয়াই নিজ সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বিরজাবাবু ঐ দুইটি শব্দের অন্যতর "জোকার" শব্দটি লইয়া যে প্রকার বিচার-বিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার বাঙ্গালার অন্যান্য জেলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। জোকার শব্দ পাবনা, বগুড়া, রাজসাহী, রঙ্গপুর প্রভৃতি বাঙ্গালার অধিকাংশ জেলাতেই প্রচলিত সাধারণ শব্দ। সুতরাং উহাকে লইয়া শব্দ-সাদৃশ্যের কোনও রূপ বিচার চলিতে পারে না। বিরজাবাবু তাঁহার প্রবন্ধের ৬৮ পৃষ্ঠায় ত্রিপুরার পুথি হইতে সংগৃহীত (১) ও (২) চিহ্নিত দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন, উহার সহিত ময়মনসিংহের পুস্তকের পাঠের সম্পূর্ণ মিল নাই। ময়মনসিংহের পুথির পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) উবাপাকে কাপড় পড়ে কেশ মোকাইয়া
ঝাড়িতে লাগিল পদ্মা আগু মন্ত্র দিয়া।
(২) উবা নালে মন্ত্র পড়ে কেশ মোকাইয়া
ঝাড়িতে লাগিল পদ্মা আগু মন্ত্র দিয়া।
শূন্যে উপজিল বিষ শূন্যে যাউক খাইয়া
বায়ু যে গিলিল তারে শূন্য মধ্যে পাইয়া।

কাম নিরঞ্জন বিষ নিরঞ্জন কাম
যেহি নালে উঠিয়াছে বিষ সেহি নালে নাম।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বিষ নাম সুশর্ম্মনা
ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়া বিষ তোমার স্থাপনা।
নাম নাম আরে বিষ ত্রিবেণী দুয়ারে
ত্যেজিয়া শ্রীহট্টপুর নাম বঙ্ক নালে।

*   *   *   *   ১১৭৭ সনের হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ।

উদ্ধৃতাংশদ্বয় পদ্মাপুরাণে, দেবপুরে লখীন্দরের প্রাণদান-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা বিষ ঝাড়ার মন্ত্রের অংশ। উহাতে উল্লিখিত শ্রীহট্টপুর, ত্রিবেণী প্রভৃতি শব্দ দেহতত্ত্বঘটিত সাঙ্কেতিক শব্দ। বিষ নামান, ভূত ছাড়ান প্রভৃতির মন্ত্রের ভিতর এই প্রকার দুর্ব্বোধ্য শব্দের প্রয়োগ বহুলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সকল স্থানের অর্থও এখন রীতিমত হয় না। সঙ্কলনের সময় উহা অর্থযুক্ত থাকিলেও এখন "সাত নকলে আসল খাস্ত" হইয়া পড়িয়াছে। তত্ত্বনিধি মহাশয় ঐ কবিতার আগাগোড়া বাদ দিয়া মাত্র "ত্যজিয়া শ্রীহট্টঘর নাম বঙ্ক নালে" এই অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং উহাতে উল্লিখিত "শ্রীহট্টঘর" কে শ্রীহট্টপ্রদেশরূপে প্রমাণের জন্য যত্ন করিয়াছেন। এ চেষ্টা তাঁহার কতদূর সঙ্গত হইয়াছে তাহার বিচার ভার সাহিত্যিকগণের উপর। তত্ত্বনিধি মহাশয়ের সঙ্কলিত তৃতীয় কবিতাংশ—

(৩) প্রথমে শ্রীহট্টদেশ, ভ্রমিয়াছি বিশেষ
কামরূপ কামাখ্যা নিলগিরি

ত্রিপুরা জৈন্তাজয় কলঙ্ক, ভ্রমিয়াছি নানারঙ্গ
গৌড়মণ্ডল আদি করি।

আমি ময়মনসিংহের বা ভিন্ন জেলা হইতে সংগৃহীত এবং আলোচিত কোনও পুথিতে ইহা দেখি নাই। এই কবিতাংশও তত্ত্বনিধি মহাশয় কৌশলের সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদ্মাপুরাণের কোন অংশে কি প্রসঙ্গে তিনি উহার সন্ধান লাভ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ না করায় আলোচনার সম্পূর্ণ অসুবিধা ঘটিয়াছে। ঐ সকলের পরিষ্কার উল্লেখ থাকিলে বুঝিতে পারিতাম ঐ কবিতার গুরুত্ব কতদূর। বিরজাবাবুও সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব।

চিত্তসুখ সান্যাল মহাশয়ের সঙ্কলিত পদ্মাপুরাণের প্রাচীন হস্তলিপির

"নরসিংহ নন্দন পণ্ডিত নারায়ণ।
জ্ঞান না ধরে সে জাতিতে ব্রাহ্মণ॥"

এই কবিতাংশ সম্যক্ আলোচনা করিবার সুযোগ আমাদের এখনও ঘটে নাই। উহার আলোচনার পূর্ব্বে অনুসন্ধান আবশ্যক। বিশেষতঃ চিত্তসুখ বাবুর উল্লিখিত হস্তলিপিও আমরা এতক দেখিতে পারি নাই। অনুসন্ধান শেষ করিয়া ভবিষ্যতে সে বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। পূর্ব্ব চরণের "নরসিংহ নন্দন পণ্ডিত নারায়ণ" বিরজাবাবুর কবিবল্লভ সমস্যা সমাধানে প্রবল বাধা জন্মাইতেছে।

আমার প্রবন্ধে সঙ্কলিত পদ্মাপুরাণের বহু সংখ্যক প্রাচীন হস্তলিপি ও কয়েকখানি মুদ্রিত গ্রন্থে পরিদৃষ্ট নারায়ণদেবের পরিচয় ও উপাধি-ব্যঞ্জক—

নারায়ণদেবের জন্ম হইল বঙ্গদেশ
নরসিংহদেব পুত্র বিজ্ঞতা বিশেষ
কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ
সুকবিবল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণযুত

এই কবিতাংশের সমালোচনা করিয়া বিরজাবাবু লিখিয়াছেন "ইহা (উপরিউদ্ধৃত কবিতার শেষ দুই চরণ) লইয়া সতীশবাবু বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। এই পংক্তি দুইটি সম্বন্ধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মন্তব্যই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। একজন গ্রাম্য-কবির পক্ষে এইরূপ আড়ম্বর লেখা সম্ভব হয় কি? ইহা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী যোজনা।" এই মন্তব্যের পর তিনি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতের অনুসরণ করিয়া দৃষ্টান্ত-স্বরূপে মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রস্তাবনার উল্লেখ করিয়াছেন। বিরজাবাবুর প্রবন্ধ আগাগোড়াই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতের প্রতিধ্বনি, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মত সমীচীন বোধ করাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিরজাবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াও নূতন কয়েকখানি গ্রন্থে তুল্যরূপ কবিতারই সন্ধান লাভ করিয়াছি। নারায়ণদেবের বংশধর গগণবাবুও কিশোরগঞ্জে বিভিন্ন স্থানের পদ্মাপুরাণে ঐ শ্রেণীর কবিতা আছে বলিয়া আমাকে জানাইয়াছেন। যাহা এই ভাবে বহুসংখ্যক প্রাচীন হস্তলিপিতে পাওয়া যাইতেছে,

আনুসঙ্গিক নানা প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে, কয়েক শতাব্দী যাবৎ নির্ব্বিবাদে যাঁহারা নারায়ণদেবের বংশধর বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন তাঁহাদের উক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে, উপযুক্ত বিরুদ্ধ-প্রমাণের অসদ্ভাবে একমাত্র শুষ্ক যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। নারায়ণদেবের সুকবিবল্লভ উপাধির সমর্থক যে সকল কবিতাংশ আমরা আলোচনা করিয়াছি "ময়মনসিংহের পুস্তকের পাঠ" এই রূপ আপত্তি করিয়া বিরজাবাবু উহার গুরুত্ব-হ্রাসের প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু আমার প্রথম প্রবন্ধের ৮৩ পৃষ্ঠায় মাননীয় মুনসী আবদুলকরিম সাহেবের সঙ্কলিত প্রাচীন পুথির বিবরণ হইতে উদ্ধৃত চট্টগ্রামের পদ্মাপুরাণের—

"সুকবিবল্লভ রামদেব নারায়ণ
একটি নাচারি বলি শুন দিয়া মন"

এই কবিতাংশের সম্বন্ধে কোনই উচ্চবাচ্য করেন নাই। শ্রদ্ধেয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতের অনুসরণে "নারায়ণদেবে কয় সুকবিবল্লভ হয়।" এই কবিতাংশের "হয়" শব্দের অন্বয় লইয়া বিস্তৃত আলোচনাপূর্ব্বক বিরজাবাবু "হয়" এই শব্দ সুকবিবল্লভের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সমর্থক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং কালীকান্ত বাবুর পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মতের দৃঢ়তা সম্পাদনে যত্ন করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিরজাবাবুর ঐ আলোচনা এবং কালীকান্ত বাবুর মন্তব্য মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াও আমরা এই "হয়" কে নারায়ণদেবের উপাধির সমর্থক বলিয়াই মনে করিতেছি। আমাদের মতে ইহার অর্থ "হইয়া"। প্রথম বৎসরের নব্যভারতে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া গগণচন্দ্র হোম মহাশয় লিখিয়াছিলেন "সুকবিবল্লভ হয়" এই পদের অর্থ—"নারায়ণদেব যাহা বলেন তাহা সুকবি জনের বল্লভ অর্থাৎ প্রিয় হয়।" সুকবিবল্লভ উপাধি অর্থে গ্রহণ না করিলে এই ভাবেও উহা নারায়ণদেবের সহিতই অন্বিত হয়। মুন্সি আবদুলকরিম সাহেবের সঙ্কলিত—

সুকবিবল্লভ রামদেব নারায়ণ
একটি লাচারি বলি শুন দিয়া মন

এই ব্যাসকূটও সুকবিবল্লভ এই উপাধিরই সমর্থক। এই ব্যাসকূটের সহিত ময়মনসিংহবাসী কাহারও সংস্রব নাই, নারায়ণদেবের বংশধরগণেরও হস্তাবলেপের কোন সুবিধা ঘটে নাই। এই জন্য উহাতে একদেশদর্শিতা প্রভৃতি দোষারোপের সম্পূর্ণ সুযোগাভাব; বিশেষতঃ "নারায়ণদেবে কয় সুকবিবল্লভ হয়" এই কবিতাংশের "কয়" ও "হয়" শব্দের ব্যাখ্যা যে প্রকার সহজে চলিতে পারে ইহাতে তাহারও সম্ভাবনা নাই। এই সকল বুঝিয়াই সম্ভবতঃ বিরজাবাবু ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কয় ও হয়এর ব্যাখ্যা করিয়া, বিরজা বাবু যত সহজে ঐ সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন বিষয়টি তত সহজসাধ্য নহে। উহার প্রকৃত মীমাংসার সময় এখনও আসে নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। এপর্য্যন্ত এ বিষয়ের যতদূর অনুসন্ধান ও আলোচনা

হইয়াছে তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। এখন যে যুগ আসিয়াছে তাহা বিচারণার যুগ। এ যুগে যাহাদের দলিল নাই তাহারা মর্য্যাদাহীন। যাহার প্রমাণ অল্প বা দুর্ব্বল, যাহা ব্যাখ্যা-কৌশলে উভয় পক্ষেই প্রমাণ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অনুসন্ধান ও আলোচনা চলিতে পারে, দৃঢ়শ্বর অচল (২৩)।

প্রবন্ধের স্থানান্তরে (৭০ পৃষ্ঠায়) বিরজাবাবু আমি ঘোর প্রত্যক্ষবাদী, অনুমানবিরোধী ইত্যাদি দোষ দিয়াছেন এবং চার্ব্বাক প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। ঐ সকল যুক্তির খণ্ডন করিতে যে প্রকার বিস্তার প্রয়োজন তাহা আমার নাই। তাই এস্থলে পুরাতত্ত্ব প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত বঙ্গের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মহোদয় আমার একখানি পত্রের উত্তরে অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে কৃপাপূর্ব্বক যে উপদেশবাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। "দেখিবেন কার্য্য করিতে যাইয়া যেন উপযুক্ত প্রণালীতেই কাজ করিতে থাকেন। আপনাদের সমিতির সভ্যগণকেও প্রমাণ না পাইলে কিছু লিখিতে নিষেধ করিবেন। লিখিলেই কিন্তু প্রমাণও সঙ্গে সঙ্গে চাই, নচেৎ তাহার মূল্য কিছুই নয়।" ইহাদ্বারাই বিরজাবাবু বুঝিতে পারিবেন, অনুমান বিরোধী হওয়া গুরুতর অপরাধ নহে। যে যুগে অনুমানই লোকের সর্ব্বস্ব ছিল এ সে যুগ নহে। এ যুগে প্রমাণছাড়া কোনও বালককে কোনও কথা বলিলে সেও তাহা মানিতে চায় না।

প্রাচীন সাহিত্যক্ষেত্রে রসকদম্বের লেখক এক কবিবল্লভের পরিচয় আমরা অবগত আছি। ইহার গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিপি ময়মনসিংহেও আমরা পাইয়াছি। ইহা ছাড়াও আরও যথেষ্ট কবিবল্লভ থাকিতে পারেন। কিন্তু কবিবল্লভ থাকিলেই যে তাঁহাকে নারায়ণদেবের সহকারী ("হয়" বা "হা" করিয়া) বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিতে আমরা একেবারেই প্রস্তুত নহি। এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণের অসদ্ভাবে কেবল শুষ্ক যুক্তিতর্ক এবং অনুমানে মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ং বিরজাবাবুও সেই জন্যই কালীকান্ত বাবুর সিদ্ধান্তের সকল কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার মতের আলোচনা করিয়া বিরজাবাবু লিখিয়াছেন "ফলকথা এই ব্যাপার বড়ই রহস্যময়। জানি না কি ভাবে এই রহস্যোদ্ভেদ হইবে।" বিতর্কের বক্রপথ ত্যাগ করিয়া সত্যের সরল পথে না আসিলে এই রহস্যোদ্ভেদের সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

স্বীয় সম্পাদিত পদ্মাপুরাণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রামনাথবাবু "নারায়ণদেব পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়া যশস্বী হয়েন এবং কবিবল্লভ উপাধি লাভ করেন" লিখিয়াছিলেন, উহাতে বিরজাবাবু প্রশ্ন করিয়াছেন "গ্রন্থ-রচনা পূর্ব্বে না উপাধিলাভ পূর্ব্বে? উপাধিলাভ যদি পরে হয়, তবে সুকবিবল্লভ পদটা কি ভবিষ্যৎ উপাধি প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নারায়ণদেব গ্রন্থ মধ্যে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন? কোথা হইতে কি প্রকারে নারায়ণদেব এই

---

(২৩) সাহিত্য অগ্রহায়ণ ১৩২০

উপাধি লাভ করিলেন তাহা জানা প্রয়োজন (৭২ পৃঃ)।" এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বিরজাবাবুকে আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, এই ভাবে উপাধির উল্লেখ বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম নহে। ইতিপূর্ব্বে আরও অনেকে ঐভাবে উপাধির উল্লেখে অপরাধী হইয়াছেন। এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম আমি দামিন্যার কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর নাম করিতে চাই। তিনি গ্রন্থের সর্ব্বত্রই কবিকঙ্কণ এই উপাধিসূচক ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু এই উপাধি তিনি কবে কি ভাবে পাইয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। চণ্ডীকাব্য ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন, এ পরিচয়ও আজও পাওয়া যায় নাই। ভারতগৌরব পরলোকগত মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত এবং শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু প্রভৃতিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। দত্ত মহাশয় তাঁহার Literature of Bengal নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের উপাধি লাভের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন অথচ তিনি মুকুন্দরামের বিষয়ে বিশেষ কিছুই লিখেন নাই। রামপ্রসাদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"He (Raja Krishna Chandra Ray of Nadia) rewarded him with the Title of Kabiranjan" রায় গুণাকর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "Contemporaniously Ram Proshad Sen and equally favoured by Raja Krishna Chandra Rai—lived a more skilful poet, the talented Bharat Chandra Rai— 'a mine of talent or Gunakar', as the Raja called him. (P. 124) ঐ গ্রন্থে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি "Mukundaram who obtained the title of kabik-ankan" (P. 99) এই উপাধি কবে কি জন্য কে প্রদান করিয়াছেন এ সকল সম্বন্ধে আর কোন কথাই ঐ গ্রন্থে নাই। চণ্ডীকাব্যেও সে কথার কোনই উল্লেখ দেখা যায় না। কবি প্রমাণের উল্লেখ না করিলেও এ যাবৎ তাঁহার উপাধি প্রাপ্তিতে কেহই কোন সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। মুকুন্দরামের এই উপাধি প্রাপ্তি চণ্ডীকাব্য রচনার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল কিম্বা তিনি ভবিষ্যৎ উপাধি প্রাপ্তির প্রত্যাশাতেই উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন বিরজাবাবু তাহার মীমাংসা করিবেন। ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়াই আমি বিরত হইলাম। এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়াই আপাততঃ কবিকঙ্কন সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিব। প্রথিতযশা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পত্রেও তাহার সমর্থনার্থ, তাহার মতের অনুসরণে লিখিত বিরজা বাবুর প্রবন্ধে—

লব্ধায়ুঃ শতাব্দং দশদিন সহিতংশূদ্রকোগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥

মৃচ্ছকটিক প্রস্তাবনায় এই যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রক্ষিপ্ত বাদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্‌বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান আছে। যতদিন সে সকলের সম্যক্ মীমাংসা না হইতেছে ততদিন উহাকে প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার করা ঠিক নহে। বিশেষতঃ মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত

উহার কোনই সাদৃশ্য নাই। এমন স্থলে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনাক্ষেত্রে উহাকে দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আনয়ন করা কেবল তর্কের পরিধি বৃদ্ধি বই আর কিছুই নহে। আলোচ্য শ্লোকাংশ-সম্বন্ধে পরলোকগত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মৃচ্ছকটিক সমালোচনা প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "নান্দীর পরে প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনাটিও বিলক্ষণ কৌশলপূর্ণ। প্রস্তাবনার আরম্ভে নাটক-রচয়িতার পরিচয়। রচয়িতার পরিচয় প্রদান করিবার রীতি প্রায় সকল নাটকেই প্রচলিত আছে। পরিচয়স্থলে রচয়িতার ভূয়সী প্রশংসা থাকে। এই জন্ম কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রস্তাবনার ঐ ভাগ নাটকরচয়িতা স্বয়ং লেখেন না, তাঁহার শিষ্যাদি কেহ লিখিয়াছেন। এরূপ অনুমান যে অমূলক, তাহা ঐ পরিচয় ভাগের রচনা-প্রণালীর সহিত অপরাপর ভাগের রচনা প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিলেই উপলব্ধি হয়। * * * আর্য্য গ্রন্থকারেরা বৈদিকসংস্কারবশতঃ আপনাদের নামরূপ পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র লোকোপকার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাদি রচনা করিতে পারিতেন—নাম বাহির করিতে না পারিলে তাঁহাদের বুক ফাটিত না। তাহা ছাড়া আর একটা কথা আছে। আমাদিগের কোনও গ্রন্থকার সমাজের বর্ণনাকারীর এরূপ স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। মৃচ্ছকটিক রচয়িতা তাহা করিয়াছেন।

অবন্তিপুর্য্যাং দ্বিজস্বার্থবাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য,
বসন্তশোভেব বসন্তসেনা।
তয়োরিদং সৎ সুরতোৎসবাশ্রয়ং,
নয় প্রচারং ব্যবহার দুষ্টতাং।
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা,
চকার সর্ব্বং কিল শূদ্রকো নৃপঃ ॥"

তিনি বলিয়াছেন—'তাৎকালিক "নয় প্রচার" "ব্যবহার দুষ্টতা" "খলস্বভাব" "ভবিতব্যতা" প্রভৃতি সমুদয় বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মৃচ্ছকটিক রচনা করিয়াছেন। সমাজ-বর্ণনে প্রবৃত্ত গ্রন্থকর্ত্তৃগণ প্রায়ই স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া থাকেন।' অতএব কোন নাটকরচয়িতা সমাজের বৃহত্তমভাগ যে শূদ্রজাতি তন্নামানুসারে স্বয়ং শূদ্রক নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক আপনাকেই ক্ষত্রিয়গুণ এবং ব্রাহ্মণগুণ সমন্বিত এবং সমুদয় সমাজের প্রতিরূপ-স্বরূপ দেশ সাধারণের রাজা বলিয়া বর্ণনপূর্ব্বক নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন এরূপ মনে করিলেও করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যে নিজ মৃত্যুবিবরণও স্বমুখে খ্যাপন করিতে পারিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য উল্লিখিত কল্পনার অবলম্বনে কিছু বিশদ হইতে পারে। শাস্ত্রে বলে মনুষ্যের পূর্ণ আয়ুষ্কাল শতবর্ষ, অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, এক একটি সমাজ-প্রতিরূপের বয়স একশত বৎসর। আর মৃত্যুর পর দশদিন যে অশৌচ

কাল, সে পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির লোকান্তর গতি নাই এক প্রকার ইহলোকেই স্থিতি ; এইজন্য এক একটি সমাজ প্রতিরূপের অবস্থিতিকাল শত বর্ষ দশ দিন। সেই একশত দশদিনের পর দ্বিতীয় সমাজ-প্রতিরূপ পূর্ব্ব গত সমাজ প্রতিরূপের পুত্রস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এই জন্য মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা

রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং
লব্ধাচায়ঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং
শূদ্রোকোগ্নিং প্রবিষ্টঃ ॥" (২১)

উপাধিলাভ প্রতিভার উপর নির্ভর করে। বয়সের সঙ্গে তাহার কি সংস্রব আছে। পদ্মাপুরাণে নারায়ণদেবের অল্পবয়সের রচনা তাহা শুধু "সতীশবাবু বলিলেন না" শ্রীহট্টের অচ্যুতবাবুও নব্যভারতের প্রবন্ধে অনেকদিন পূর্ব্বে ঐ কথাই বলিয়াছেন।

বিরজাবাবু তাঁহার প্রবন্ধের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, "নারায়ণদেবের বংশধরগণের প্রদত্ত বংশ-তালিকা একটুকু সন্দেহ জনক বলিয়া বোধ হয়। সতীশবাবু বলেন বোরগ্রামের বিশ্বাসেরা নারায়ণদেব হইতে ১৭শ পুরুষ অধস্তন। রামনাথবাবুর পদ্মাপুরাণের প্রস্তাবনায় দেখা যায় যে, নারায়ণদেব হইতে তাঁহার বর্ত্তমান অধস্তন বংশধর ২০ পুরুষ ব্যবহিত। পরস্পর বিরোধী দুইটি কথার মধ্যে উভয়টি সত্য হইতে পারে না। নারায়ণদেব নিজে বলিয়াছেন

শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎকায়স্থের ঘর।
মদ্‌গল্য গোত্র মোর গায়ন গুণাকর॥

ইহাতে দেখা যায় যে, নারায়ণদেব সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশধর ছিলেন। বোরগ্রামের বিশ্বাসেরা যাহারা নিজেদের নারায়ণদেবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা দেশে বিশিষ্ট সম্মানিত কায়স্থ নহেন। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় বলেন যে, তিনি অনুসন্ধানে জানিয়াছেন যে, "বোরগ্রামে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ নাই।" এই আপত্তির উত্তরে রামনাথ বাবু লিখিয়াছেন (২২) "বিরজাবাবু বলেন, "পরস্পর বিরোধী দুইটি কথার উভয়টি সত্য হইতে পারে না।" সাধারণভাবে বলিতে গেলে, বলিব, উভয়টিই সত্য হইতে পারে। এক প্রকারে নহে একাধিক প্রকারে পারে। নারায়ণদেবের বংশধরগণ সকলেই কি সকল কালেই সমপর্য্যায়ের থাকিবেন? আজ যে গণনা হইবে, ৫০ কি ১০০ বৎসর পূর্ব্বের গণনায় তাহার ন্যূনাধিক্য হইতে পারে না কি? তৎপর যাহার বংশ সপ্তদশ অথবা বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার বংশতরু অবশ্য একাধিক শাখায় বিস্তীর্ণ হইয়াছে। সকল শাখাতেই কি পুরুষের সংখ্যা সমান হইবে? তৎপর কোন কোন পুরুষ পুত্রপৌত্রাদিসহ বর্ত্তমান থাকেন, এরূপ স্থলে

(২১) বিবিধপ্রবন্ধ ১ম ভাগ মৃচ্ছকটিক ১১১ ও ১১৩ পৃষ্ঠা

(২২) সৌরভ ২য় বর্ষ মাঘ ১৩২০।

কেহ পুত্রপৌত্রাদিসহ গণনা করেন, কেহ বা পুত্রপৌত্রাদি গণনায় ধরেন না, তাহাতেও উভয় মধ্যে সংখ্যার কম বেশী হয়, হইলেও উভয় গণনা সত্য। আমাদের উভয় গণনায় যদি কেহ ভুলও করিয়া থাকি, তাহা আমাদের একের ত্রুটি ব্যতীত নারায়ণদেবের বংশাবলীর প্রতি সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। বংশাবলী কি কখনও বিশিষ্ট-বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাইলে অগ্রাহ্য হইতে পারে? উহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, অন্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না। পিতৃ-পিতামহের নাম কি কেহ কৃত্রিম লিখিয়া থাকে?" আমার প্রথম প্রবন্ধ লেখার সময় আমি নারায়ণদেবের বংশাবলী দেখিবার সুযোগ পাই নাই। উহাতে যাহা লেখা হইয়াছিল তাহা কেদার বাবুর ময়মনসিংহের বিবরণের মতের অনুসরণেই লিখিত। কেদার বাবু লিখিয়াছিলেন "অদ্যাপি নারায়ণদেবের বংশধরগণ বোরগ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা বোরগ্রামের বিশ্বাস বলিয়া পরিচিত, এবং নারায়ণদেব হইতে ১৭শ পুরুষ অধস্তন (২৩)।" গগণবাবু ও তাঁহার নব্যভারতের প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "তাঁহার (নারায়ণদেবের) বংশাবলী দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, তিনি বর্ত্তমান কালের সপ্তদশ পুরুষ পূর্ব্বের লোক (২৪)।" সম্প্রতি নারায়ণদেবের বংশধর গগণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন "আমি নারায়ণদেবের বংশধর, আমাদের বাড়ীতে যে সকল পুরাতন দলিল পত্র আছে, তাহাতে বোরগ্রাম অনেক দিনের প্রাচীন বলিয়া দেখিতে পাই। অনেক দলিল আছে যাহা এতজ্জীর্ণ যে, সহজে পাঠ করা কষ্টকর। নারায়ণদেব হইতে আমরা ২০।২২ পুরুষ অধস্তন হইব। ৺মহেন্দ্রচন্দ্র দে আমাদের এক বংশ নহে। সে যে নারায়ণদেবের বংশধরগণের স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে তাহা মিথ্যা। এ বিষয় নানা মোকদ্দমার কাগজপত্রে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নামের উল্লেখ দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।" নারায়ণদেবের বংশাবলী ও তাহার গৃহস্থিত প্রাচীন দলিল পত্রাদির আলোচনা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃত-ভাবেই করিব। গগণবাবু আমাকে লিখিয়াছেন "আমরা দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। ময়মনসিংহের সমস্ত বড় বড় কায়স্থ ঘরের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ-বাদ আছে। কালীকান্ত বাবু কি প্রকার অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, বোরগ্রামে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ নাই বুঝিতে পারিলাম না।" বোরগ্রামের বিশ্বাসেরা নারায়ণদেবের বংশধর নহে একথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই নারায়ণদেবের বংশধর একজনকে উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা বিরজাবাবুর কর্ত্তব্য ছিল। শ্রীহট্টের স্থায় ত্যাগ করিয়া কবি নারায়ণদেব যে দরঙ্গের রাজসভা হইয়া শেষ জীবনে বোরগ্রামে আসেন একথা যাহারা বলেন তাঁহাদের কেহই নারায়ণদেবের বংশধরগণের কোনও পরিচয় উল্লেখ করেন নাই। এমত অবস্থায় বিশ্বাসেরা না হইলেও বোরগ্রামের অন্য কাহারও তাঁহার বংশধর হওয়া প্রয়োজন। বোরগ্রামের একমাত্র মহেন্দ্রলোচন দে ব্যতীত সে প্রকার

(২৩) ময়মনসিংহের বিবরণ। ১ম সংস্করণ ৬পৃষ্ঠা।

(২৪) নব্যভারত ১মবর্ষ ১২নং সন

কথা আর কেহই বলেন না। মহেন্দ্রলোচন দেবের কথা যে, সত্য নহে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নারায়ণদেবের ভণিতায় "শূদ্রকুলে জন্ম মোর সংকায়স্থ ঘর।" এই কবিতার শেষার্দ্ধ কোনও কোনও হস্তলিপিতে "ক্ষত্রকায়স্থরূপে" লিখিত আছে এই কথা গগণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন এবং বন্ধুবর কেদারবাবুও বলিয়াছেন। সম্প্রতি আলাপসিংহ পরগণায় প্রাপ্ত ১১৭৭ সনের লিখিত একখানি পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিতে আমরা প্রথম অংশেই ক্ষত্র-কায়স্থের দেখা পাইয়াছি। উহাতে লেখা আছে।—

ক্ষত্রকুলে জন্ম মোর সৎকায়স্থের ঘর।
মৎগোল্য গোত্র মর গাই গুণাকর॥

বিরজাবাবু তাঁহার প্রবন্ধে ৭৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের এক নারায়ণদেবের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "তাঁহাদের (সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় মহাশয়ের) পূর্ব্বপুরুষ এক "নারায়ণদেব" ছিলেন। তিনি ন্যূনাধিক ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে রাঢ়ের চাকদহ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহাদের গোত্রও মৌদ্গল্য। এই কথাটাতে মীমাংসার পথ আরও জটিল হইয়া উঠিবে। কবি নারায়ণের গ্রন্থে যে এই মৌদ্গল্য নারায়ণের গাঁইগোত্রাদি জুড়িয়া দিয়া 'নগর ত্যজিয়া' বোরগ্রামেতে বসতির স্থলে "রাঢ় ত্যজিয়া বোরগ্রামেতে বসতি" না হইয়াছে তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি?" সারদারঞ্জন রায় মহাশয় "এই নারায়ণ পদ্মাপুরাণ রচয়িতা কিনা বলিতে পারেন না।" এই স্পষ্ট উক্তি করার পরও কেন এই সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সারদারঞ্জনরায় মহাশয়ের ন্যায় অনুসন্ধিৎসুলেখক যিনি আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা কালিদাসের গ্রন্থাবলীর সুন্দর সহজবোধ্য সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি যে নিজের পূর্ব্বপুরুষ নারায়ণদেবের ন্যায় একজন শক্তিশালী লেখকের অস্তিত্ব থাকিতেও তৎসম্বন্ধে কোনই আলোচনা অথবা গবেষণা করেন নাই ইহা আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারি না। নাম বা গাঁইগোত্র মিলিলেই অথবা রাঢ় হইতে আসিলেই যে তাহাকে পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে বর্ত্তমান সময়ে বালকেও এরূপ যুক্তির প্রয়োগে সঙ্কোচ বোধ করে। নারায়ণদেবের বংশাবলীতে মাতামহের নাম নাই কেদারবাবু যদি উহা আছে বলিয়া লিখিয়া থাকেন তাহা তাঁহার ভ্রম। লিপিকর মাহাত্ম্যের ফলে পদ্মাপুরাণের হস্তলিপিতে নারায়ণদেবের পিতামহ প্রভৃতির নামের গোলযোগ ঘটিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা গোলযোগ বৃদ্ধপিতামহের নাম লইয়া। অন্যান্য অংশে বেশী অমিল নাই। পিতা পিতামহ প্রভৃতির নামের মিল থাকা সত্বে বৃদ্ধপিতামহের নামের গোলযোগ থাকাকে খুব একটি গুরুতর ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহা অপেক্ষাও অনেক গুরুতর অসামঞ্জস্য নির্ব্বিবাদে বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। তাহার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথাই বলেন নাই। উহার উল্লেখ দ্বারাই এবারকার মত এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। বিষয়টি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধীয়।

কবিকঙ্কণ স্বীয় গ্রন্থে ভণিতা দিয়াছেন—

দিবানিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দকবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে ।
উরগো কবির কামে কৃপাকর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ।

উপরিধৃত অংশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার Literature of Bengal নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "Mukundaram who atined the title of Kabikankan, had two sons, sivram and Mahesh and two daughters Chitralekha and Jashada (p, 99.) "বঙ্গবাসী কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থের ১ম ভাগে সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে, কবিকঙ্কণের দুই পুত্র শিবরাম ও মহেশ, দুই কন্যা চিত্রলেখা ও যশোদা। অন্যত্র দেখিতেছি পুত্রের নাম শিবরাম, পুত্র বধূর নাম চিত্ররেখা। কন্যার নাম যশোদা, জামাতার নাম মহেশ (২৫) ।" বঙ্গভাষাও সাহিত্যের ২য় সংস্করণে দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "কবির মাতার নাম "দৈবকী" পুত্রের নাম "শিবরাম" পুত্র বধুর নাম চিত্ররেখা, কন্যার নাম যশোদা, জামাতার নাম মহেশ (৪০২ পৃঃ) । কোথায় পুত্র কন্যা আর কোথায় পুত্রবধূ ও জামাতা এ ভুলও বিচিত্র ভুল। এ শ্রেণীর ভুল যদি সহণীয়য় হয় তবে বৃদ্ধপিতামহ কেন অসহনীয় হইবে কেহ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি ?

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

---

(২৫) বঙ্গভাষার লিখক ১ম ভাগ ১৪নং পৃঃ—

কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির

দ্বিতীয় বর্ষের আংশিক কার্য্য-বিবরণী।

(১৩২০ সনের বৈশাখ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত)

(উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পাবনায় পঠিত)

যেরূপ বিশাল কার্য্যক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে এবং যেরূপ গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছি, দুই চারি বৎসর তদর্থে কার্য্যারম্ভের উদ্‌যোগেই কাটিয়া যায় প্রকৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ এখনও যে আমরা করিতে তেমন সমর্থ হই নাই একথা বলাই বাহুল্য; এমত অবস্থায় সম্প্রতি সমিতির বার্ষিকবিবরণী যে, শ্রোতৃবর্গের কৌতুহোলউদ্দীপক হইবে ইহা আশা করিতে পারি না।

আমরা এমন অনেক কাজের সংকল্প করিয়াছি যাহা শেষ করিতে হয়ত কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইবে, যাহার জন্য প্রত্যেক বর্ষেই আমাদিগকে একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে হইবে। তাই প্রথম কয়েক বর্ষে "থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়" না করিয়া ২।৩ বৎসরান্তে একটি কার্য্য-বিবরণী হইলে বোধ হয় কিঞ্চিৎ মুখরোচক হইত, কিন্তু আমরা উত্তরবঙ্গ-সম্মিলনে প্রতি বর্ষেই আমাদের কার্য্য-বিবরণী উপস্থাপিত করিতে সংকল্প করিয়াছি, তাই বাধ্য হইয়াই এবারেও এই অসম্পূর্ণ বিবরণী আপনাদের সমক্ষে পঠিত হইতেছে।

বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের সমিতিকে কাজ অপেক্ষা শক্তি-সঞ্চয়ের জন্যই বিশেষ প্রযত্ন করিতে হইয়াছে। সমিতির ভিত্তিভূমির দৃঢ়তা সাধন জন্যই বর্ত্তমান বর্ষে আমরা বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলাম এবং মহামায়ার কৃপায় এ সম্বন্ধে অনেকটা কৃতকার্য্যও হওয়া গিয়াছে। সেই বিষয় এখানে উল্লিখিত হইতেছে।

সর্ব্বাগ্রেই অতীব আনন্দের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, আসামের মহামান্য চিফ্‌কমিশনর অনরেবল্ স্যার আর্চ্চডেল আর্ল কে, সি, আই, ই, বাহাদুর আমাদের সমিতির প্রধান পৃষ্ঠ-পোষকের "চিফ্‌পেট্রনের" পদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরম উৎসাহিত করিয়াছেন। বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের এক্‌জিকিউটিভকাউন্‌সিলের ফার্ষ্ট্ মেম্বর্ ও ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ আসামের ইতিহাসপ্রণেতা অনরেবল্ মিঃ ই, এ, গেইট্ সি, এস্, আই সি, আই, ই, মহোদয়; আসাম ভেলির কমিশ্যনার এবং আসামের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর অনরেবল্ কর্ণেল পি, আর টি গর্ডন, সি, এস, আই বাহাদুর এবং আসাম গৌরীপুরের গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী জমীদার অনরেবল্ রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় সমিতির পৃষ্ঠপোষকের (পেট্রনের) পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আরও দুই এক স্থলে আমরা পৃষ্ঠপোষক পাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছি। ফলতঃ সমিতি

যে স্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে এতাদৃশ অভিভাবক না পাইলে ইহার পোষণ ও সংরক্ষা অসম্ভাবিত হইত। এখন আশা করা যায় যে, অভিভাবকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহা কার্য্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারিবে।

আবার যাদৃশ ক্ষেত্রে সমিতির জন্ম, তাহাতে কর্ম্মীর সংখ্যাই কম, পরিচালকের সংখ্যারত কথাই নাই। আমাদের কার্য্যের পথ প্রদর্শন ও পরামর্শাদি প্রদানের জন্য কামরূপ ক্ষেত্রের বাহিরে যে সকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাই সম্প্রতি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরাতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি, আই, ই, প্রবীণ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন বি, এল, এবং স্বনামধন্য বিশ্বকোষপ্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়-গণকে আমরা আমাদের সমিতির বিশিষ্ট সভ্যের পদে বৃত করিয়াছি এবং তাঁহারাও কৃপা করিয়া ঐ পদ গ্রহণে সমিতিকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদের সংসর্গ, সহায়তা, ও পরামর্শে সমিতি যে দিন দিন সফলতার দিকে অগ্রসর হইবে, সে বিষয়ে কাহারও বোধ হয় সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

সমিতির অভিযান—

(১ম) বিগত ভাদ্রমাসে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ মহোদয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সহরের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া অনেক খোদিত প্রস্তর ও শিলামূর্ত্তির খোঁজ পাইয়াছেন এবং উহা বর্ত্তমানে সংগৃহীত হইয়া যাহাতে "কর্জ্জনহলে" রক্ষিত হইতে পারে তজ্জন্য কর্জ্জন হল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। সম্প্রতি গৌহাটিতে একটি চিত্রশালা (মিউজিয়ম) নির্ম্মিত হইবার জল্পনা চলিতেছে। যদি উহা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে তাহা হইলে তথায় ঐ সকল প্রস্তরাদি রক্ষিত হইবে।

(২য়) সমিতির বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় আমাদের সমিতি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া গত পৌষমাসে তেজপুর, গৌরীপুর, কামাখ্যা ও গৌহাটির নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাঁহার সহযাত্রী গৌরীপুরের বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত দামোদর দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারা নানাস্থানের আলোকচিত্র উঠাইয়াছেন। উহা সময়ে সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিত হইবে। তিনি তেজপুরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী পর্ব্বত-গাত্রলিপির ছাপ উঠাইয়া পাঠার্থে লইয়া গিয়াছেন এবং অতীব গৌরবের বিষয় যে এযাবৎ যাহা কেহই পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই নগেন্দ্রবাবু তাহার পাঠোদ্ধারে অনেকটা সমর্থ হইয়াছেন।

(৩য়) গতখ্রীষ্টম্যাসের ছুটির সময় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ সেন বি, এল মহোদয় এবং তদীয় সহোদর শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন উকীল মহাশয় কামরূপের অন্তর্গত, ছয়গাওঁ নামক স্থানে এবং উত্তরপারস্থিত বজালীতে নানা দেবমন্দির ও বিখ্যাত স্থান

পর্য্যটন করেন। ছয়গাঁওতে মহিষবাহিনী চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি এবং বজালীর নিকটে হরিহরেশ্বর দেবালয় বিশেষভাবে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। ছয়গাঁওএর নিকটে মনসা-পুরাণের চাঁদসওদাগরের বাড়ীও তাঁহারা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এই সকলের বিবরণ যথাসময়ে সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে।

(৪র্থ) ইংরেজী নববর্ষের বন্ধের সময় প্রাগুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত আনন্দরাম চৌধুরী মহাশয় আমিনগাঁওএর সমীপবর্ত্তী আগিয়াঠুটি নামক পর্ব্বত পরিদর্শনার্থ তথায় গিয়াছিলেন। এই অভিযানকে ভৌগোলিক অভিযানই বলা যায়। সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস আগিয়াঠুটি একটা নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি এবং ইহার শিখরদেশে কোনও কিছুই জন্মে না। এই অভিযানের ফলে বোধ হয় এতদ্বিষয়ক লোকপ্রবাদের সমূলকত্ব সংশয়িতাবস্থায় পরিণত হইবে।

প্রবন্ধ-পাঠ :—

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে মহাশয় কলিতা জাতি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান পূর্ব্বক "কামরূপে ক্ষত্রিয়জাতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খাসিয়া জাতি সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া, "খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া রাজ্যের তথ্য" নামক অপর প্রবন্ধ লেখেন। সমিতির এক অধিবেশনে এই দুই প্রবন্ধ পঠিত হয়। "কামরূপে ক্ষত্রিয় জাতি" প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তালুকদার বি, এ, বি, এল কর্ত্তৃক অসমীয় ভাষায় অনূদিত হইবার পর "আসাম বান্ধব" নামক মাসিক পত্রের বিগত কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-প্রকাশ :—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ, মহোদয় "ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন" শীর্ষক যে প্রবন্ধ সমিতির ১ম বার্ষিক অধিবেশনে পড়িয়াছিলেন, উহার অসমীয় অনুবাদ "আসাম বান্ধব" পত্রিকায় এবং মূল প্রবন্ধ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আরও গৌরবের বিষয় যে, ঐ প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ "এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকায়" প্রকাশিত হইতেছে।

কার্য্যে হস্তক্ষেপ :—

(১ম) "কামরূপ শাসনাবলী" প্রকাশের সংকল্প-কথা গতবর্ষের কার্য্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে, এবারেও এই কার্য্য কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে।

(২য়) আমাদের সমিতির বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "আসামের জাতীয় ইতিহাস" প্রণয়ন জন্য উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। আমাদেরই পৃষ্ঠপোষক অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর উহার মুদ্রণ জন্য ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে ভারতের জাতীয় ইতিহাসে একটি

অত্যাবশ্যক অধ্যায় সংযুক্ত হইবে। তাহাতে শুধু আমরা কেন, সমগ্র ভারতই তজ্জনিত গৌরব অনুভব করিতে পারিবেন।

(৩য়) বঙ্গসাহিত্যের নীরব একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দে মহাশয়, "আসামের বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিকাশ ও উন্নতি" সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। উক্ত গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে ভক্ত এবং ঐতিহাসিক উভয় শ্রেণীরই যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৪র্থ) আসাম প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় খাঁটি "যোগিনী তন্ত্রের" সংকলন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। মূল সংস্কৃত শ্লোকের সহিত অসমীয় ভাষায় অনুবাদও থাকিবে।

(৫ম) কটন কলেজের অন্যতর সংস্কৃত সাহিত্যাধ্যাপক উদারমতি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহোদয় বাণভট্ট লিখিত "হর্ষচরিতের" বঙ্গানুবাদে নিযুক্ত হইয়াছেন। উহা কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মার সমসাময়িক সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জীবন-চরিত। উক্ত দুই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানকারীদিগের অশেষ উপকার সাধিত হইবে।

(৬ষ্ঠ) এতদ্ব্যতীত সমিতির উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কামরূপের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন জন্য আপনাকে তন্ময়ভাবে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের অভ্যর্থনা :—

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের গৌহাটিতে অবস্থান কালে, বিগত ২৪ ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য গৌহাটিস্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-শাখা-পরিষদ এবং কামরূপ কায়স্থ-সমাজ সহ "কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি" সমবেত ভাবে আয়োজন করিয়াছিলেন। তদর্থে অত্রস্থ 'কর্জ্জন হল' গৃহে একটি সান্ধ্য সমিতির অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় গণ্যমান্য অনেকেই উপস্থিত হইয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের আদর-আপ্যায়নে যোগদান করিয়াছিলেন। রজনীতে স্থানীয় কায়স্থগণের গৃহে তাঁহাকে কামরূপের প্রথানুসারে ভোজন দেওয়া হয়। তাহাতে আহারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তথ্যানুসন্ধানেরও কাজ চলিয়াছিল।

পৃষ্ঠপোষকের উৎসাহদান :—

সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর যে আসামের সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলনের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অনরেবল শ্রীযুক্ত কর্ণেল গর্ডন কমিশনর বাহাদুরও আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিতেছেন। বিগত শ্রীপঞ্চমীর দিবসে যখন সমিতির সম্পাদক প্রমুখ কতিপয় সদস্য তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎক্রমে পৃষ্ঠপোষক হইবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তিনি আহ্লাদ সহকারে ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত ত হইয়াছেন; অধিকন্তু তিনি সমিতির কোনও অধিবেশনে স্বয়ং প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দ্বারা সভ্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যাহাতে সত্বর গৌহাটি সহরে চিত্রশালা (মিউজিয়াম) স্থাপিত হয়, তদর্থে সমিতির সভ্যগণ মহামান্য চিফ কমিশনর বাহাদুর সমীপে আবেদন পত্র সহ উপস্থিত হইলে, তিনি সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ভাবে নেতৃস্থানীয় হইয়া কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই তিনি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয়ের তেজপুর যাতায়াতের ব্যয় "এথ্‌নোগ্রাফি" বিভাগের তহবিল হইতে প্রদান করিবার আদেশ দিয়া সমিতির সদস্যগণের প্রাণে এক নূতন আশার উদ্দীপনা করিয়াছেন।

কমিশনর সাহেব বাহাদুরের উপদেশ অনুসারে প্রস্তাবিত চিত্রশালা গৃহের "প্ল্যান" ও "এষ্টিমেট" প্রস্তুত পূর্ব্বক সত্বরই এক আবেদন লিখিয়া, যাহাতে আমাদের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক বাহাদুরের সমীপে উপস্থিত হইতে পারি, সম্প্রতি তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

শাখা-সমিতি ঃ—

উত্তর-বঙ্গ-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদকতায় রঙ্গপুরে সমিতির একটি শাখা প্রথম বর্ষেই সংস্থাপিত হইয়াছে। উহার কার্য্য-বিবরণ আমরা এ যাবৎ প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং এতৎসহ সংযোজিত হইতে পারিল না।

উপসংহার ঃ—

সমিতির অর্থসংস্থান গত বর্ষের যাহা ছিল, এ বৎসরেও প্রায় তাহাই। ইহার নির্দ্দিষ্ট কোনও চাঁদা নাই। এককালীন দানের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার জন্যই পদস্থ মহাত্মদিগকে পৃষ্ঠপোষক করিবার জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা। কিন্তু যাঁহার মন্দিরের পার্শ্বে বসিয়া এই সমিতির গঠন-প্রস্তাব হইয়াছে, সেই জগদম্বার ইচ্ছাই আমাদের একমাত্র ভরসা। তাঁহারই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ায় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, ক্ষুদ্র সমিতি কোন ছার? তাঁহার করুণা-কটাক্ষে চতুর্ব্বর্গ সাধিত হয়, একতম বর্গ অর্থের আগম'ত তুচ্ছকথা?

ফলতঃ কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির জন্ম যাঁহার পাদমূলে হইয়াছে, সংরক্ষণ ও পরিপোষণ তাঁহারই কৃপায় হইবে, আমরা কেবল নিমিত্তভাজন মাত্র।

গৌহাটি, ২৭এ মাঘ,
১৩২০ বঙ্গাব্দ।

শ্রীকালীচরণ সেন,
সম্পাদক, কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি।

তন্ত্রের বিশেষত্ব।

প্রাচীনকাল হইতে তন্ত্র শিবোক্ত শাস্ত্র বলিয়া আর্য্যসমাজে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। অথর্ব্ব বেদের সহিত তান্ত্রিক যন্ত্র ও মন্ত্রের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সুতরাং তন্ত্র যে অথর্ব্ব বেদের সময় হইতে আর্য্য সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। নাদবিন্দু পরিসমাপ্ত যে প্রণব বেদের আদি বীজ বলিয়া পরিগণিত, তন্ত্রোক্ত বীজগুলি তাহা লইয়াই পরিপুষ্ট। সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিলে বেদের ন্যায় তন্ত্রেও প্রণবতত্ত্বের ব্যাখ্যান লক্ষিত হইবে।

মারণ, উচাটনাদি ষট্‌কর্ম্ম ও পঞ্চ-মকারই তন্ত্রের বিশেষত্ব। মনুসংহিতায় ঐ সকল বশী-করণাদি অভিচার কর্ম্মের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে জানা যায়, প্রহ্লাদের জীবনান্ত করিবার জন্য দৈত্যপুরোহিতকে "কৃত্যা" প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। ইহা যে তান্ত্রিক আভিচারিক ক্রিয়া নহে, তাহা কে বলিতে পারে? বৃহদারণ্যক উপনিষদে দারাপহারী আততায়ীর প্রতি আভিচারিক মন্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং তন্ত্রকে আধুনিক বলা যায় না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর হস্তলিখিত তন্ত্র গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া তন্ত্রের অভিনবত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের এতদিন যে ভ্রম ধারণা ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে অপনীত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় নব্য লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ পাশ্চাত্য নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত অমূলক যুক্তিতর্কের লূতাতন্তু বিস্তার করিয়া সেই প্রাচীনতম তন্ত্রশাস্ত্রকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া প্রতিপাদনের নিমিত্ত সুদৃঢ় হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন।

তন্ত্রোক্ত যন্ত্রের ঘটক 'বকার' যন্ত্রের সম্পাদক বকারের সহিত বঙ্গাক্ষর বকারের আকৃতিগত অবিকল ঐক্য দেখিয়া বর্ণমালাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বঙ্গাক্ষর প্রবর্ত্তনার পরবর্ত্তী কালে তন্ত্রের সৃষ্টি, এরূপ অনুমান করেন। বঙ্গাক্ষর আধুনিক, কাজেই তন্ত্রও অভিনব;—ইহাই তাঁহাদের যুক্তি। বর্ণমালাতত্ত্বের পর্য্যালোচনা দ্বারা কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নহে। অবশ্য ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের লিপিচাতুর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পরস্পরের মধ্যে আংশিক সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে মূল এক দেবনাগরাক্ষর হইতে যে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে লিপি ব্যতিক্রমে ক্রমশঃ বিভিন্ন অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অনুমান করা যায়।

কিন্তু বর্ত্তমান মুদ্রিত নাগরাক্ষর বা বঙ্গাক্ষরই যে প্রাচীন প্রচলিত অক্ষর এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বিভিন্নদেশীয় হস্তলিখিত ও মুদ্রিত নাগরাক্ষরের মধ্যেও যথেষ্ট অনৈক্য লক্ষিত হয়, বঙ্গাক্ষরেও এরূপ বৈষম্য বিরল নহে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যে সকল বহুকালের হস্তলিখিত দেবাক্ষর ও বঙ্গাক্ষরের প্রাচীন পুস্তক রক্ষিত আছে,

তাহাদের লিপি-ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিলেও পরস্পরের সাদৃশ্য ও ক্রমপরিণতির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং দেবনাগর বকার যে তান্ত্রিক যন্ত্র-সৃষ্টির সময়ে ত্রিকোণাকার ছিল না, বর্ত্তমানেও যে সর্ব্বথা ত্রিকোণ নহে, এমন কথা বলা কঠিন।

বিশেষতঃ নবাবিষ্কৃত দ্বিসহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত মুদ্রা হইতে বঙ্গাক্ষরের অভিনবত্ব সম্বন্ধে ভ্রমধারণা সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। সুতরাং বরদা তন্ত্র, বর্ণোদ্ধার তন্ত্র প্রভৃতিতে বঙ্গাক্ষরের লিপি-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা আছে বলিয়া তন্ত্রের আধুনিকতা কল্পনা করা অসঙ্গত। প্রকৃতপক্ষে তান্ত্রিক বর্ণাবলী আন্তব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-সম্মত; শুধু ব্যবহার নিষ্পাদনার্থ কল্পিত নহে। প্রবুদ্ধ কণ্ডলীপ্রমুখ তান্ত্রিক সাধকেরা ইহার সত্যতা পরিজ্ঞাত ছিলেন।

কিন্তু বঙ্গের অতিমাত্র দুর্ভাগ্য যে, বঙ্গাক্ষর মুদ্রণপ্রথা প্রবর্ত্তনকালে কোন বিশেষজ্ঞ মহাপুরুষের সাহায্য লইয়া সম্পূর্ণ তান্ত্রিকপ্রণালীসম্মত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অক্ষর ক্ষোদিত হয় নাই, কেবল প্রচলিত অক্ষরের আকার-ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার ফলে বাঙ্গালা বর্ণমালার আংশিক বিকৃতি ও কিয়ৎপরিমাণে অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে।

তন্ত্রের আধুনিকতার অপর হেতু তন্ত্রোক্ত ভাষা। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তন্ত্রের ভাষা লক্ষ্য করিয়া ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য প্রাকৃত ভাষা পরিবর্ত্তন করা সহজ নহে ইহা সত্য, কিন্তু যিনি যতই বিজ্ঞ, বিচক্ষণ হউন না কেন, সকলকেই ক্ষেত্র বিবেচনায় ভাষা বিশেষের প্রয়োগ করিতে হয়। নিরক্ষর পল্লীবৃদ্ধের নিকট উন্নত সাহিত্যের ভাবপূর্ণ কাব্যঝঙ্কার দুর্ব্বোধ্য। তাই শাস্ত্র বলেন,—

'দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ।'

সুতরাং উপদেশার্থীর বোধগম্য ভাষায় তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা না করিলে, উপদেষ্টার সকল শ্রম বৃথা।

নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে অধ্যাত্মতত্ত্বে উন্নীত করিয়া সাধনমার্গের পথিক করিবার জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা।

'কলৌ পাপসমাচারা ভবিষ্যন্তি জনাঃ প্রিয়ে।
কলৌ নান্যবিধানেন কলাবাগমসম্মতাঃ॥'

উদ্ধৃত তন্ত্রবাক্য কৌশলে এই কথাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। অধুনাতন কালেও নিম্নশ্রেণীর ওঝা সম্প্রদায় মধ্যে তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রচলনাধিক্যও ইহার অন্যতম প্রমাণরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অবশ্য কালমাহাত্ম্যে তাহারা তন্ত্রতত্ত্বে অনভিজ্ঞ হইলেও অন্ধ-বিশ্বাস ও একাগ্রতার ফলে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশানুসারে তান্ত্রিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের দ্বারা অদ্যাপি আশ্চর্য্যফল প্রদর্শন করিয়া থাকে। সুতরাং নিম্নশ্রেণীর লোকদের বোধগম্য সরল ভাষায় যে তন্ত্র রচিত হয় নাই, তাহা কি করিয়া বলিব?

প্রাচীনকালে তন্ত্র অতি গূহ্যতম ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। শিষ্যব্যবসায়িগণ অতি সযতনে এবং সঙ্গোপনে ইহা রক্ষা করিতেন। রাজধানী প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে তন্ত্রের তাদৃশ প্রচলন ছিল না। খুব সম্ভব চীনপরিব্রাজক এই কারণে তন্ত্রের অস্তিত্বের পরিচয় না পাইয়া তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে উহার উল্লেখ করেন নাই।

তন্ত্রের বিস্তৃতি আধুনিক হইলেও, উহার অভিনবত্ব প্রতিপন্ন হয় না। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ-প্রণেতা বেদভাষ্যকৃৎ মাধবাচার্য্য শৈব-শাক্তাদি দার্শনিকের মত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাপরাবতার শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া শৈবশাক্তাদি মত খণ্ডন করিয়াছেন। অবশ্য শঙ্করাচার্য্য শাক্তমত খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া উহা পৃথিবী হইতে উঠাইয়া দেন নাই। উদ্যান-পালকেরা সময় সময় বর্দ্ধমান বৃক্ষডালগুলি ছেদন করিয়া দেয়, কিন্তু উহা সমূলে নির্ম্মূল করে না, নরসুন্দরেরা গোঁফদাড়ী ক্ষৌরী করে বলিয়া তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, অনাবশ্যক অতিরিক্ত অংশ ফেলিয়া দেওয়া হয় মাত্র। তদ্রূপ শঙ্করাচার্য্য তন্ত্রের অতিরিক্ত বাড়াবাড়িটুকু বর্জ্জন করিয়াছিলেন মাত্র। ফলতঃ বলিতে গেলে শঙ্করাচার্য্যই তন্ত্রমত পৃথিবীতে দৃঢ়মূল করিয়া যান। শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসলীলা তান্ত্রিক মকার সাধনেরই অভিব্যক্তি; পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের নিকট বহু প্রাচীন আর্য্যতন্ত্রানুরূপ তন্ত্রগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তন্ত্রের বিস্তৃতি ন্যূনাধিক প্রায় দ্বিসহস্র বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তন্ত্র যদ্যপি প্রাচীনতম, তবে উহা ভারতব্যাপী না হইয়া বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ কেন? ইহার যথার্থ উত্তর এক মাত্র শঙ্করবিজয় হইতেই পাওয়া যায়। মহাভাগ শঙ্কর পৃথিবীব্যাপী অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন বটে, কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র ও লোকের মতি গতি পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, স্বকীয় প্রবর্ত্তিত শুষ্ক অদ্বৈত-বাদ ধারণা করিবার মত লোক পৃথিবীতে অত্যল্প। সুতরাং দ্বৈত হইতে তাহাদিগকে অদ্বৈতে লইয়া যাইতে হইবে। এই জন্য দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় পাঞ্চভৌতিক মনুষ্যদিগকে শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব—এই পঞ্চ সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া পদ্মপাদ ও আনন্দগিরি-প্রমুখ প্রিয়তম পঞ্চ শিষ্যকে ঐ সকল ধর্ম্মমত প্রচারের আদেশ করিলেন। সেই হইতে ভারতে প্রধানতঃ এই পঞ্চোপাসনা প্রসার লাভ করে। শক্তি, সামর্থ্য ও রুচির আনুকূল্যে শাক্ত-প্রধান মতেরই প্রাধান্য লাভ ঘটে। যদিও পঞ্চোপাসনার মূলে তন্ত্রের প্রভাব নিহিত রহিয়াছে, তথাপি শাক্তরাই বিশেষরূপে তান্ত্রিক বলিয়া পরিচিত হওয়ার বিশেষ কারণ আছে। ঐহিক, পারত্রিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে, তদুপযুক্ত শক্তিসামর্থ্য আবশ্যক; অথচ, সকল শক্তিই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির (দেহকেন্দ্রশক্তির) অভিব্যক্তি, সুতরাং যিনি যে মতের উপাসকই হউন না কেন, কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকে উদ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এমতাবস্থায় যাহারা মূলতঃ স্বতঃই শক্তি-উপাসক, তাহারা যে সাধনামার্গে সকলের পুরোবর্ত্তী, তৎসম্বন্ধে কথাই নাই। এই কারণে, পঞ্চোপাসক তান্ত্রিক হইলেও, শাক্তেরাই বিশেষ ভাবে

তান্ত্রিক বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং এ দেশে তন্ত্রের প্রচার-বাহুল্য থাকিলেও বঙ্গের বাহিরে যে উহার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে নাই, এ কথা বলা যায় না।

যাহা হউক তন্ত্রের আধুনিকতা বা তাহার প্রচারবাহুল্যের অভাবে তদীয় মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। মনু বলিয়াছেন,

'শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যা মাদদীতা বরাদপি।
পিতৃনধ্যাপয়ামাস শিশবাঙ্গীরসঃ কবিঃ॥'

শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি কনিষ্ঠের নিকট হইতেও কল্যাণকারিণী বিদ্যা গ্রহণ করিবেন। শিশু বৃহস্পতি পিতৃব্যদিগকেও বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন। মনু কেবল এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

'ন হয়ৈ র্ন পলিতৈ র্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনুচানঃ মনোমহান্॥'

সুতরাং মাহাত্ম্যেই মহত্ব। সেই মহত্বটুকু যদি তন্ত্রে থাকে, তবে তাহা কনিষ্ঠ বলিয়া উপেক্ষিত বা স্বল্প প্রচার বলিয়া ঘৃণিত ও দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে কেন?

বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতিরাণীর বিশাল বিচিত্র বিশ্বভাণ্ডারে তন্ত্রের মত সমুজ্জ্বল মহার্ঘ রত্ন আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক কথায় বলিতে গেলে, নিখিল শাস্ত্রের সারতত্ত্ব একমাত্র তন্ত্রেই সংগৃহীত ও নিহিত হইয়াছে।

কর্ম্মপ্রতীক ঈশ্বরোপাসনা বেদের সংহিতা-ভাগের প্রথম ও প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। দেবতা ও জড় প্রতীক উপাসনাও তৎসহকারী বটে। তাই কর্ম্মমীমাংসা জৈমিনি-দর্শনে অতি সাবধানতার সহিত আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। সেই বেদপ্রস্থিত মীমাংসাবিধৌত যজ্ঞতত্ত্ব বিষ্ণুপদ-বিনির্গতা ভাগীরথীর ন্যায় জগৎ ও জীবতত্ত্বে উদ্ভাসিত হইয়া তান্ত্রিক অন্তর্গানে পর্য্যবসিত সাগর-সঙ্গমের শোভা ধারণ করিয়াছে। তাই বেদের মূলতত্ত্ব তন্ত্রে প্রকটিত।

প্রণবপ্রতীক ঈশ্বরোপাসনা ও ব্রহ্মাববোধনই বেদান্ত বিচারের মুখ্যতম লক্ষ্য। সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য নিগূঢ় ভাব উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনে সম্যক্ আলোচিত হইলেও দেহ ও জীবতত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া সাধু ও সরলভাবে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী রূপে একমাত্র তন্ত্রেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্তমুকুলিত তত্ত্বকলিকা তন্ত্রে আসিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। সাংখ্যোক্ত যোগ, প্রকৃতি, পুরুষ প্রভৃতি শিবশক্তিবর্ণন প্রসঙ্গে জীবতত্ত্বের সহিত ঐক্য করিয়া অতি সুন্দর ও সরল ভাবে তন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। অতএব সাংখ্যের অস্পষ্ট তত্ত্ব-নিচয়ও তন্ত্রের ভিতর দিয়া সমুজ্জ্বল রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বেদোক্ত যোগ যোগদর্শনে ব্যক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যোগবক্তা পাতঞ্জলি ও তদীয় ভাষ্যপ্রণেতা ব্যাস সেই নিগূঢ় তত্ত্বের সূচনা মাত্র করিয়া গিয়াছেন। সেই সূচিত তত্ত্ব তন্ত্রে আসিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাই তন্ত্রের যোগতত্ত্ব না জানা পর্য্যন্ত যোগ-দর্শনের অধ্যয়ন সফল হয় না। এই

কারণেই আজকাল যোগদর্শন অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অনেককেই নির্জ্জল শুষ্কতীর্থ সাজিতে দেখা যায়।

বস্তুতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সাকার নিরাকার রহস্য, জ্যোতিস্তত্ত্ব, ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তৎসমুদয়ের অভিব্যক্তি তন্ত্রে লক্ষিত হইবে।

সুখের বিষয়, আজকাল ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডবাসিগণ তন্ত্রের অনুশীলন ও আদর আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহা হইতে আর অধিক দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় কি আছে যে, আমাদের ঐশ্বর্য্য সম্পদে অন্যে পরিপুষ্টিলাভ করিতেছে, আর আমরা কি না—"বনে পুষ্পফলাকীর্ণে পুরীষমিব" শূকরের ন্যায় তন্ত্রে কোন সার সত্য আছে কি না তাহার অনুসন্ধান না করিয়া কেবল উহার নবীনতা, প্রাচীনতা এবং মকারের অশ্লীলতা লইয়া বৃথা তর্কজাল বিস্তার পূর্ব্বক অযথা সময়ক্ষেপ করিতেছি।

অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে, একমাত্র প্রণবতত্ত্বই শাস্ত্রমূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বেদের অন্তর্নিহিত সেই মূলতত্ত্ব ছান্দোগ্য, কঠ, হংস প্রভৃতি উপনিষদে প্রকটমান হইলেও ভাবুক বক্তা সেই গভীর অন্তস্তলনিহিত প্রগাঢ় তত্ত্বরস সাধারণের পক্ষে তত হৃদয়-গ্রাহী করিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসায় বক্তার মনোভাব অধিকারিবিশেষের বোধ্য ভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ায়, সেইরূপ জটিল ভাবই রহিয়া গিয়াছে। সাংখ্যের চেষ্টাও এই স্তরেই পর্য্যবসিত। অবশ্য যোগদর্শনের ভাব কতকটা পরিস্ফুট সত্য, কিন্তু তাহা সূচনা মাত্র।

বাস্তবিক যেরূপ স্বর্গীয়া মন্দাকিনীধারা হিমালয়শীর্ষ হইতে নিঃসৃত হইয়া পথমধ্যবর্ত্তী নানারূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক সরস্বতী ও যমুনার সহিত মিলিত হইয়া একমাত্র প্রয়াগ ধামে আসিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ বেদবেদান্ত প্রকল্পিত প্রণবতত্ত্ব পাষাণ-প্রতিম দুর্ভেদ্য বিভিন্ন শাস্ত্রীয় কূট রহস্য ভেদ করতঃ জগত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া একমাত্র তন্ত্রে আসিয়াই সাগর সঙ্গমের ন্যায় প্রশান্ত, উদার, সাম্যভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। ধর্ম্মভাবানুপ্রাণিত হইয়া ইহা পাঠ করিলে, ত্রিবেণীস্নাত পবিত্রীকৃত দেহ মানবের ন্যায় হৃদয় স্বতঃই সুধারসসিক্ত ও আনন্দ ধারায় পরিপ্লুত হইয়া থাকে। সুতরাং তন্ত্র যে উচ্চ ভাবের সমাবেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহামহিমান্বিত তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বোধ হয় একথা বলা অসঙ্গত নহে যে, তন্ত্র যদি কেবল মাত্র প্রণবতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াই বিরত হইতেন, তথাপি গুণগরিমায় অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা তন্ত্রের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিত। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবের মুখনিঃসৃত ও উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্বের সমাবেশে অতুলনীয় হইলেও "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশীর" ন্যায় এক-শ্রুতি, স্মৃতি বিরোধিতার আশঙ্কা করিয়া সম্প্রদায় বিশেষ উহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তি আপাত রমণীয়া বিষলতার ন্যায় আশু মনোহারিণী হইলেও ভ্রম-

শূন্য নহে। নব্যনীতির অনুসরণ পূর্ব্বক যথাশ্রুত অর্থ লইয়া মনঃকল্পিত যুক্তির উপর নির্ভর করত অযথা অর্থের অবতারণা করিয়া সমাজে অলীক ধারণার সঞ্চার করা সঙ্গত নহে। আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি অবলম্বন পূর্ব্বক তন্ত্রের সারতত্ত্ব ও প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ষট্‌কর্ম্ম ও পঞ্চমকার লইয়াই তন্ত্রের তন্ত্রত্ব বা বিশেষত্ব। সেই ষট্‌কর্ম্ম এই,—

'শান্তি বৈশ্য স্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণান্তানি সংসন্তি ষট্‌কর্ম্মাণি মনীষিণঃ॥
রোগকৃত্যাগ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতঃ।
বৈশ্যং জনানাং সর্ব্বেষাং বিধেয়ত্ব মুদীরিতম্॥
প্রবৃত্তি র্বাধা সর্ব্বেষাং স্তম্ভনং তদুদাহৃতম্।
স্নিগ্ধানাং দ্বেষজননং মিথো বিদ্বেষণং মতং॥
উচ্চাটনং স্বদেশাদে র্ভ্রমণং পরিকীর্ত্তিতং।
প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং তদুদাহৃতম্॥'

উল্লিখিত ষটকর্ম্মের মধ্যে শান্তিকর্ম্ম সাধারণের পক্ষে উপাদেয় হইলেও মনু "অভিচারং মূল কর্ম্মা", "ন পরদ্রোহে কর্ম্মধীঃ", "ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং", "স্ত্রীশূদ্র বিট্ ক্ষত্রবধঃ" ইত্যাদি বাক্যে বেদের এই "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া অপর পাঁচটি কর্ম্মের অবৈধতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাস্তবিক সকল ক্ষেত্রে এ বিধি প্রযোজ্য নহে। স্থল-বিশেষে যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে, অপর পাঁচটি কর্ম্মও সাধারণের কল্যাণকর হয়।

অনেক সময় দেশের স্তম্ভস্বরূপ রাজা ও তদধীন সামন্তবর্গের মধ্যে অকারণ বিরোধ বিসম্বাদের উদ্ভব হইয়া উভয় পক্ষ ধ্বংসমুখে পতিত হন। রাজদম্পতী ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গের মধ্যে এইরূপ কলহ ও মনোমালিন্যের ফলে যে, দেশে অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহা রাষ্ট্রীয় জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। এরূপ ক্ষেত্রে শান্তির পক্ষপাতী রাষ্ট্রহিতৈষী সহৃদয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে বোধ হয় বশীকরণ প্রক্রিয়ার আশ্রয় লওয়া দূষ্য নহে।

এইরূপ রাজা বা রাজপুরুষেরা যখন কুহকিনী বারনারীর অবৈধ প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের হস্তধৃতসূত্র ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া পড়েন, এবং সুশাসনের অভাবে দেশে অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠে, সেরূপ স্থলে, তন্ত্রোক্ত বিদ্বেষণ প্রক্রিয়া অবলম্বনে দেশ রক্ষা করা বোধ হয় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্ম্ম ও ন্যায়বিগর্হিত বলিয়া মনে করিবেন না।

শত্রুকুল সর্ব্বথা রাজশক্তির শাস্য ও দণ্ডনীয় হইলেও যদি কোন দুর্ব্বৃত্ত পুনঃ পুনঃ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও অত্যাচার উৎপীড়নে পরাঙ্মুখ না হয়, এবং তাহার প্রতাপে প্রকৃতি-পুঞ্জের স্ত্রীপুত্র লইয়া নিরাপদে বাস করা কঠিন হইয়া উঠে, তখন সে অবস্থায় জনসাধারণ কি তাহার উচ্ছেদ কামনা করে না?

শাস্ত্র দারাপহারী লম্পট ও দস্যুগণকে আততায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা ;—

'অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥'

আততায়ীর দমনকল্পে শাস্ত্র কি উপদেশ প্রদান করেন তাহাও শুনুন,—

'আততায়িন মায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়ি বধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥'

বস্তুতঃ এইরূপ দুর্ব্বৃত্তের অসদ্বৃত্তি চরিতার্থ করিবার শক্তি প্রথমে স্তম্ভন প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করাই অতীব ভদ্রতর কার্য্য। শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাই প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সর্ব্বত্র সকল কার্য্য ফলপ্রদ হয় না। প্রথম চেষ্টা কার্য্যকরী না হইলে তখন উচ্চাটন ক্রিয়া দ্বারা শত্রুকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিবে। তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে, চরম প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়। তন্ত্রও এই উপদেশই প্রদান করিয়াছেন।

ব্রহ্মব্রতপরায়ণ ব্রতীদিগকে যদ্যপি প্রতিনিয়ত প্রতিপক্ষদলনে রাজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সাধনার অবকাশ কোথায়। এরূপ ক্ষেত্রে ভগবান্ মনু স্বশক্তি প্রয়োগে দুর্ব্বৃত্তদমনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।

'স্ববীর্য্যা দ্রাজবীর্য্যাচ্চ স্ববীর্য্যং বলবত্তরং।
তস্মাৎ স্বেনৈব বীর্য্যেণ নিগৃহ্ণীয়াদরীন্ দ্বিজঃ॥
শ্রুতীরথ র্বাঙ্গিরসীঃ কুর্য্যাদিত্যবিচারয়ন্।
বাক্ শস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্য তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ॥'

মনু, ১১ অঃ, ৩১।৩২ শ্লোক।

ঈদৃশ শত্রুর দমন কল্পেই বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাহার মন্ত্র ও প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদে "শ্যেনে নাভিচরণ্ যজেত··· ··" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক যে শ্যেন-যাগের বিধি অমিত্রনিরসনকল্পে বিহিত হইয়াছে, স্মৃতি, উপনিষৎ ও তন্ত্রে আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।

ফলতঃ পদার্থের শ্রেণী কিম্বা জাতিগত ভাবে ইষ্টানিষ্ট ও উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট নির্ণয় করা সঙ্গত নহে। দেশ, কাল, পাত্র ও প্রযোজ্য প্রযোজকভেদে ইষ্টও অনিষ্ট এবং অনিষ্টও ইষ্টকারী হইতে পারে। প্রাণমূল অন্নই সন্নিপাতক্ষেত্রে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে, আবার তদবস্থায় সুচিকিৎসক কর্ত্তৃক যথাবিধি প্রযুক্ত সদ্যপ্রাণনাশক কালকূট বিষও সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করে। সুতরাং তন্ত্রোক্ত ষট্কর্ম্মও যে যথাশাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে সুফলদায়ক হইবে, তাহাতে সংশয় করিবার কিছুই নাই। তবে হাতুড়ে চিকিৎসকগণের ন্যায় অযোগ্য, অনধিকারী কর্ত্তৃক অযথা প্রযুক্ত হইয়া এই সকল তান্ত্রিক প্রক্রিয়া জাগতিক অনিষ্টের হেতু হওয়া বিচিত্র নহে।

অতঃপর পঞ্চমকারই আমাদের আলোচ্য। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটি পঞ্চমকার নামে অভিহিত। 'আহারনিদ্রাভয়মৈথুনানি সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং'—এত গেল শাস্ত্রবচন। সাধারণ দৃষ্টিতেও যে সকল ক্রিয়া পশু পক্ষী মনুষ্যের সাধারণ নৈসর্গিক কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত, তাহাই কিনা উপাসনার অঙ্গ বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে গৃহীত হইল, বড়ই কৌতুকের কথা। যে তন্ত্রকার গভীর গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ বাক্যে বিজ্ঞানের চরমতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব প্রভৃতি সূক্ষ্মতম বিষয়গুলির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া অসাধারণ জ্ঞান, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনন্যসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনিই কিনা কদর্য্য কুক্রিয়ার প্রশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক তন্ত্রের উজ্জ্বল মহিমায় কলঙ্ক কালিমা অনুলেপন করিলেন, কথাটা ঘোর প্রহেলিকাময় নয় কি ?

মনু "ব্রহ্মহত্যাসুরাপানং ... নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসা মাংসমুৎপদ্যতে কচিৎ। নচ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যাঃ, পারদার্য্যাত্মবিক্রয়ঃ কন্যায়া দূষণঞ্চৈব" ইত্যাদি বাক্যে এই সকল দুষ্কার্য্যগুলিকে যথাসম্ভব মহাপাতকাদির মধ্যে গণনা করিয়াছেন। তন্ত্র তাহারই অনুসরণ পূর্ব্বক বলিতেছেন,—

'ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
বামকাম ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥' শ্রীক্রম
'আবাভ্যাং পিশিতং মাংসং সুরাঞ্চৈব সুরেশ্বরি।
বর্ণাশ্রমোচিতং ধর্ম্ম মবিচার্য্যার্পয়ন্তি যে।
ভূতপ্রেতপিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥' আগম সংহিতা
'অর্থাদ্বা কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ।
লিঙ্গযোনীরতো যোগী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥' কুমারী তন্ত্র।

সুতরাং শ্রুতিস্মৃতিবিরোধী ঐ সকল কদর্য্যানুষ্ঠানের অবৈধত্ব ঘোষণা করিতে যে তন্ত্র বিরত নহেন, বুঝা যাইতেছে। কিন্তু যে তন্ত্র পঞ্চতত্ত্বের নিন্দাকীর্ত্তনে এইরূপ মুক্তকণ্ঠ, সেই তন্ত্রই আবার ;—

'পূজয়েৎ বহুযত্নেন পঞ্চতত্ত্বেন কৌলিকঃ।
মকারপঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥'

বলিয়া পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা উপাসনার বিধান প্রদান করিতেছেন। বিষম সমস্যার কথা। এই রহস্যজাল ভেদ করিতে পারিলে, বুঝিব তন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। যদিও তন্ত্রে মদ্যমাংসাদির ভূরি ভূরি নিন্দাবাদ লক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু তথাপি যে তন্ত্রে পঞ্চতত্ত্বের ব্যবস্থা সর্ব্বথা বিহিত হয় নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে, তন্ত্রের তন্ত্রত্ব বা বিশেষত্বও থাকে না। তবে সে বিধান যে সকলের পক্ষে সকল সময়ের জন্য নহে, ইহা ধ্রুব সত্য।

সুচতুর তন্ত্রকার নিম্নাধিকারী সাধকগণের জন্য স্বয়ং কিছু না বলিয়া গুরুর উপর ভারার্পণ পূর্ব্বক দেখুন কিরূপ সুকৌশলে স্থূল মকারের অবতারণা করিতেছেন।

'পন্থানো বহবঃ প্রোক্তা মন্ত্রশাস্ত্রৈর্মনীষিভিঃ।
স্বগুরোর্মতমাশ্রিত্য শুভং কার্য্যং নচান্যথা॥' শৈবানম্।

অথচ স্বপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা রক্ষার জন্য অধিকারভেদে সূক্ষ্ম পঞ্চমকারের ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বরসপিপাসু উন্নত সাধকগণকেও বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহাদের জন্য আধ্যাত্মিক মকার পরিপূরিত বিশাল তত্ত্ব-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মনস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক বা সূক্ষ্ম পঞ্চ-মকার কাহাকে বলে দেখা যাউক।

মদ্য—সোমধারা ক্ষরেদ্‌যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে!
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥

অর্থাৎ সহস্রার ক্ষরিত অমৃতধারা পানকারী সাধক প্রকৃত মদ্যসাধক।

মাংস—মাংসনোতীতি যৎকর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতং।
ন চ কায় প্রতিকুণ্ড মুনিভি র্মাংসমুচ্যতে॥

অর্থাৎ যে কর্ম্ম পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করে তাহাকেই মাংস সাধন বলে।

মৎস্য—গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে দ্বৌ মৎস্যৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স এব মৎস্যসাধকঃ॥

অর্থাৎ প্রাণাপান ভক্ষণকারী কৃতকুম্ভক ব্যক্তিই প্রকৃত মৎস্যসাধক।

মুদ্রা—সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকামুদ্রিতাচরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং॥
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥

অর্থাৎ সহস্রারস্থিত কমলকর্ণিকায় মহাকুণ্ডলিনী সমালিঙ্গিত পরমাত্মার অনুভূতিকেই মুদ্রা সাধন বলে।

মৈথুন—কুলকুণ্ডলিনীশক্তি দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতং॥

সহস্রারাবস্থিত পরমাত্মার সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগ সমুদ্ভূত পরমানন্দানুভব করাকেই মৈথুন সাধন বলে।

ইহা কি সামান্য লোকের কার্য্য? যিনি যোনিমুদ্রায়, শক্তিচালনী মুদ্রায় কৃতাভ্যস্ত, খেচরী ও মাণ্ডুকী মুদ্রায় সুশিক্ষিত, প্রাণায়ামের উচ্চস্তরে উন্নীত, কেবল তাদৃশ উন্নত সাধকই এই পঞ্চতত্ত্ব সাধনের অধিকারী।

বাস্তবিক চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় পরিশোভিত স্ত্রীপুংশক্তির সমবায়ে আমরা এক এক জন দেহী। সাধক দেহী অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কৌশলে মুদ্রাসহায়তায় নিজদেহগতস্ত্রীরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারাবস্থিত পরমাত্মার সহিত সম্মিলন করাইলে, সুশ্রুতোক্ত স্বপ্ন-গর্ভের ন্যায় এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রবাহ উপজাত হয়। এই যোগজ পরমাহ্লাদ-

মদে প্রমত্ত যোগী যখন আত্মবিস্মৃত হন, তখন তিনি সংসার ভুলিয়া মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া চিরপ্রেম ও অমৃতের রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকেন। লৌকিক জগতের পার্থিব সুখ এ মহানন্দের নিকট খদ্যোতজ্যোতির ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর। তাই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ স্ত্রীপুত্র ধন জন ও সংসারের যাবতীয় লালসাময় কাম্যবস্তুর আকর্ষণ অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়া সেই চিদানন্দদায়ক অমৃতরস পানের জন্য প্রধাবিত হয়। এই সূক্ষ্ম ও মূল পঞ্চ-তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই মহাদেব বলিয়াছেন,

'পঞ্চমে পঞ্চমাকারঃ পঞ্চাননো সমো ভবেৎ।'

ঈদৃশ পরানন্দোল্লাসে উন্মত্ত যোগী যে সাক্ষাৎ পঞ্চাননতুল্য সে বিষয়ে কি আর অণুমাত্রও সন্দেহ আছে? বাস্তবিক সুষুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন ও সংযোগ ব্যতীত কোটী কোটী বোতল মদ্যপান, পর্ব্বতোপম মদ্যমাংস ভক্ষণ ও পঞ্চমে ছাগবৃত্তি অতিক্রম করিলেও পঞ্চানন তুল্য হওয়া দূরে থাকুক, পঞ্চাননের অনুচরশ্রেণীভুক্ত হওয়াও সুকঠিন। তাই কুলার্ণব বলিয়াছেন,—

'মদ্যপানেন মনুজা যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তি পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেন যদি পুণ্যগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাসিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
স্ত্রীসম্ভোগমাত্রেণ যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবণাৎ॥" কুলার্ণব তন্ত্র।

যাঁহারা সাধনমার্গের সর্ব্বোচ্চ সোপানে সমারূঢ় হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের জন্য মানসিক তত্ত্বাভ্যাসের ব্যবস্থা।

'ন কলৌ প্রকৃতাচারঃ সংশয়াত্মনি নৈব সঃ।
মানসে নৈব ভাবেন সর্ব্বসিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥'

চিত্তচাঞ্চল্য নিবন্ধন মানসিক তত্ত্বাভ্যাসে অসমর্থ হইলে তত্ত্বপ্রতিনিধি অবলম্বনীয়।

'যত্রাসবমবশ্যন্তু ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ।
গুড়াদ্রকং তদা দদ্যাৎ তাম্রে বারিস্থজেন্মধু॥' তন্ত্রকুলচূড়ামণি।
'মাংসাদি প্রতিনিধি লশুনাদি ব্যবস্থাপিতঃ।
পঞ্চম প্রতিমিধি, ততস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি!
ধ্যানং দেব্যা পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা॥' তন্ত্র।

সুতরাং উপাস্যান্তর সম্বন্ধে চিত্তসংযমের জন্য মদ্যাদি ব্যবস্থিত হয় নাই। কারণ সংশয়াত্মা সাধকের পক্ষে মদ্যাদি পানে বিপরীত ফলেরই উদয় হয়।

স্থূল মকার কাহাদের জন্য ব্যবস্থিত এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা মনে পড়িল। কোন রাজকুমার বয়োধর্ম্মে বালস্বভাবসুলভ চাপল্য প্রযুক্ত

অত্যন্ত ক্রীড়াসক্ত হইয়া পড়েন। এমন কি লেখাপড়ার নাম পর্য্যন্ত ও তিনি শুনিতে পারিতেন না। কত সুযোগ্য শিক্ষক তদীয় শিক্ষাবিধানে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেলেন। অবশেষে এক সুদক্ষ চতুর শিক্ষক রাজকুমারের শিক্ষাভার গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় রুচি অনুযায়ী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। রাজপুত্র কপোত লইয়া ক্রীড়া করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। শিক্ষক বর্ণমালার সংখ্যানুযায়ী কপোত বৃদ্ধির আদেশ দিলেন। কুমার শিক্ষকের কার্য্যে নিরতিশয় আহ্লাদিত এবং তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। শিক্ষক কুমারের ক্রীড়ানুরক্তি দর্শনে সুযোগ বুঝিয়া কপোতগুলির এক একটী নামকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, কুমার সানন্দচিত্তে তাঁহাকেই সে ভার অর্পণ করিলেন। সুচতুর শিক্ষক এক একটী বর্ণমালার নামানুসারে প্রত্যেক কপোতের নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ফলে ক্রীড়াচ্ছলে কুমারের বর্ণশিক্ষা হইয়া গেল, এবং এই প্রণালীতে ক্রমশঃ স্বরসমাবেশ বানান-শিক্ষা এবং শব্দার্থে ব্যুৎপত্তি লাভ হইল। এইরূপে শব্দার্থজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কুমারের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া অচিরকাল মধ্যে তিনি একজন পণ্ডিতপদবাচ্য হইয়া উঠিলেন। আমাদের তত্ত্বদর্শী তন্ত্রবক্তাকেও সেইরূপ সাধারণ মানবসম্প্রদায়ের জন্য উল্লিখিত প্রকার নীতির অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। অবশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে ও শাসনসীমার বিস্তৃতি অনুসারে তাঁহাকে নানা ভাবের ভাবুক ও নানা রসের রসিক হইয়া কার্য্যস্থলে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পার্থিবপ্রধান মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ মদ্যপ্রিয়। আপ্যপ্রধান ব্যক্তিরা মাংস-লোলুপ, তৈজসপ্রধান লোকেরা মৎস্যভোজী, বাতপ্রধান লোকের মুদ্রা মুখরোচক, আর নভঃপ্রকৃতিক মনুষ্যেরা মৈথুনপ্রিয় হইয়া থাকে, এবং ইহাদের সংমিশ্রণে সাঙ্কর্য্যপ্রবণতা অবশ্যম্ভাবী। তাই সাধারণ জনসমূহের প্রকৃতিগত রুচি অনুসারে ইন্দ্রিয়ভোগ্য লালসার বস্তুপঞ্চককেই সাধনার অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরা হাতে হাতে স্বর্গ লাভ করিল। তন্ত্রের বিজয়কেতনমূলে সমবেত হইয়া ভারতের হিন্দুনরনারী অবিলম্বে তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিলেন।

বাস্তবিক আমাদের দেহের কেন্দ্রশক্তিস্বরূপিণী সুষুপ্তা কুলকুণ্ডলিনীশক্তি যে পর্য্যন্ত না জাগরিতা (স্বেচ্ছাপরিচালিতা) হন, সে পর্য্যন্ত বেদ-বেদান্ত, দর্শন বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইলেও সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী যোগ, তপস্যা, পূজা ও অর্চ্চনা দ্বারা আমাদের পশুত্বের বিলোপ, হৃদয়ের মোহকালিমা বিদূরিত, বা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ববন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবে না। স্বার্থের কলুষ-পঙ্কিল হ্রদগর্ভে আমরা নিমজ্জিত থাকিবই থাকিব। পরানন্দের নির্ম্মল আলোকরশ্মি কখনই আমাদের চিরতমসাচ্ছন্ন হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইবে না। তাই তন্ত্র বলেন,—

'মূলচক্রে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো !
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকং ॥' তন্ত্রসার।

সাধন মার্গের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্যই কুলকুণ্ডলিনীশক্তির উদ্বোধন চেষ্টা। ইহার অভাবে গৃহী বা উদাসী, অথবা শাক্ত শৈব বৈষ্ণব যে সম্প্রদায়ের যে কেহ হউন না, কেবল বাহ্যবেশভূষা

ধারণ বা শুধু আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। এই শক্তির সচেতনতার অভাবে আমরা বৈদিক তান্ত্রিক ও পৌরাণিক সকল ক্রিয়ারই অধিকার হারাইয়া কেবল বিষহীন উরগের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। এ ত গেল আধ্যাত্মিক জগতের কথা। লৌকিক জগতেও এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সংসারের নির্ম্মল, পবিত্র সুখ যে দাম্পত্যপ্রণয়, তাহার মূলীভূতা পত্নী-শক্তি যাঁহাদের করায়ত্তা নহে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা উপভোগেই তাঁহাদের সময় অতিবাহিত করিতে হয়। আনন্দানুভব তাঁহাদের অদৃষ্টে বড় একটা ঘটে না। প্রকৃত প্রস্তাবে কুণ্ডলিনীশক্তির আধার সুষুম্না যে পর্য্যন্ত শ্লেষ্মাভিভূত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই স্বর পরিষ্কার ও কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইবেন না। যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রে সুষুম্না পরিষ্কারের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। গুরূপদেশ অনুসারে তাহার কোন একটির অনুষ্ঠান করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। এই সুষুম্না পরিষ্কারের জন্যই সম্ভবতঃ অন্যতম উপায়রূপে তন্ত্রে মদ্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে মদ্যের শ্লেষ্মানাশক ও স্বরপরিষ্কারকশক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং বাত-শ্লৈষ্মিক যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে মদ্য সেবনের ব্যবস্থাও আছে। ঈদৃশ ক্ষেত্রেই "ঔষধার্থং সুরাং পিবেৎ" বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকার সুরাপানের বিধান দিয়াছেন। সুতরাং সংসার-রোগাক্রান্ত শ্লেষ্মা-ভিভূত তামসিক ব্যক্তির সুষুম্না ও স্বর পরিষ্কারার্থ মদ্যপানের ব্যবস্থা প্রদান অসঙ্গত নহে। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাংশ তাহার প্রমাণ :—

'মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ।
সেব্যতে মধুমাংসাদি তৃষ্ণায়া চেৎ সপাতকী ॥' মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

ফলে, লালসাচঞ্চল ইন্দ্রিয়ভোগবাসনা চরিতার্থের জন্য যাঁহারা মদ্যপান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে তন্ত্রকার বজ্রগম্ভীরনির্ঘোষে 'তৃষ্ণায়া চেৎ সপাতকী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথাযুক্তভাবে প্রযুক্ত হলাহল কালকূটও সময় বিশেষে অমৃতের ন্যায় উপকার করে। আবার অপপ্রয়োগে পরমকল্যাণকর অন্নরসও মানব দেহে প্রবেশ করিয়া জীবননাশের কারণ হয়। ফলতঃ অধুনা উচ্ছৃঙ্খল মানব-সমাজ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক যেরূপ অমিত-চারিতার পরাকাষ্ঠা অবলম্বনে সমাজ ও ধর্ম্মকে রসাতলে পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছে, তজ্জন্য তন্ত্র অপরাধী নহেন, অপরাধী আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি।

বর্ত্তমান তান্ত্রিক সমাজে বালক জন্মমাত্র বামাচারী বীর এবং শৈশব উত্তীর্ণ না হইতেই কৌল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মদ্য না হইলে তাহাদের নবজাত বালকের জন্মসংস্কার সুসম্পন্ন হয় না। তন্ত্র কিন্তু এইরূপ অবৈধ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। একটির পর একটি, এইরূপ স্তরে স্তরে ক্রমশঃ উন্নতিমার্গে আরোহণের কথাই শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

'আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদাবশ্যকং।
বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমোত্তমং।
তৎপশ্চাদতিসৌন্দর্য্য দিব্যভাবং মহাফলং ॥' রুদ্রযামল।

পক্ষান্তরে মদ্যপান করিলেই যে বীর হওয়া যায় না, তন্ত্র মুক্তকণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তন্ত্র বলেন,—

'সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।'

কিন্তু এক্ষণে আমাদের ধারণা অন্যরূপ। আমরা মনে করি, 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' ফলতঃ শাস্ত্রজ্ঞানহীন স্থূলবুদ্ধি ইন্দ্রিয়পরায়ণ কপটীদের ব্যবহারে তান্ত্রিক উপাসক সম্প্রদায় কলঙ্কিত ও তন্ত্রের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে।

বেদের মা 'হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' ইত্যাদি প্রত্যনুপ্রাণিত ও 'ন কৃত্বা প্রাণিনাং হিংসা মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ। নচপ্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং পরিত্যজেৎ' ইত্যাদি স্মৃতিনিষিদ্ধ বাক্যে অবৈধ প্রাণিহিংসা দৃষ্টতঃ 'শ্রুত্যুক্ত ও দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্চ খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি' ইত্যাদি দূষণীয় হইলেও, 'বায়ব্যাং শ্বেতছাগল মালভেত' ইত্যাদি স্মৃতিসম্মত প্রমাণে বৈধহিংসা সর্ব্বথা নিন্দনীয় বলিয়া মনে হয় না। বেদান্ত দর্শনের বৈধহিংসা বিচারেও ইহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে মীমাংসিত ও সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরবতারণা অনাবশ্যক।

অধুনা দুর্গোৎসবাদি ব্যাপারে বলি উঠাইয়া দিয়া সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অনেককেই বদ্ধপরিকর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পক্ষান্তরে যে অকালে ও অস্থানে অবৈধ উপায়ে রসনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে যাইয়া যে মহাপ্রাণিহত্যার স্রোত, প্রাবৃটের বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় খরবেগে প্রবাহিত হইয়া প্রতিনিয়ত মানব সমাজের কি মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে, সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। শুধু দেবোদ্দেশ্যে বলি উঠাইয়া দিলেই অহিংসুক হওয়া যায় না।

গীতা বলেন,—কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ানি বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ আসক্তিবশতঃ মনে মনে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের আকাঙ্ক্ষা প্রবল সত্ত্বেও দৃশ্য কর্ম্মত্যাগ করাকে মিথ্যাচার বা কপটাচার কহে। ঐহিক পারত্রিক উভয়তঃ ইহা অতীব

যস্ত্বিন্দ্রিয়ানিমনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

মানসিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযমপূর্ব্বক অগত্যাকল্পে ইন্দ্রিয়ের সেবা করাও কপটাচার হইতে শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ আন্তরিক হিংসাবৃত্তির নিরোধই অহিংসা, এবং হিংসার আসক্তি নিবৃত্ত হইলে অহিংসার ফলভূত বৈরতাও প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।'

অর্থাৎ অহিংসার প্রতিরোধ হইতে বৈরনিবৃত্তি সঞ্জাত হয়। সুতরাং আন্তরিক হিংসাবৃত্তি বিদ্যমানে বৈধ হিংসার নিয়মে বাধ্য থাকিয়া ক্রমশঃ সংযম অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন কোন তৈল ও ঔষধ প্রস্তুতার্থ জীবহিংসার আবশ্যক হয়। বহু প্রাণীর প্রাণরক্ষার জন্য এস্থলে জীবহিংসা সমর্থন না করিয়াই উপায় নাই। সেইরূপ তন্ত্রকারও আপ্য প্রকৃতিক লোকের সৌষুম্ন রোগে স্বরবিকার ও কুণ্ডলিনীশক্তির সুষুপ্তিঘোর নিরাময়ার্থ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদেও মাংসের বাতশ্লেষ্মজ স্বরবিকৃতি নিবারিকা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

'মূকতাং মিমিনত্বঞ্চ গদগদার্দ্দিতকে তথা।'

মহর্ষি মনু অসকৃৎ মদ্য মাংস নিষেধ করিয়াও মানবীয় নৈসর্গিক প্রবৃত্তির অনুকীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

সুতরাং ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, অযথা মাংসলোলুপ মদ্যাসক্ত বিলাসীদিগকে প্রশ্রয় প্রদানের জন্য মনু এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। মৎস্য ও মুদ্রা মদ্যমাংসের আলোচনার অন্তর্নিহিত বলিয়া পৃথক্ ভাবে আর তৎসম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অধুনা পঞ্চম তত্ত্বই আমাদের বিশেষ ভাবে আলোচ্য। বেদে আকাশ-প্রকৃতিক অতি-স্ত্রৈণ বহির্ম্মুখ ব্যক্তিদিগের জন্য পত্নীপ্রতীক নামক এক উপাসনা বিধি দৃষ্ট হয়। বেদান্তের প্রশস্ত সংগ্রহকার পঞ্চদশী তাহার অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন। পুরাণকারও তাহার প্রতিধ্বনি করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই বেদকথিত স্মৃত্যনুবৃত্ত পুরাণতত্ব তন্ত্রসম্মত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শেষ মৈথুনতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। কাজেই ইহা তন্ত্রের নিজস্ব হইলেও স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি নহে। একটি পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি অতি সহজে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত রাসলীলা তান্ত্রিক মকার সাধনের অত্যুত্তম উজ্জ্বল উদাহরণ। রাসলীলায় তন্ত্রের সেই নির্জ্জন নিশীথ রজনী, নয়নাভিরাম নিকুঞ্জ কানন, অনঙ্গ বিনোদন উপকরণ, পরকীয়া শক্তি গোপকন্যা, আর সেই সুষুম্নার কলগম্ভীর স্বরে অর্থাৎ বেণুরবে কামবীজ জপ সকলই আছে। 'জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং' বামদৃশ দীর্ঘ ঈকার, চন্দ্রাধিষ্ঠিত মন অর্দ্ধচন্দ্র তদীয় হরণকারী কলং বলিতেই ক্লীং বা কামবীজ এবং বেণুই সুষুম্না ফলতঃ শ্লেষ্মদোষ-হীন পরিষ্কার সুষুম্নসাধক স্বতঃই কলগম্ভীর বংশীনিনাদবৎ সুমধুরভাষী। তাই এস্থলে জপই বেণু স্বররূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। অবশ্য রাসলীলায় শক্তি শোধনের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু গোপিকাদিগের ন্যায় ভগবৎপ্রেমোন্মত্তা স্বভাবশুদ্ধা নায়িকার শোধনের আবশ্যকতা তন্ত্রেও বিহিত হয় নাই। সুতরাং তন্ত্রোক্ত মকার সাধনের অনুরূপ পৌরাণিক রাসলীলা মকার সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে ইহা ধর্ম্মের অঙ্গীয় কি না সন্দেহের বিষয় বটে। আর এ সংশয় নূতনও নহে। মহারাজ পরীক্ষিত এ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেন, তাহাতে সন্দেহের আভাস বেশ উপলব্ধি হয়।

'সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্যচ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বর॥
সকথং ধর্ম্ম-সেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরন ব্রহ্মণ্ পরদারাভিমর্ষণং॥' শ্রীমদ্‌ভাগবত।

সুতরাং এ প্রকার অনুষ্ঠান যে তৎকালে নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত না, এমন নহে।

কিন্তু বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে, রাসলীলায় লালসাপূর্ণ পার্থিব পাশব প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ রাসলীলায় কাম-প্রবণতার প্রধান ধর্ম্ম নায়িকানুসরণ দৃষ্ট হয় না, বরং তাহার বিপরীত তনু-মন-সমর্পণ-প্রয়াসিনী উন্মনা গোপিকাগণকে পরানন্দ লাভের উদ্দেশ্যে স্বতঃ প্রবৃত্তা হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে সমাগতা দেখিতে পাওয়া যায়। নায়িকা বাহুল্যও ভাববৈপরীত্যের অনুদ্যোতক। বিশেষ কামুকদিগের অবলম্বিত সনাতন প্রলোভন প্রথাও এ ক্ষেত্রে সর্ব্বথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। বরং সমাগত গোপললনাগণের চিত্ত পরীক্ষার্থ তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্তির ছলে ভগবান বলিতেছেন,—

'দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোপিবা।
পতিঃ স্ত্রীভি র্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভি রপাতকী॥
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ॥'

এইরূপে প্রতিষিদ্ধা গোপীরা বলিতেছেন,

'যৎ পত্যপত্য সুহৃদা মনুবৃত্তিরঙ্গ, স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তং।
অস্ত্বেব মেতদুপদেশপদেত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাং স্তনুভৃতাং কিলবন্ধুরাত্মা॥'

অর্থাৎ হে প্রিয়তম ধর্ম্মবিৎ! তুমি পতি-পুত্র সুহৃদের অনুবৃত্তি করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলিয়া যাহা বলিলে, তাহা সত্য। কিন্তু দেহধারিমাত্রেরই তুমি একমাত্র বন্ধু, আত্মা ও পরমপ্রিয়তম অতএব উপদেশদাতা তোমাতেই তাহা সম্পন্ন হউক। অর্থাৎ পতিপুত্রাদির আত্মারূপে তুমিই বিরাজিত সুতরাং তোমার সেবাতেই আমাদের সে কার্য্য সফল হইবে। তথাপি শ্রীভগবান্ তাহাদের চিত্তপরীক্ষার্থ বলিতেছেন,—

শ্রবণাৎ দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥

আমার শ্রবণ, মনন, ধ্যান এবং ভাবানুকীর্ত্তন যেরূপ আশুফলদায়ক, মৎসন্নিকর্ষ (সংযোগ-বিশেষ) তত সহজফলপ্রদ নহে। অতএব তোমরা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হও। অবশ্য শাস্ত্র-জ্ঞানহীন, স্বার্থাপহতচেতন, অবিবেকী কথকদের কুরুচিপূর্ণ অপব্যাখ্যার ফলে সরল-বিশ্বাসিজনের স্বচ্ছ অন্তঃকরণে এ সম্বন্ধে কুৎসিত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে জন্য শাস্ত্রকে অপরাধী করা যাইতে পারে না। তাদৃশ মূঢ়চেতা অনধিকারচর্চ্চা-

কারিগণই সেজন্য সম্পূর্ণদায়ী। সহৃদয় পাঠক বলুন দেখি, কোন্ কামাপহতচেতন ব্যক্তি লালসার প্রবল পীড়ন উপেক্ষা করিয়া এইরূপ সারগর্ভ উপদেশবাক্যে স্বেচ্ছায় স্বয়মাগত নায়িকাকে নিবারণ করিয়া স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে সমর্থ ?

গোপীরাও সাধারণের চক্ষে জার-সঙ্গতা বিবেচিত হইলেও সামান্য নায়িকা নহেন, প্রত্যুত্তরে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কি বলিতেছেন শুনুন,—

নোচেদ্বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা, ধ্যানেন যামো পদবীং পদয়োঃ সমেতে।

হে সখে ! যদি তুমি আমাদিগকে সাধনসঙ্গিনী না কর, তাহা হইলে বিরহানলদগ্ধ-দেহ বিশুদ্ধ হইয়া ধ্যানেই তোমার পদবী প্রাপ্ত হইবে। ইহা শুধু তাহাদের কথার কথা নহে—কার্য্যতঃ তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে।

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদেবাপ্যোহলব্ধ বিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তাঃ দধুর্ম্মিলিতলোচনাঃ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ তীব্রতাপধুতা শুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নিবৃত্তক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাহপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥

ভাবুক পাঠক ! একবার অন্তর্নিবিষ্ট-মনে গোপীদের ভাবের সহিত নিজভাব ঐক্য করিয়া দেখুন দেখি, ইহা কি কামুকীর কামাভিনয়নাসাধনাসিদ্ধ স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তির চরম উৎকর্ষ ? পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ চিত্র বিরল নহে কি ?

কৃষ্ণ দেখিলেন গোপীরা পরমাত্মভাবে বিভোর হইয়া ভাব-রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। উপযুক্ত বিবেচনায় তিনি তখন তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মূলে ভুল নাই।

চঞ্চল গোপাঙ্গনাগণ যেমন ভ্রমে পতিত হইয়া "আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহধিকং ভুবি"। অমনি অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তর ধীয়ত॥ ভাগবত।

আবার গোপীগীতায় বনভ্রমণক্লান্ত্যাৎকীর্ত্তনব্যপদেশে যখন তাহারা আত্মসুখবিসর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ বা পরমার্থসুখের জন্য লালায়িত হইয়া ঘৃণালজ্জাদি পাশপঞ্চক ছেদন করিলেন তখনই প্রকৃত সাধনসঙ্গিনীরূপে পরিগৃহীত হইলেন। তাসামাবিরভুচ্ছৌরিঃ সাক্ষান্মথমন্মথঃ। আবার সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথনকারী কৃষ্ণ তখন আবির্ভূত হইলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে রাসলীলার বাহ্যানুষ্ঠানদর্শনে প্রত্যক্ষ কামবিকারানুকারী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মূলে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

রেমে রমেশঃ ব্রজসুন্দরিভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।

আপন ছায়ার সহিত ক্রীড়াসক্ত শিশুদের ন্যায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত রমাপতি আত্মশক্তির

প্রতিচ্ছায়া-স্থানে ব্রজসুন্দরীদের সহিত তাদৃশ ক্রীড়ানিরত হইয়াছিলেন। শ্রীধর ইহার ব্যাখ্যায় কামজয়োক্তি বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন।

এই যোগজ সুখ যে দাম্পত্য-মিলনসুখের অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহা ভুক্তভোগী সাধক ছাড়া বুঝিবার ও বুঝাইবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। একবার এই রসে নিমজ্জিত হইতে পারিলে, আর পার্থিব যোগজ সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। স্ত্রীপুংবীজের অধঃস্খলন বাসনাও সমূলে নির্ম্মূল হয়। সুতরাং ইহাকে কামজয় না বলিয়া আর কি বলিব ?

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জানা যায়, দীর্ঘকালযাবৎ এই ক্রীড়া চলিতেছিল। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ সংযোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সন্তানসন্ততিজননের কথা উক্ত গ্রন্থের কুত্রাপিও উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং রাসলীলা যে মন্মথ-বিকারের পরিচায়ক নহে ইহা ধ্রুব সত্য। বিশেষতঃ ঔপপত্য তৎকালে গুরুতর দোষাবহ বিবেচিত হইলেও স্ত্রীকন্যাগণকে পাপপথে পরিচালনে প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিদের কোনরূপ অসূয়া প্রকাশ না করা কথনই সম্ভবপর নহে।

নাসূয়ন খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানঃ স্বপার্শ্বস্থান স্বান স্বান দারান ব্রজৌকসঃ॥

এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যে স্বাধীনেচ্ছ যোগোদ্ধিসম্পন্ন উর্দ্ধরেতাঃ সিদ্ধসাধক ছিলেন। তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই জন্যই মহাভাগ শ্রীধর রাসপঞ্চকের টীকোপ ক্রমণিকায় "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত" ইত্যাদির ব্যাখ্যায় দৃঢ়তার সহিত রাসলীলা কামবিজয়ের অনুদ্যোতক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ সকল সাধনাগম্য সূক্ষ্মবিষয় আমাদের ধরণাতীত সত্য কিন্তু তা বলিয়া আধুনিক নব্য-সম্প্রদায়ের ন্যায় রাসলীলাকে পাশবলীলার পরাকাষ্ঠা বা সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমরা মনে করিতে অসমর্থ।

বাস্তবিক যুগ-মাহাত্ম্যে এবং অনধিকারী দুর্ব্বৃত্তদের যথেচ্ছাচারিতার ফলে প্রকৃত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হওয়ায় আজ তন্ত্রের এতাদৃশী দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, পাশ্চাত্য মনীষীবর্গ তন্ত্রে সার সত্যের অনুসন্ধান পাইয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে ইচ্ছাশক্তির সাধনায় যথেষ্ট উন্নতিলাভও করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, ভগবান্ তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন—পৃথিবীর মঙ্গল হউক। তবে একটা প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয় যে, কন্দর্পবিজয়ের কি আর অন্য উপায় ছিল না যাহার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই অশ্লীল ঘটনার অবতারণা করিলে হইয়াছিল ? ছিল বৈ কি।

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥

শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপায় অনেক বিদ্যমান আছে। বরং "ন তথা সন্নিকর্ষেণ" সংযোগজ উপায় সেরূপ নির্ব্বিঘ্ন নহে। বাস্তবিক এইজন্যই এই সকল উপাসনা অতি সংগোপনে সাধারণের অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠানের বিধি। সেই শাস্ত্রাদেশ অবহেলার ফলেই এই বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ। যাহাহউক মূল গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাউক।

রেমে তয়াস্বাত্মারত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাং॥

সর্ব্বশেষ উত্তর,—অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "নম্বেবং আপ্তকামস্য নিন্দিতে কুতঃ প্রবৃত্তিরিত্যত আহ আপ্তকামস্যেতি শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচেতনো অতিবহির্ম্মুখানপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি-ভাবঃ॥ সুতরাং স্পষ্টই কথিত হইল যে, আদিরস-সমাসক্ত অতি বহির্ম্মুখ বিষয়িদিগকে আত্ম-পরায়ণ করিবার জন্য আদর্শপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও লোকলোচনের কণ্টকস্বরূপ রাসলীলা অর্থাৎ তান্ত্রিক মকার সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এখন দেখিতে হইবে মকার সাধনের উন্নত প্রণালী কি? যেরূপ শর্করাদি উৎকৃষ্ট মধু দ্রব্য না দিয়া কদলীলোলুপ পিপীলিকার কদলী-প্রবণতা নিবারণ করা যায় না, তদ্রূপ কেবলমাত্র শুষ্ক উপদেশের দ্বারাও সংসারাসক্ত জীবের আসক্তি বারণের চেষ্টা করা বৃথা। শৈশবে ও বাল্যে ধূলিখেলায় প্রমত্ত এবং যৌবনে যুবতী-রসরঙ্গে নিমজ্জিত জীবকে তদপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর রসের আস্বাদ দিতে না পারিলে, তাহাকে সে আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত করা সম্ভবপর নহে।

শৃঙ্গার ও মধুর রসের মিষ্টতা মানুষ কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারে না। অন্য রসের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন কিম্বা অসংসৃষ্ট দূর ব্যবস্থাপনের দ্বারাও তাহার চিত্তহরণ সম্ভবপর নহে। সকল প্রযত্ন, সকল চেষ্টা, স্রোতোমুখে নিক্ষিপ্ত তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়। সুতরাং তৈলাক্ত-পলিতা-সংযোগে একস্থান হইতে স্থানান্তরে অগ্নি লওয়ার ন্যায় ভোগের মধ্য দিয়া সংসারাসক্ত জীবকে মুক্তিপথে আকর্ষণের জন্যই তন্ত্রের সৃষ্টি। এবং এই উদ্দেশ্যে পরম কারুণিক তন্ত্রকার পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে মানুষের প্রকৃতি ও আসক্তি অনুযায়ী মকার-সাধনের বিধান করিয়াছেন। যোগিজন দুর্লভ মহাযোগজ পরমানন্দহ্রদে লইয়া যাওয়ার জন্য জীবের প্রবৃত্তি-স্রোতস্বতীর সহিত মকাররূপ প্রণালী খননপূর্ব্বক পরস্পর সংযোজন করিয়া দিয়াছেন ইহাই তন্ত্রের বিশেষত্ব।

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

নবম বর্ষ—প্রথম মাসিক অধিবেশন

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০; ২৫শে মে, ১৯১৩, রবিবার। সময় অপরাহ্ণ ৫॥টা।

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস সভাপতি
" ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট
" ভৈরবগিরি গোস্বামী জমিদার
" মোহিনীমোহন লাহিড়ী জমিদার
" বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুন্‌সেফ
" প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস
" কালীকান্ত বিশ্বাস
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে মোক্তার
" কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ
" মদনগোপাল নিয়োগী
" বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি এল্
" পণ্ডিত হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ সহঃ সম্পাদক
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়

১। দিনাজপুর উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন। ২। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ৩। সদস্য বির্ব্বাচন। ৪। গ্রন্থ-উপহারদাতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৫। প্রদর্শন—এই সভার ছাত্রসদস্য শ্রীমান্ কালীপদ বাগচী কর্ত্তৃক সংগৃহীত মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের বাড়ীর কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক। ৬। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত লিখিত "গৌড়-পাণ্ডুয়া প্রদর্শক।" ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

সভাপতি মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সন্ন্যাসরোগে কলিকাতা নগরীতে অকালমৃত্যুবার্ত্তা প্রদান পূর্ব্বক এ সভার পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সবিষাদে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

১। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুরে আহূত ষষ্ঠ অধিবেশনে এ সভার পক্ষ হইতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস সভাপতি
" রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল বাহাদুর সহঃ সভাপতি

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল
" ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।
অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ
" বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, মুন্সেফ
" রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর, এম, আর, এ এস্ জমিদার,

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার

" ভৈরবগিরি গোস্বামী জমিদার।

" গোবিন্দকেলী মুন্সী জমিদার।

" দীননাথ বাগচী বি, এল।

" কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ

" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

" আকবর হোসেন চৌধুরী।

" শেখ রেয়াজুদ্দিন আহাম্মদ।

" চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

" মদনগোপাল নিয়োগী

" হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার

সহঃ সম্পাদক।

এতদ্ব্যতীত অনেক ছাত্রসদস্য সম্মিলনে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় সভা তাঁহাদিগকে যোগদানের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলেন।

২। গত অষ্টম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। এই অধিবেশনে কোনও সদস্য নির্ব্বাচিত হয় নাই।

৪। শ্রীমান্ কালীপদ বাগ্‌চী কর্তৃক উপহৃত "চৈতন্য মঙ্গল" সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত ও সংগ্রাহককে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

৫। উক্ত ছাত্রসদস্য কর্তৃক সংগৃহীত ও উপহৃত রাজা সীতারাম রায়ের বাড়ীর কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক প্রদর্শিত এবং ধন্যবাদ পুরঃসর সভার চিত্রশালায় গৃহীত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "গৌড়-পাণ্ডুয়া প্রদর্শক" প্রবন্ধ পড়িবার সময় না হওয়ায় উহা আগামী অধিবেশনে পঠিত হইবে।

৭। শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম,এ, বি,এল মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে,—"স্বনামখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অকাল মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গবাসী ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কবিবরের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ অদ্য যে শোকপ্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত হইল তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, এতন্নিমিত্ত এ সভার উদ্যোগে রঙ্গপুর জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হউক।" এ প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, আগামী ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন, রবিবার, ধর্ম্মসভা গৃহে অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে এই সভা আহূত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর ৬॥০ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দে
সভাপতি।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ

বিশেষ অধিবেশন।

রবিবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ (১৩২০), ১ জুন (১৯১৩),

সময় অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা

এই অধিবেশনে রঙ্গপুরের জনসাধারণ সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এই সভার প্রারম্ভে ছাত্র-সদস্যগণ কর্তৃক স্বর্গীয় কবিবরের রচিত সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গ আমার জননী আমার" ইত্যাদি গানটি সুললিত স্বরে গীত হয়।

সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন — দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার এই অভিজ্ঞতার ফলে Crops of Bengal নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কবিবরের জীবনী তিন অংশে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম বিলাত হইতে আসিয়া তিনি সমাজে থাকিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সমাজ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি মর্ম্মাহত হইয়া সমাজের রক্ষণশীলতার উপরে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করেন।

দ্বিতীয়তঃ তৎকালে মার্জ্জিত হাস্যরসাত্মক কবিতাদির বঙ্গভাষায় অভাব ছিল। তিনি পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রথম এরূপ কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে মার্জ্জিত বিদ্রূপাত্মক নব্য সমাজের রুচিসঙ্গত কবিতা বঙ্গভাষায় লেখা হইত না। তাঁহার "কল্কী অবতার" নামক এই ধরণের গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তাঁহার লিখন-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটে। করুণ ও হাস্যরসের মিশ্রণে তাঁহার 'মন্দ্র'নামক গ্রন্থ লিখিত হয়। ইংরাজী সাহিত্যেও এই উভয় রসের একত্র সমাবেশ বিরল। এতদ্দ্বারা বঙ্গভাষায় তিনি একটি নূতন যুগের প্রবর্ত্তকরূপে উল্লিখিত হইতে পারেন। তৃতীয়, শেষ জীবনে তিনি স্বদেশীগান ও নাটক-রচনায় ব্রতী হন। তাঁহার স্বদেশীগানে সমগ্র বঙ্গ মুগ্ধ। নাটকের মধ্যে "দুর্গাদাস" শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এক বর্ষের অবকাশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত সাহিত্য-সেবা করিতে ব্রতী হ'ন, এবং ভারতবর্ষের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনাতেও তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। ভবভূতির সমালোচনা, যাহা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়, তদ্দ্বারা তাঁহার এতদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যতার পরিচয় সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। আমাদিগের দুর্ভাগ্য, তাঁহার এই উদ্যম অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

সভাপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল মহাশয় নিম্ন-লিখিত শোক প্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

প্রস্তাব।

রঙ্গপুরের জনসাধারণ স্থানীয় সাহিত্য-পরিষদের আহ্বানে মিলিত হইয়া প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার স্বর্গগত আত্মার সদ্গতির এবং শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গের সান্ত্বনালাভার্থ ভগবানের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা করিতেছেন। সভার এই মন্তব্য কবিবরের পরিবারবর্গের নিকটে প্রেরণের নিমিত্ত পরিষৎ-সম্পাদককে অনুরোধ করা হউক।

এই প্রস্তাব উত্থাপন পূর্ব্বক তিনি কবিবরের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত এ, এফ্, এম, আব্দুল আলী, এম,এ, এম, আর, এ, এস, এল প্রভৃতি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন প্রসঙ্গে বলিলেন যে, পূর্ব্ব বক্তা বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তদপেক্ষা অধিক কিছু বলিবার নাই। বঙ্গসাহিত্যে বিদ্রূপ ও হাস্য রসের স্রষ্টা বলিয়া কবিবর উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে বঙ্গসাহিত্যের সম্যক্ পুষ্টি সাধিত হইত। তাঁহার মৃত্যু বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিধু বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।

কবিবরের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সমগ্র সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় কবিবর সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, গত মাসিক অধিবেশনে স্থির হয় যে, রঙ্গপুর জনসাধারণের এক অধিবেশনে স্বর্গীয় কবিবরের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা হইবে। তদনুসারে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ এই অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। অধিবেশনের আশাতীত সাফল্যে কবিবরের প্রতি দেশবাসী কিরূপ আকৃষ্ট, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সাহিত্যিক জীবন ছাড়িয়া বাস্তব জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় যে, তিনি রাজকার্য্যে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তীব্র সমালোচনায় নব্য সমাজের বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

কবিবরের রচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিলাত গমনের স্পৃহা বৃদ্ধি হয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, এ কারণে আমি নিজে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষত্ব ছিল যে, যিনিই তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার কোনও শত্রু ছিল না। আমাকে এরূপ অকৃত্রিম বন্ধুবরের শোক-সভায় সভাপতিত্ব করিতে হইবে, ইহা কখনও ভাবি নাই।

অতঃপর সৈয়দ আবুল ফতা সাহেব বর্ত্তমান অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর ৭টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীকিরণচন্দ্র দে
সভাপতি

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ১৫ই আষাঢ় (১৩২০), ২৯শে জুন (১৯১৩),

সময় অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ বাহাদুর সভাপতি।
„ পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ সহঃ সভাপতি।
„ এককড়ি স্মৃতিতীর্থ।
„ হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।
„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল।
„ অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ।
„ মদনগোপাল নিয়োগী।
„ মথুরানাথ দে।
শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার দাস গুপ্ত।
„ গুরুদাস ভট্টাচার্য্য (ছাত্র সদস্য)
„ কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। মহামান্য বঙ্গীয় গভর্ণর বাহাদুরের আগামী শীত ঋতুতে রঙ্গপুর পরিদর্শন উপলক্ষে এ সভার পক্ষ হইতে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা। ৫। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার মহাশয়ের উপহৃত দিনাজপুর বাণগড়ে প্রাপ্ত মীনাকরা বিবিধ প্রকারের মৃৎভাণ্ডের অংশ ও প্রস্তর নির্ম্মিত মকরাকৃতি পয়ঃপ্রণালী। (খ) শ্রীযুক্ত কালীদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপহৃত ধুরইল রাজবাটীতে প্রাপ্ত কারুকার্য্যবিশিষ্ট কয়েকখানা ইষ্টক এবং দুইখানা প্রাচীন পুথি। (৬) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের লিখিত "গৌড়পাণ্ডুয়া প্রদর্শক" ২য় অংশ। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সদস্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, আর, এস্। ২৬নং সুকীয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা।	শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী	শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর।	„	„

সদস্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার বি, এ, মোরাদপুর, পাটনা।	শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী	শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ ভবতারণ লাহিড়ী এম, এ, বি, এল রঙ্গপুর।	„	„
„ টঙ্কনাথ চৌধুরী জমিদার মালদুয়ার, রাণীশঙ্কল পোষ্ট, দিনাজপুর।	„	„
শ্রীযুক্ত এম্‌, চৌধুরী জমিদার দুর্গাগঞ্জ, পূর্ণিয়া।	„	„
„ আশুতোষ মিত্র সাবডিনেট জজ্‌ রঙ্গপুর।	সম্পাদক	শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ হরকালী সেন ডাক্তার রাইগঞ্জ, দিনাজপুর।	„	„
„ দুর্গাকমল সেন সবরেজিষ্ট্রার	„	„
„ ললিতচন্দ্র সেন বি, এল, দিনাজপুর।	„	„
„ সুরেশচন্দ্র ঘটক এম, এ, এম, আর, এ, এস সবডিভিসনাল অফিসার ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর।	„	„
„ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার বাহিন, দিনাজপুর।	শ্রীযুত কালিদাস চক্রবর্ত্তী	শ্রীযুত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী
„ হরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ঐ জমিদার।	„	„
„ নগেন্দ্রবিহারী রায় চৌধুরী জমিদার হরিপুর, জীবনপুর পোষ্ট, দিনাজপুর।	„	„
„ বনওয়ারীলাল দাস মোক্তার দিনাজপুর।	„	„
„ মুনসী মেহেরুদ্দিন আহাম্মদ মোক্তার দিনাজপুর।	„	„
„ যদুনাথ মিত্র নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।	শ্রীমদনগোপাল নিয়োগী	শ্রীহরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ।

সদস্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশঙ্কর চৌধুরী পাতিলাদহ কাছারী, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত মদনগোপাল নিয়োগী	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ।

৩। ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্নোক্ত গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

	উপহার দাতারনাম
অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ মধুমালার কেচ্ছা।	শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

৪। মহামান্য বঙ্গীয় গভর্ণর বাহাদুরের আগামী শীত ঋতুতে রঙ্গপুর পরিদর্শন উপলক্ষে এ সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইবে। তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর ন্যস্ত রহিল।

৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার মহোদয়ের সংগৃহীত দিনাজপুর বাণগড়ে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্ম্মিত মকরাকৃতি পয়ঃপ্রণালী ও মীনাকরা মৃৎভাণ্ডের অংশগুলি এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপহৃত ধুরইল রাজবাড়ীতে প্রাপ্ত কারুকার্য্য খচিত কয়েকখানা ইষ্টক প্রদর্শিত ও সংগ্রাহকগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

৬। "গৌড়-পাণ্ডুয়া প্রদর্শক" পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধের লিখিত স্থান ও পথগুলি দ্বারা গৌড়পাণ্ডুয়া ভ্রমণকারীদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আমরা আশা করি যে, হরিদাস বাবু শীঘ্রই এই প্রবন্ধের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিবেন। এই প্রবন্ধের জন্য হরিদাস বাবুকে সভা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক	শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

রবিবার, ১ ভাদ্র (১৩২০), ১৭ আগষ্ট (১৯১৩),

সময়—অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি।

শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস্ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, বাহাদুর সহঃ সভাপতি।

„ এ, এফ্, এম্ আবদুল আলী এম্ এ, এফ, আর, এস, এল্ ইত্যাদি ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্।

শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

„ কুঞ্জবিহারী হার এম্, এ, বি এল্।

শ্রীযুক্ত ভৈরবগিরি গোস্বামী জমিদার।
, আকবর হোসেন চৌধুরী জমিদার।
, যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ, রঙ্গপুর।
, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্।
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্।
" যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্।
" মৌলবী কোরবান্ উল্লা স্পেশাল সবরেজিষ্টার।
" প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল।
" কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী
অনন্তকুমার দাস গুপ্ত।
পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।
চন্দ্রমোহন ঘোষ।
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
যদুনাথ মিত্র।
রাজেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত গ্রন্থাধ্যক্ষ।
পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ পত্রিকাধ্যক্ষ।

, পণ্ডিত হরেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ
, মদনগোপাল নিয়োগী।
, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, বি, এল।
, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।
} সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়।

১। বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা মহামান্য বঙ্গীয় গভর্ণর বাহাদুরের রঙ্গপুরে শুভাগমন সংবাদে এ সভার পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ ও অভ্যর্থনাদির ব্যবস্থা। ২। ছন্দবোধ শব্দ-সাগরপ্রণেতা কুণ্ডীর স্বর্গীয় কালীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। ৩। মন্থনার ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী কর্ত্তৃক এ সভার গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে এক কালীন বার শত টাকা দানের ঘোষণা ও তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ৫। সদস্য নির্ব্বাচন। ৬। পুস্তক ও পুথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৭। প্রদর্শন—ধাপ মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমদাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক উপহৃত একটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা। ৮। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ মহাশয়ের লিখিত "সদ্গ্রন্থের তালিকা" (খ) শ্রীযুক্ত নবাবজাদা এ, এফ এম্ আবদুল আলী এম্ এ, এফ্, আর, এ, এস, এল ইত্যাদি মহাশয়ের রচিত "ঢাকার মসলিন্" ৯। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। বঙ্গীয় গভর্ণর বাহাদুরকে রঙ্গপুরে শুভাগমন উপলক্ষে অভিনন্দন প্রদান সম্বন্ধে কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নোক্ত নির্দ্ধারণ গৃহীত হইল—

মহামান্য বঙ্গীয় গভর্ণর বাহাদুরকে সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হউক। প্রাচীন পুঁথির আকারে রৌপ্য-নির্ম্মিত আবরণীযুক্ত সুবর্ণরঞ্জিত রৌপ্য-পত্রে বঙ্গভাষায় রচিত অভিনন্দন-পত্রান্তর্গত বিষয় খোদিত করা হইবে। এই অভিনন্দন পত্র রচনার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল। এতদ্ব্যতীত গভর্ণর বাহাদুরের সুবিধা অনুসারে সভার চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদি তৎকালে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। ছন্দবোধ শব্দসাগর-প্রণেতা কুণ্ডীর স্বর্গীয় কালীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে এ সভার পক্ষ হইতে শোক প্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপনপূর্ব্বক সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে—ইনি ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনকালে তৎশিক্ষা লাভ করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং মুন্‌সেফের পদে ক্রমে উন্নীত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পরে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে ইঁহার চেষ্টা প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাহারই ফলে "ছন্দবোধ শব্দ-সাগর" নামক অভিনব ছন্দ অভিধানের জন্ম। এই গ্রন্থে তিনি রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষার অনেক শব্দ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। সে গুলি বাছিয়া বাহির করিলে যাঁহারা এতদ্দেশীয় ভাষার উৎপত্তি তত্ত্বালোচনা ও শব্দসংগ্রহ করিতেছেন তাঁহাদের যথেষ্ট সাহায্য হইবে। এই গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত ইনি বহুব্যয়ে স্বগৃহে একটি প্রেস স্থাপন করিয়া আপন তত্ত্বাবধানে গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য শেষ করেন। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ মৌলিক' বলিয়া সুধীসমাজে ইহার যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীর মধ্যে এখনও সদ্‌গ্রন্থের পাঠক সংখ্যা অতি বিরল। ইঁহার রচিত গ্রন্থের পাঠক সংখ্যা অধিক হইল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া ইনি স্বরচিত গ্রন্থ খানি পণ্ডিত সমাজে বিতরণ করিলেন, কতক কীটের উদরপূর্ণ করিল। কালীমোহন রায় মহাশয়ের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় তাঁহার ঐ অমূল্য গ্রন্থই দিতেছে। ইঁহার জন্মে কুণ্ডী ধন্য হইয়াছে—উত্তরবঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। "সরস্বতী" প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার জীবনী, ইনি জীবিত থাকিতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি ইংরেজী ভাষায় রচিত A Short Sketch of Life of Babu Kali Mohan Roy নামক একখানি পুস্তিকায় স্বীয় জীবনের কর্ম্ম পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে সে কালের ইংরেজী শিক্ষার অবস্থা এবং রঙ্গপুরে তাহার প্রচলনের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। এই সভার প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল; তাঁহার মৃত্যুতে সভার আন্তরিক ক্ষোভের কারণ হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল মহাশয় সমর্থন প্রসঙ্গে বলিলেন যে এতদ্দেশীয় সাহিত্যিকের সংখ্যা বিরল, একরূপ নখাগ্রে গণনা করা যায়। তাহার মধ্যে একজন চিরঅন্তর্দ্ধান করিলে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। স্বর্গীয় কালীমোহন

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে অকাতরে শ্রম করিয়া গিয়াছেন। পদ্য-রচনায় ব্রতী-দিগের পক্ষে তাঁহার "ছন্দবোধ শব্দসাগর" যথেষ্ট সহায়তা করিবে; রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুরের একজন প্রথিত নামা সাহিত্যিকের অভাব বোধ অবশ্যই করিবেন। এবং এজন্য সদস্যগণের শোক-প্রকাশক মন্তব্য গৃহীত হওয়ার প্রস্তাব সঙ্গতরূপেই উত্থাপিত হইয়াছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সমর্থন করিতেছি।

৩। মন্থনার দানশীলা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা ভবসুন্দরী দেবীচৌধুরাণী এ সভার-গৃহ নির্ম্মাণার্থ এককালীন ১২০০৲ শত টাকা দান করিয়াছেন তাহা সাদরে গৃহীত হইল। এজন্য সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইতেছে। সভার এই মন্তব্য ভূম্যধিকারিণী মহাশয়ার নিকটে সভাপতি মহাশয়ের মধ্যবর্ত্তীতায় পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছে।

৪। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি গৃহীত হইল।

৫। টেপার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন রায়চৌধুরী মহাশয় এ সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে ২০০০৲ টাকা এককালীন দান করায় তাঁহাকে সভার আজীবন সদস্যরূপে গ্রহণার্থ প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী মহাশয় উপস্থাপিত ও নবাবজাদা শ্রীযুক্ত এ, এফ, এম আব্দুলআলী মহাশয় তাহা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি সভার আজীবন সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভার গৃহ নির্ম্মাণার্থ এককালীন ৫০০৲ দান করিয়াছেন। সভার গৃহনির্ম্মাণের নিমিত্ত আপততঃ ঐ টাকার প্রয়োজন হইবে না সুতরাং স্থায়ী ধন-ভাণ্ডারে তাঁহার এ দান পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে সভার আজীবন সদস্যরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব মহারাজার অনুমতি সাপেক্ষে সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

৬। ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্নলিখিত গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

গ্রন্থের নাম	উপহার-দাতার নাম
হস্তীতত্ত্ব	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

৭। ধাপ মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমদাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক উপহৃত রৌপ্য-মুদ্রা উপহার-দাত্রীকে ধন্যবাদ পুরঃসর সভার চিত্রশালায় গৃহীত হইল।

৮। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক এই সভার বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, মহাশয়ের "সদ্‌গ্রন্থের তালিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হইল এই প্রবন্ধ সভার মুখপত্রে পত্রিকা-সম্পাদকের অনুমতি সাপেক্ষে প্রকাশিত হইবে স্থির হইল।

অতঃপর প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মতামত আহুত হইলে শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন যে, Sir John Lubock পরে Lord Avsbury তাঁহার "Pleasures of Life গ্রন্থে এক শত সদ্‌গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রবন্ধ লেখক বাঙ্গালা পুস্তকের সেইরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন। অধুনা মুদ্রাযন্ত্র রাশি রাশি বাঙ্গালা পুস্তক প্রসব করিতেছে। তন্মধ্য হইতে সাধারণের পক্ষে সদ্‌গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করা কঠিন ব্যাপার।

পরিষদের স্থায় বিদ্বন্মণ্ডলী এই তালিকা প্রস্তুত করিলে পাঠকগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এই সাধু প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া কর্ত্তব্য নিদ্ধারিত হওয়া সঙ্গত। বিধুবাবুর এই প্রস্তাব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর নবাবজাদা শ্রীযুক্ত এ, এফ্, এম আব্দুল আলী এম, এ, মহাশয় তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত "ঢাকার মসলিন্" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধসম্বন্ধে মতামত আহুত হইলে শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় বলিলেন যে, ঢাকার মসলিনের উন্নতি সাধন অসম্ভব। যে তুলা হইতে মসলিন প্রস্তুত হইত এক্ষণে আদৌ তাহার সত্বা এতদ্দেশে নাই। ঢাকার তন্তুবায়গণ আর এখন মোটা সুতাও প্রস্তুত করিতে পারে না। বিদেশীয় সূত্র দ্বারা ঢাকা ও শান্তিপুরের সূক্ষ্ম বস্ত্র এক্ষণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ গভর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় বলিলেন, যে তুলা দ্বারা ঢাকার মসলিনের সূত্র প্রস্তুত হইত গভর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগ হইতে সে তুলা উৎপন্ন করার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত সকলকাম হইতে পারা যায় নাই।

নবাবজাদা আলী সাহেব শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, ঢাকার মস্‌লিনের অনাদর হওয়ায় উহা উৎসাদিত হইয়াছে। শিল্পীগণ দরিদ্র, তাহাদিগের নিকট হইতে মাটীর দরে মসলিন গ্রহণপূর্ব্বক বণিকেরা বিদেশে বিক্রয় করিয়া ধনী হইয়াছে। শিল্পীগণ অন্নাভাবেই ঐ ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছেন। ঢাকায় এখনও দুই তিন ঘর শিল্পী উৎসাহ পাইলে সে কালের স্থায় মসলিন প্রস্তুত করিতে পারে। ত্রিপুরার মহারাজার জন্ম ঢাকা হইতেই চারিশত টাকা মূল্যের সাড়ী এখনও প্রস্তুত হয়। ঢাকার তন্তুবায়গণ এখন মোটা কাপড়ই প্রস্তুত করে, দশটাকা মূল্যের এই মোটা কাপড় তন্মূল্যের বিদেশীয় কলের কাপড় অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল। এতদ্দেশীয় ধনী সন্তানগণের রুচির পরিবর্ত্তনই এই সূক্ষ্ম শিল্পের ধ্বংস সাধনের কারণ। বিদেশে এখনও সূক্ষ্ম বস্ত্রের আদর আছে। যদি ধনীগণ মসলিন বিদেশে রপ্তানি করার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে যথেষ্ট লাভবান হইবেন এবং মসলিনেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধ গবেষণাপূর্ণ, ইহা বঙ্গ ভাষায় অনূদিত হইয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঢাকায় এক পোয়া ওজনের ৩০ গজ মসলিনের মূল্য তিন শত টাকা দেখিয়াছি; কিন্তু তাহা অনেক কাল পূর্ব্বের প্রস্তুত বলিয়া বোধ হইল। প্রবন্ধ রচয়িতাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৮ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দে
সভাপতি।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

রবিবার ২২ ভাদ্র ১৩২০, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

সময় অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি এস সভাপতি।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।
" রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল বাহাদুর।
" পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্ককণ্ঠ।
" " যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
" শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু।
" পূর্ণেন্দুশেখর বাগচী।
" গোবিন্দ কেলী মুন্সী জমিদার।
" পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্যনির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন (ক) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের উপহৃত মৃত্তিকা নিম্ন হইতে উদ্ধৃত ধাতুনির্ম্মিত গণেশ-মূর্ত্তি। (খ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশকর্ত্তৃক সংগৃহীত সভাকর্ত্তৃক ক্রীত দুইটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা

৫। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের কুণ্ডীর ইতিবৃত্ত। (খ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের "বাঙ্গলা ভাষার ক্রিয়াপ্রকরণ।" ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

সভা-প্রারম্ভে সম্পাদক মহাশয় দুঃখের সহিত এ সভার আজীবন সদস্য কোচবিহার মহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের বিলাতে অকাল-মৃত্যুবার্ত্তা প্রদানপূর্ব্বক রাজমাতা ও ভূপবাহাদুরের অনুজ বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের নিকটে সভার পক্ষ হইতে সমবেদনাজ্ঞাপনের প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল বাহাদুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিতে উহা পরিগৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিক্রমপুর ধলছত্রনিবাসী সানুবাদ সটীক কলাপ ব্যাকরণ, রচনানুবাদ শিক্ষা, সামবেদের আগ্নেয়পর্ব্ব প্রভৃতি গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা পণ্ডিত ৺গুরুনাথ কাব্যতীর্থ বিদ্যানিধি মহাশয়ের ৩৯নং বসুপাড়ালেন কলিকাতা স্থিত ভবনে অকাল মৃত্যু সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গের নিকটে সভার পক্ষ হইতে সম-

বেদনা জ্ঞাপনের দ্বারা সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিতে উহা পরিগৃহীত হইল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ-যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সদস্য	প্রস্তাবক	সমর্থক
(১) শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ চৌধুরী খোলাহাটি গাইবান্দা, রঙ্গপুর	সম্পাদক	সহকারী সম্পাদক
(২) আইন উদ্দিন আহাম্মদ ঐ	ঐ	ঐ
(৩) সূর্য্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ সবরেজিষ্ট্রার, কিশোরীগঞ্জ-রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
(৪) অখিলচন্দ্র দাসগুপ্ত সবআসিণ্টাণ্ট-সার্জ্জন ঐ	ঐ	ঐ
(৫) কানাইয়াসারন কাশীবাল ৺কালীবাড়ী রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ধন্যবাদ পুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

গ্রন্থের নাম	উপহার-দাতার নাম
অর্থনীতি	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
অর্থশাস্ত্র	
সমসাময়িক ভারত	
ভগবৎ-তত্ত্ব	শ্রীযুক্ত গোবিন্দ কেলীমুন্সী।

৪। (ক) ধন্যবাদ পুরঃসর সভার চিত্রশালায় কুণ্ডীর পুষ্করিণী খননকালে প্রাপ্ত ধাতু-নির্ম্মিত গণেশ-মূর্ত্তি যাহা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় উপহার প্রদান করিয়াছেন গৃহীত হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশকর্ত্তৃক সংগৃহীত সভাকর্ত্তৃক ক্রীত আহোমরাজের একটি এবং পারসীক লিপিযুক্ত একটি মোট দুইটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদর্শিত হইল।

৫। সময়াভাবে বিজ্ঞাপিত প্রবন্ধদ্বয় আগামী অধিবেশনে পঠিত হইবে স্থির হওয়ার পর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রাত্রি ৭টার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত
সভাপতি।

নবমবর্ষ—বিশেষ অধিবেশন।

শুক্রবার ১৪ কার্ত্তিক (১৩২০) ৩১ অক্টোবর, ১৯১৩

সময় অপরাহ্ণ

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত রাজা গোপাললাল রায় সভাপতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস সভার সভাপতি।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন
পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ পত্রিকাধ্যক্ষ
অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
সিদ্ধেশ্বর সাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টেক্‌নিক্যাল স্কুল
প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী
যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এল
রাধারমণ মজুমদার জমিদার
বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার
শরচ্চন্দ্র মজুমদার
রাধাকৃষ্ণ রায় উকীল
রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী মোক্তার
সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মোক্তার
„ দুর্গাচরণ সান্ন্যাল বি, এল জলপাইগুড়ী

শ্রীযুক্ত মদনগোপাল নিয়োগী
বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল
অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল
আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই
কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল
ভুবনমোহন সেন
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার
ডাক্তার মহম্মদ মোজাম্মল
দীননাথ বাগচী বি, এল
অনন্তকুমার দাসগুপ্ত
লোকনাথ দত্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিমলা রাজবাড়ী
ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়

এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয় সভাপতিত্ব গ্রহণের অত্যল্প কাল মধ্যে সভার মামা হিত সাধনপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন হেতু এ সভার পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

নির্দ্ধারণ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত রাজা গোপাললাল রায় অন্ত দিবসীয় অধিবেশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে সম্পাদক মহাশয় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলিলেন যে, রঙ্গপুরের সুযোগ্য কলেক্টর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয় সাত মাস পূর্ব্বে সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সভার হিতকল্পে বিবিধ চেষ্টার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতকাল সভার নিজস্ব কোনও গৃহ না থাকায় সংগৃহীত দ্রব্যাদি সুরক্ষিত হইতে পারে নাই। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের যত্নে এড্ওয়ার্ড স্মৃতিভবনের সহিত এ সভার চিত্রশালাদির নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। এইরূপে সভার গৃহাভাব দূর করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, উহার স্থায়ী ধন-ভাণ্ডারে দুই হাজার এবং গৃহ-নির্ম্মাণ-তহবিলে বারশত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া সভার আর্থিক সচ্ছলতা বিধান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট তহবিল হইতে বর্ত্তমান বর্ষে এক শত দশ টাকা এককালে তাঁহারই যত্নে প্রদত্ত হইয়াছে। উৎসাহের সহিত দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মিলনে এবং এ সভার প্রায় প্রতি অধিবেশনে যোগদানপূর্ব্বক তিনি এ সভার প্রতি তাঁহার বিশিষ্ট অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার কার্য্যকাল দীর্ঘ হইলে সভার কত অভাব দূর হইত। সভার প্রতি ঐরূপ অনুরাগী রাজপুরুষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার নিমিত্তই অদ্য দিবসীয় বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছে। সভার সহিত তাঁহার সংশ্রব অত্যল্প কাল মধ্যেই যাইতেছে বলিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন যে, উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয়ের সহিত এ সভার সংশ্রব যাইতেছে। কিরণচন্দ্র চিরসাহিত্যানুরাগী সাহিত্যের সহিত, সাহিত্য-সভার সহিত তাঁহার সংশ্রব কখনই যাইবার নহে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর মোক্ষমুলারের নিকট পরীক্ষার ফল জানিতে গিয়া তিনি এ সংবাদ জানিতে পারেন। মোক্ষ-মুলার তাঁহাকে সাদরে তাঁহার ঋগ্বেদের অনুবাদ গ্রন্থ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। এই বেদের পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিদেশীয় কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের সহিত তাঁহার পাণিনীর ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিচার হইয়াছিল। পাণিনীর দেশবাসী বলিয়া তিনি গর্ব্বসহকারে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং অধ্যাপকবরকে পরাস্ত করেন। তদ-বধি ঐ কলেজের ছাত্রেরা আহ্লাদ সহকারে তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিত। ইঁহার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া কবিগুণাকর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার রঘুবংশের অনুবাদ গ্রন্থ ইঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সংস্কৃত আর্য্যা ছন্দের উচ্চারণ করা বড়ই কঠিন। দে মহাশয় ছন্দ রক্ষা করিয়া অনর্গল তাহা পড়িতে পারেন। অচিরে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি সাহিত্য ক্ষেত্রে চিরপরিচয় লাভ করুন ইহাই আমার অনুরোধ।

প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল বি, এল মহাশয় বলিলেন যে পূর্ব্বে বিলাত-প্রত্যাগতেরা দেশের ভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। কিরণচন্দ্র দেশের ভাষা ও দেশকে

বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অধিকতর স্নেহের চক্ষে দেখিতেছেন। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি প্রায়ই বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে; কিন্তু দে মহাশয় বৈষয়িক উন্নতি সহ সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয় অত্যল্প কাল মধ্যেই পরিষদকে ঋণী করিয়াছেন! বাণীর আরাধনায় অর্থের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য দেশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন তাহা বহু ব্যয় সাপেক্ষ। দিঘা-পাতিয়ার সুযোগ্য রাজকুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করায় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। রঙ্গপুর পরিষৎ আট বৎসরের চেষ্টায় স্থায়ী ধন-ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা মাত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সভাপতি মহাশয় তিন মাসের মধ্যেই দুই হাজার টাকা ঐ ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিয়াছেন। সভার গৃহাভাবও তাঁহার চেষ্টাতেই দূর হইল। সম্রাট এড্ওয়ার্ডের স্মৃতি তহবিলের অর্থব্যয় সম্বন্ধে নানা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু দে মহাশয় নিজে সাহিত্যানুরাগী বলিয়া বাণী মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যেই তাহা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বাণী মন্দির তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবে এবং জ্ঞান পথের পথিক মাত্রেরই সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তাঁহার সাহিত্য-সেবা সম্বন্ধে পূর্ব্ববক্তা যে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন অচিরে তিনি তাহা রক্ষা করিবেন, আমরাও ইহাই আশা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল মহাশয় প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—যশোলিপ্সা মানুষের একটি প্রধান দৌর্ব্বল্য। কিন্তু কবি গাহিয়াছেন যে এই দৌর্ব্বল্য সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা যেন মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহার স্মৃতির শেষ না হয়। বহু কর্ম্মনিরত বেতনভোগী উচ্চ রাজপুরুষের কীর্ত্তিরক্ষার অবসর আছে কিনা সন্দেহ। কিরণচন্দ্র প্রতিভাসম্পন্ন ও কার্য্যকুশল। তাই গুরু রাজকার্য্যের পরেও বিভাগান্তরে তাঁহার কার্য্যকালের দুই বৎসর মধ্যে এত কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আপাত মনোরম কার্য্যেই অর্থের বিনিয়োগ অধিক দেখা যায়। সম্রাট এড্ওয়ার্ডের স্মৃতি-তহবিলের অর্থ এবম্বিধরূপে ব্যয় করার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে অনুরোধ উপরোধের ক্রুটী হয় নাই; কিন্তু তিনি তাঁহার বিশিষ্ট অনুরাগের বিষয় সাহিত্যের সেবাতেই তাহার বিনিয়োগ করিয়াছেন। রঙ্গপুর সারস্বত-ভবন প্রতিষ্ঠা আকাশ কুসুমবৎ অসম্ভব হইয়াছিল। পূর্ব্বে একবার এই ভবন প্রতিষ্ঠাকল্পে বিরাট সভায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা ও বহুল আয়োজন করা হইয়াছিল। মহিমা-রঞ্জন সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন সমস্তই বিফল হওয়ায় সাহিত্যিকবৃন্দ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিরণচন্দ্রের উদ্যোগে আজ সারস্বত ভবন সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া সাহিত্যিকগণের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে। এতদ্দ্বারা উত্তরবঙ্গ পরিষদের বহুযত্ন সংগৃহীত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির রক্ষার ব্যবস্থা হইল। তাঁহার প্রচ্ছন্ন প্রতিভার পরিচয় আমরা পূজনীয় পণ্ডিতরাজ মহাশয়ের মুখেই অবগত হইলাম। এই প্রতিভা সর্ব্বতো-

মুখী। ভারতীয় নাটক ও নাট্যকলার ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে দে মহাশয়ের সংযোজন দেখিয়া বুঝিলাম ঐ বিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে। তিনি সহসা আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া যাইতেছেন ইহা নির্ম্মম বলিয়া বোধ হইলেও গুরুতর কর্ত্তব্যের আহ্বান উপেক্ষনীয় নহে ইহাই আমাদিগের সান্ত্বনা।

ডাক্তার মহম্মদ মোজাম্মল বলিলেন ইঁহার ন্যায় বহু গুণশালী ব্যক্তির বিষয় বলিয়া শেষ করা যায় না। ইঁহার অভাব আমরা প্রতিকার্য্যেই অনুভব করিব।

এই সভার ছাত্র সদস্য শ্রীমান ফণিভূষণ মজুমদার শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের বিদায় প্রসঙ্গে বলিলেন—উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ যুগান্তর সাধন করিয়াছে। ইহার মূলে সম্পাদক মহাশয়ের ঐকান্তিকতা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। এই সভার সভাপতির পদে দে মহাশয়ের পূর্ব্বে কোনও উচ্চ রাজপুরুষ প্রতিষ্ঠিত হন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সত্বরেই তাঁহাকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইতেছে।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় বলিলেন, দে মহাশয় এই সভার সভাপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইনি যেখানে থাকুন না কেন, ইঁহার কিরণ সভার উপরে পতিত হইবেই হইবে। দূরত্ব-নিবন্ধন সূর্য্যের কিরণ হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু চন্দ্রের কিরণ সমভাবেই সকল স্থানে পতিত হইতে দেখা যায়। ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়া কেবল বঙ্গে নহে, ইনি সর্ব্বত্র প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাইবেন এবং তাহাই আমাদিগের পক্ষে অধিকতর গৌরবের বিষয় হইবে।

শ্রীযুত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—বক্তৃতা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দ্বারা অধিক পরিমাণে লোকশিক্ষা হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পদাঙ্ক সকলেই অনুসরণ করিয়া থাকেন। দে মহাশয়ের মহদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা জেলার অনেকেরই উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তাগণের বিবিধ মন্তব্যের উত্তরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয় বলিলেন আমার কার্য্যের দ্বারা আপনারা যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন ইহাই আমার পরম আনন্দের বিষয়। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের নাম দূর হইতে শুনিয়াছিলাম এবং পূজনীয় পণ্ডিতরাজের ন্যায় সভাপতি যে সভার নেতা, তাহার গৌরব দূর হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। রঙ্গপুরে আসিয়া ক্রমে সভার উদ্যমশীল সম্পাদক সুরেন্দ্র বাবুর সহিত পরিচয়ের পরে সভার আভ্যন্তরিক বিষয় অবগত হইয়াছি। পণ্ডিতরাজ মহাশয় কিয়ৎকালাবধি দূরে অবস্থিতি করায় সভার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন নাই। সভার অর্থাভাবের কথাও আমার শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল। এই কারণে সভার সভাপতিত্ব গ্রহণে আমি আগ্রহ প্রকাশ করি। রঙ্গপুরে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অভাব নাই। চেষ্টা করিলে অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন নহে। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে সভার জন্য যাহা করিয়াছি, তাহা আমার আশানুরূপ নহে। শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন রায়চৌধুরী মহাশয় এক জন বদান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। চাহিবামাত্র তিনি দুই সহস্র টাকা সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছেন। সম্রাটের স্মৃতি-ভবনে ক্রীড়ার

স্থান নির্দ্দেশ করিবার প্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধে পূজনীয় পণ্ডিতরাজ মহাশয় ও সুরেন্দ্র বাবু আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের এই সঙ্গত অনুরোধ আমি নানা বাধা সত্ত্বেও রক্ষা করিয়াছি। ঐ গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ হওয়া দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। আশা করি সত্বরেই আপনারা উহাতে পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন। আপনাদিগের পরিষৎ আপনাদিগের হস্তেই রহিল; ইহার অশেষ উন্নতি সাধনের নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন করুন, মূল পরিষৎ অপেক্ষা ইহা যেন কোন অংশে হীন না হয়। রঙ্গপুরে উৎসাহী লোকের অভাব নাই। আমি যখন যাঁহার উপর যে কার্য্যভার দিয়াছি তিনি সানন্দে উহা সম্পন্ন করিয়াছেন। তজ্জন্যই কিছু করিয়া যাইতে সক্ষম হইলাম।

আমার প্রতি এই সমাদর এবং সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৮।৹ টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত
সভাপতি

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২১শে অগ্রহায়ণ ১৩২০, ৭ই ডিসেম্বর ১৯১৩

রবিবার

সময়-অপরাহ্ণ ৫॥৹টা

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ, আই, সি, এস্, সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল।
" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ।
" অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এ।
" বিপিনচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার।
" চন্দ্রমোহন ঘোষ।
" সিদ্ধেশ্বর সাহা।
" সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল।
" যাদবচন্দ্র দাস।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত।
যদুনাথ মিত্র।
অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহ-সম্পাদক।
আশুতোষ মিত্র এম, এ, বি, এল।
শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।
দীননাথ বাগ্‌ছী বি, এল।
মদনগোপাল নিয়োগী সহ-সম্পাদক।
যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল।
বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল।
আশুতোষ মজুমদার বি, এল।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
„ এককড়ি স্মৃতিতীর্থ।
„ সৈয়দ আবুল ফতাহ।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল বাহাদুর।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক
ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। ৪। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তিতে আনন্দপ্রকাশ। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের "ইংরাজ রাজত্ব"। ৬। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র দাস মহাশয়ের সংগৃহীত ১১২৬ ও ১১৬২ বঙ্গাব্দের লিখিত দুই খানি প্রাচীন পুথি। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ আই, সি, এস্ মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

সদস্য	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ আই, সি, এস।	মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন	শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
„ আশুতোষ মিত্র বি, এল	„ কিরণচন্দ্র দে	„ অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ প্রিয়নাথ ভৌমিক আইস ঢাল কাছারী সৈয়দপুর, রঙ্গপুর	„ অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ নীলাম্বর সরকার তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর	„ যাদবচন্দ্র দাস	বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম এ বি, এল
„ সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এল	„ যাদবচন্দ্র দাস	দীননাথ বাগ্‌চী বি, এল

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করা গেল—

গ্রন্থের নাম	উপহার-দাতার নাম
জেঠা মহাশয়, আনন্দময়ী	শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র
প্রবাহ	„ দীননাথ বাগ্‌ছী বি, এল

ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্নলিখিত প্রাচীন পুথি সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল—

১১২৬ ও ১১৬২ সালের লিখিত দুই খানি প্রাচীন পুথি	শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র দাস।

উক্ত পুথি দুই খানি সংগ্রাহক স্বয়ং আসিয়া প্রদর্শন করিলেন।

৪। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুইডেন-একাডেমী হইতে প্রদত্ত জগদ্বিখ্যাত নোবেল-পুরস্কার (১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মূল্যের) প্রাপ্তিতে এ সভার পক্ষ হইতে আনন্দ-প্রকাশক প্রস্তাব উপস্থাপন প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় স্বরচিত নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠ করিলেন।

স্বর্গদ্বারমনর্গলং প্রকটয়ন্ উদ্‌ঘাটয়ন্ সংবিশন্
স্ফূর্জ্জৎ পাশুপতোদ্ধত দ্যুতিশতৈ র্বিস্মাপয়ন্ নাকিনঃ।
আদায়ার্ঘ্যমনর্ঘ্য চারুচরিত স্তৈ স্তৈ সুরৈরর্পিতং
প্রত্যাবৃত্য পুরঃসরঃ স পুরুষঃ পার্থোঽপর পূজ্যতাম্॥

শ্লোক পাঠান্তে বলিলেন যে, পুরাকালে পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম মহাবীর অর্জ্জুন উত্তরগামী হইয়া ভগবান পশুপতির নিকটে পাশুপত-অস্ত্র লাভ করেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক স্বর্গে আহুত হইয়া তৎসহ অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিবার অধিকারসহ ধন-রত্ন ও বিবিধ অস্ত্র প্রাপ্ত হন। স্বর্গ হইতে দ্বৈতবনে প্রত্যাগমন কালে দেববৃন্দ পুষ্প-বৃষ্টি করিয়া তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আজ আবার ভারতের দ্বিতীয় অর্জ্জুন শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তদ্বীপবাসীর প্রতিভা দ্বারা দৃঢ় অর্গলাবদ্ধ কবিত্বের দ্বার স্পর্শমাত্র উন্মুক্ত করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ ভগবানকে আকুলভাবে সন্ধান করিয়া ইয়ত্তা করিতে অক্ষম হওয়ায় যেন হতাশের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই হতাশ ভাবের পরিবর্ত্তে আনন্দময়ের সংস্পর্শে যথেষ্ট আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার কবিতায় সম্ভোগের ভাবই সুব্যক্ত। অর্জ্জুন পাশুপতের প্রভাবে দেববৃন্দকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। আর আমাদের এই কৃষ্ণকায় কবি কবিত্ব-প্রভাবে শ্বেতাঙ্গ-কবিগণের বিস্ময়োৎপাদন পূর্ব্বক বরণমাল্য বিভূষিত হইয়াছেন। ইহাতে স্বপরিবারস্থ পিতা, ভ্রাতা, বন্ধুর ন্যায় আমাদের সকলেরই গর্ব্বিত হওয়া কর্ত্তব্য। যে প্রদেশে মানসসরোবর অবস্থিত, তথায় হংসের আবাসস্থল; কিন্তু কোকিলের অভাব। কোকিল বঙ্গদেশের আম্রকাননেই মধুর কূজনে দিক মুখরিত করিয়া থাকে। কোনও ক্রমে মানসরোবরের গর্ব্বিত হংসসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার স্বভাবমধুর কণ্ঠস্বর শুনাইল। আর অমনি হংসগণ মুগ্ধ হইয়া চঞ্চুপুটে তাহাকে মৃণাল উপঢৌকন প্রদান করিল। ইংলণ্ডের মহাকবি বলিয়াছেন,—রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ পাঠ করিয়াই তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। না জানি ইঁহার মাতৃভাষায় রচিত মূল কবিতা আরও কত মধুর! প্রাচীন বৈষ্ণবকবিগণ সর্ব্বপ্রথম সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের ভাব তাঁহাদিগের কবিতায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কোনও দেশের কবিগণ কর্ত্তৃক সে ভাব এ পর্য্যন্ত অনুসৃত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবের অংশমাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জগৎপূজ্য হইয়াছেন, দেখিয়া স্বর্গ হইতে তাঁহারা কতই সুখানুভব করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল মহাশয় জগদ্বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার-দাতার নিম্নলিখিতরূপ পরিচয় প্রদান করিলেন ;—

আলফ্রেড্ নোবেল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টকহলম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্যিক নহেন একজন ব্যবসায়ীমাত্র। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মারণযন্ত্র 'ডিনামাইট্' এবং প্রাণদণ্ড-কালীন ব্যবহৃত "গিলেটাইন" নামক যন্ত্র ইঁহার আবিষ্কৃত। 'বাকু'তে তৈলের খনি আবিষ্কার করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। জগতে জ্ঞানবিস্তারের নিমিত্ত ইঁহার উপার্জ্জিত সেই অর্থ রাশির আয় হইতে পাঁচটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া যান। বিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন, সাহিত্য এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত গরীয়ান গ্রন্থরচয়িতা এই পুরস্কারের অধিকারী। সুইডেন দেশের সুইডিস্ একাডেমী নামক সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য-সভা হইতে এই পুরস্কার বর্ষে বর্ষে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের রাজকবি রুড্ইয়ার্ড কিপ্লিং সাহিত্য-বিভাগের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের সহিত তাঁহার গ্রন্থের তুলনায় সমালোচনা করিলে স্বর্গ ও মর্ত্তের ন্যায় প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের যে "গীতাঞ্জলি" গ্রন্থের অনুবাদ শ্রবণে ইউরোপ মুগ্ধ, তাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নহে। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বহু গ্রন্থ তাঁহার লেখনী প্রসব করিয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ এই স্থানে বক্তা সভায় অন্য দিবসীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সাহিত্য-প্রতিভার উল্লেখ করিয়া সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার "ভাঙ্গাকাচ" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—ইঁহার ন্যায় একজন সাহিত্যিকের দ্বারা সভার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, কবিবর রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইউরোপের কবিরা তাঁহাকে উচ্চাসন দিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি বড় কবি হইলেন ইহা নহে। তিনি চিরকালই দেশের শ্রেষ্ঠ কবির আসন অধিকার করিয়া আছেন। আমাদিগের পূর্ব্বেই তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা উচিত ছিল। এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমাদিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়ানগণ কত গুণগ্রাহী তাহা বুঝা যাইতেছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে শ্বেত ও কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাই, ইউরোপবাসী এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভারতের রাজপ্রতিনিধি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে কবি-সম্রাট আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। প্রকৃত মানুষ মানুষের প্রতি এরূপ না করিয়া থাকিতে পারে না। দুঃখের বিষয় এমন সময় হইয়াছিল যে, এরূপ উচ্চ চরিত্রের উপরে অরাজকতার প্রশ্রয় দানের কলঙ্কও আরোপিত হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধির কথায় কবি-বরের সেই কলঙ্ক স্খালিত হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে তাঁহার গুণগাথা উদ্গীত না হইলে সুইডেন কখনই তাঁহার গুণমুগ্ধ হইতেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা লিখিত। তাই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহার তুল্য সমাদর হইয়াছে।

ইহার পর সর্ব্বসম্মতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইল—কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জগতের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-বিষয়ক নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তিতে এ সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রস্তাবের অনুলিপি কবিবরের অবগতির নিমিত্ত তৎসমীপে প্রেরণ করা হয়।

৫। শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "ইংরেজ-রাজত্ব" পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয়ের "ভগ্নকাচ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠের পরে তাঁহার আর কোনও প্রবন্ধ পাঠের সৌভাগ্য এ পর্য্যন্ত আমাদিগের ঘটে নাই। এক খণ্ড "ভগ্নকাচেই" মাতৃভাষার অঙ্গ-শোভা শেষ না করিয়া মণিমাণিক্যাদি দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করেন ইহাই আমাদিগের অভিলাষ। এই পরিষদের প্রতি তাঁহার স্নেহাকর্ষণ থাকিলে এবং মধ্যে মধ্যে এরূপভাবে উৎসাহ দান করিলে সভা যথেষ্ট উপকৃত হইবে।

তদুত্তরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—এ সভার বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বি, এ, আই, সি, এস্ মহাশয় সংস্কৃতভাষায় বিশেষ পারদর্শী, তাঁহার নিকটে সভা যেরূপ গবেষণাপূর্ণ উপদেশ লাভ করিয়াছেন, বক্তার নিকট সেরূপ আশা করিতে পারেন না। পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিতমণ্ডলী একত্রে বসিয়া এরূপভাবে জ্ঞানের চর্চ্চা করিলে দেশ ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে। তিনি সানন্দে এ সভার সদস্য পদ গ্রহণ করিলেন। সাধ্যমত অধিবেশনাদিতে যোগদান পূর্ব্বক সভাকে সাহায্য করিতে সতত সচেষ্ট থাকিবেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রাত্রি প্রায় ৭ ঘটিকার সময়ে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীআশুতোষ মিত্র
সভাপতি।

নবমবর্ষ ষষ্ঠমাসিক অধিবেশন

রবিবার ২৭শে পৌষ (১৩২০), ১১ই জানুয়ারী ১৯১৪, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম, এ, বি, এল সভাপতি

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।
„ রাজেন্দ্রলাল সেন।
„ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।
„ মদনগোপাল নিয়োগী।
„ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।
„ কন্দর্পেশ্বর কবিরত্ন।
„ নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন।
„ লোকনাথ দত্ত।
„ যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী।
„ শরচ্চন্দ্র মজুমদার।
„ অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। ৪। পাবনার আহুত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের দিন ও সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ"। ৬। বঙ্গীয় গভর্ণর মহামান্য লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের এই সভার চিত্রশালা পরিদর্শন মন্তব্য বিজ্ঞাপন। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম, এ, বি এল সবজজ মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। এই সভায় নূতন কোনও সদস্য নির্ব্বাচিত হয় নাই।

৩। ধন্যবাদপুরঃসর নিম্নলিখিত গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

পুস্তকের নাম	উপহারদাতার নাম
ব্রহ্মচর্য্য	শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি এ
সেবা	বরিশাল সাহিত্য-পরিষৎ
বৈষ্ণবধর্ম্মের সারমর্ম্ম	শ্রীঅবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। পাবনা উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের যে দিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থির হইল যে, আগামী ১০।১১ ফাল্গুন শিবরাত্রির অবকাশে তথায় যাওয়ার পক্ষে অনেকের অসুবিধা হইতে পারে; তৎপরিবর্ত্তে আগামী দোলযাত্রার বন্ধে ঐ সম্মিলন সঙ্ঘটিত হইলে সুবিধা হইতে পারে। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে এই দিন পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইবে কি না তাহা অবগত হইয়া সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক মহাশয় দিন নির্দ্ধারণে এ সভার মত জ্ঞাপন করিবেন।

মফঃস্বল ও সদরের অনুপস্থিত এবং উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের মত, নাটোরের মাননীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের আগামী সম্মিলনের সভাপতিত্ব গ্রহণের পক্ষে অনুকূল হওয়ায় তাঁহাকে সভাপতিত্ব গ্রহণের নিমিত্ত আহ্বানপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতিকে অনুরোধ করা হয়।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহুত হইলে শ্রীযুক্তঅবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, বাল্যাবধি কৃত্তিবাসের রচিত একখানি রামায়ণের নামই শুনিয়াছি এতদতিরিক্ত অন্য রামায়ণের সংবাদ এখানেই প্রাপ্ত হইলাম। বিলাতে এক গ্রন্থের বিবিধ ব্যক্তি-রচিত সংস্করণ পাঠের দ্বারা গ্রন্থের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যায়। এক গ্রন্থকার হয়ত যে বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক মনে করেন নাই অন্য গ্রন্থকার সেই বিষয়টি বিশেষ আবশ্যকবোধে আলোচ্য মধ্যে

গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, প্রাচীন গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ দুর্লভ। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ দ্বারা কৃত্তিবাসের পরিত্যক্ত অংশের জ্ঞান লাভ হইবে।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন বহু চেষ্টা করিয়া অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আদিকাণ্ডমাত্র প্রকাশার্থ যখন শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা শ্রীযুক্ত রাজকুমার শরৎ-কুমারের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিলাম তখন এ সুবৃহৎ গ্রন্থের সম্পাদন-ভার কাহার উপর ন্যস্ত করিব তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। এই গ্রন্থের সম্পাদককে বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া গ্রন্থ-সম্পাদনে ব্রতী হইতে হইবে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই রামায়ণের আলোচনা করিতে দেখিয়া আমি ইঁহাকেই গ্রন্থ-সম্পাদনের উপযুক্ত পাত্র স্থির করি। পণ্ডিত মহাশয়কে এ বিষয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন মাত্রেই তিনি সানন্দে ইহাতে সম্মতি দান করেন। গ্রন্থের আদ্যন্ত প্রুফ তিনি দেখিয়া দিয়াছেন এবং বহু পাদটীকা সঙ্কলন করিয়া উহার দুর্ব্বোধ্য অংশগুলি পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। গভর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর তাঁহার আয় যৎসামান্যই আছে। এরূপ অবস্থাতে কোনওরূপ পারিশ্রমিকের প্রত্যাশা না করিয়া ইনি গ্রন্থ সম্পাদন দ্বারা সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সভা এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। সভার পক্ষ হইতে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনপত্র প্রেরণ করা উচিত। সর্ব্ব-সম্মতিতে সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

মহামান্য বঙ্গীয় গভর্ণর বাহাদুর রঙ্গপুর পরিদর্শন উপলক্ষে বিগত ২৯শে কার্ত্তিক এ সভার চিত্রশালার জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদির প্রদর্শনীতে শুভাগমন করেন। এই পরিদর্শন অন্তে কলিকাতা হইতে তিনি যে মন্তব্য তাঁহার সহকারী মহাশয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রেরণ করিয়াছেন তাহা সভায় পঠিত হইল। তাঁহার এই অনুকূল মন্তব্য প্রকাশের নিমিত্ত সভা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, "বিদ্যোদয়" পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের স্বর্গারোহণ সংবাদ প্রেরণ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভা হইতে শোক-প্রকাশক প্রস্তাব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, তৎসহ শাস্ত্রী মহাশয়ের অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই প্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইলে সদস্যগণ একবাক্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক-প্রকাশ করিলেন। এই জীবনী পত্রিকাধ্যক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে স্থির হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৭৷৷০টার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীচন্দ্রমোহন ঘোষ
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

রবিবার, ৩রা ফাল্গুন ১৩২০, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৪

সময় অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
" পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
" দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ
" রাজেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস
" অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" মদনগোপাল নিয়োগী
" রাসবিহারী ঘোষ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক

ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গ্রহণ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। পাবনা-সম্মিলনে যোগদানার্থ প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আর্য্যভট্টের সময় নিরূপণ। ৬। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলী-গ্রহণ। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরকে এই সভার সদস্যরূপে গ্রহণার্থ প্রস্তাব সম্পাদক মহাশয় করিলে উহা সানন্দে সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

৩। এই অধিবেশনে কোনও গ্রন্থ উপহৃত হয় নাই।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাবনা-সম্মিলনে যোগদানার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং অতঃপর যাঁহারা ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন তাঁহাদিগকে, এ সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তৎ সংবাদ অভ্যর্থনা-সমিতিকে জ্ঞাপন করা হয়।

৫। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত "আর্য্যভট্টের সময় নিরূপণ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহূত হইলে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আর্য্যভট্টের কাল-নিরূপণে বিশেষ কোনও সাহায্য হয় নাই।

ভট্ট মহাশয়ের আহ্নিকগতি আবিষ্কার সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা করা হয় নাই। লেখক অনুগ্রহ করিয়া বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করিলে অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে উহা উপাদেয় হইবে। তৎপরে তিনি আহ্নিকগতি আবিষ্কারাদি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত অবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্ব বক্তার মত সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-রচয়িতাকে ধারাবাহিকরূপে অধ্যাপক ও শাস্ত্রবেত্তাগণের জীবনী সংগ্রহের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তাঁহার এরূপ চেষ্টায় সভা বিশেষ উপকৃত হইতেছেন।

৬। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলী সম্বন্ধে আহূত মত নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আশানুরূপ হস্তগত না হওয়ায় উহার আলোচনার সুযোগ হইল না। সম্মিলনের সমবেত সাহিত্যিক মণ্ডলীকর্ত্তৃক সম্যক্ আলোচনার পরে এই নিয়মাবলী সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা হওয়া এ সভার অভিমত।

পাবনা-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির তালিকা ;—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক।
" পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক।
" আশুতোষ মিত্র সাবর্ডিনেট জজ্ রঙ্গপুর।
" অনন্তকুমার দাসগুপ্ত।
" অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ, গৌহাটী।
" মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী।
" কেদারনাথ বাগছী।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সেন সবরেজিষ্টার, রাইগঞ্জ, দিনাজপুর।
" বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল।
" পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
" বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, বি, এল।
" অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, রাজসাহী।
" কালীপদ বাগছী ও অন্যান্য ছাত্রসদস্য।

নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা সম্মিলনে যোগদান করেন নাই তাঁহাদের নাম লিখিত হইল না।

নবম বার্ষিক অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১৫ চৈত্র (১৩২০), ২৯ মার্চ্চ (১৯১৪) রবিবার।

অপরাহ্ণ ৬টা।

স্থান—নবনির্ম্মিত রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই, সি, এস্ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ সভাপতি।
„ রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল।
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।
„ খান তসলিম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি, এল।
„ ডাক্তার মহম্মদ মোজাম্মল।
„ আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই।
" ভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।
„ সৈয়দ আবুল ফতা জমিদার
„ আশুতোষ মিত্র এম, এ, বি, এল সবর্ডিনেট জজ।
„ পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ।
„ এককড়ি স্মৃতিতীর্থ।
ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
মথুরানাথ দে মোক্তার।
ভুবনমোহন সেন।
যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল।
দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন।
কালীকান্ত বিশ্বাস।
শরচ্চন্দ্র বসু।
রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত গ্রন্থাধ্যক্ষ।
জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ।
পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক।
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও ।

আলোচ্য বিষয়।

১। কাশীধামস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই সভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের "কবিসম্রাট" উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ। ২। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-গ্রহণ। ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৪। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৫। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন বিদ্যানিধি মহাশয়ের "প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য বা মণিভূমিকা কর্ম্ম"; (খ) শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের "পদ্মাপুরাণের কবি নারায়ণ দেবের "বংশতত্ত্ব" (গ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত মহাশয়ের "অবগুণ্ঠনের ইতিহাস"। ৬। প্রদর্শন-শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়কর্ত্তৃক উপহৃত হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি "কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী।"

৭। আগামী নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিন নির্দ্ধারণ এবং রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা-গৃহ-প্রবেশের ব্যবস্থা। ৮। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ মহাশয়ের প্রস্তাবে, সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই সি, এস মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। এ সভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের ৺কাশীধামস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকর্ত্তৃক "কবিসম্রাট" উপাধি প্রাপ্তিতে এ সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন—সভাপতি মহাশয় স্বয়ং এই প্রস্তাব উত্থাপিত করায় সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

২। গত অধিবেশনে কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীঅন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	শ্রীযুক্ত সীতানাথ অধিকারী বি,এল পাবনা।
„ যাদবচন্দ্র দাস	ঐ	মুনসী আইন উল্লা, তুষভাণ্ডার রঙ্গপুর।

৪। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

গ্রন্থের নাম	উপহার দাতার নাম।
জলসরবরাহের কারখানা কঠোপনিষৎ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সমসাময়িক ভারত ৩য় খণ্ড ইংরাজের কথা ১ম খণ্ড	অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ।

৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার "অবগুণ্ঠনের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সময়াভাবে অন্য দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হইল না। আগামীতে উহা পঠিত ও আলোচিত হইবে স্থির হইল।

৬। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়কর্ত্তৃক উপহৃত "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" ধন্যবাদ পুরঃসর প্রদর্শিত ও গৃহীত হইল।

এই সভার অন্যতম ছাত্র সদস্য শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীমান্ পুলিনবিহারী সেন চিত্রশালার জন্য উপকরণ সংগ্রহার্থ দিনাজপুর অঞ্চলে গমন করেন। তাঁহারা দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ কান্তনগরের মন্দিরাদি পরিদর্শনপূর্ব্বক ঐ মন্দির হইতে স্খলিত কয়েকখানি কারু-কার্য্যবিশিষ্ট ভগ্ন ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া সভার চিত্রশালায় উপহার প্রদান করেন। ধন্যবাদ

পুরঃসর তাঁহাদিগের প্রদত্ত এই উপহার সভার চিত্রশালায় সাদরে গৃহীত হইল। তথা হইতে ছাত্র সদস্যদ্বয় সৈয়দপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বেলপুকুর হাজারি গ্রামে গমন পূর্ব্বক অনেকগুলি ঐতিহাসিক উপকরণের সংবাদ সংগ্রহ করেন। ছাত্র-সদস্যগণের এরূপ উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ইহারা প্রথম অনুসন্ধানের ফলে যদিও বিশেষ কিছু উপকরণ সংগ্রহে সমর্থ হয় নাই, তথাপি আশা করা যায় অধ্যবসায় সহকারে অবকাশকালে এইরূপ অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত হইলে চিত্রশালার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে।

৭। শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী,
„ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর,
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই,
„ ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ,

ইঁহাদিগের অন্যতমকে এই সভার নবম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের সভাপতিত্বে আগামী ২৫ হইতে ৩০ বৈশাখ মধ্যে নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয়ের সুবিধা বুঝিয়া সভার নবম বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করা হয়।

৮। বিগত ২৯শে কার্ত্তিক গভর্ণর বাহাদুরের রঙ্গপুর পরিদর্শন উপলক্ষে এই সভার পক্ষ হইতে পুথির আকারে রৌপ্য পত্রোপরি খোদিত যে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয় তাহার ব্যয় বাবদ ১৫০৲ টাকা শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বহন করায় সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় স্বয়ং উত্থাপন করিলে তাহা সর্ব্ব-সম্মতিতে গৃহীত হইল।

সভার কার্য্য এতদূর অগ্রসর হইলে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন তর্ককণ্ঠ মহাশয়ের উপর সভাপতিত্বের ভার অর্পণ পূর্ব্বক গমন করেন। পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি কর্ত্তৃক মতামত আহূত হইলে শ্রীযুক্ত মৌলভী তসলিম উদ্দীন আহাম্মদ খাঁন বাহাদুর বি, এল মহাশয় বলিলেন, কোনও হিন্দু বা মোসলমান অবগুণ্ঠনের বিরুদ্ধবাদী হইতে পারেন না। পুরুষেরা বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগকে অবগুণ্ঠনবতী করেন নাই, স্ত্রীজাতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়াছেন। অবগুণ্ঠন প্রথা কখনই আধুনিক নহে। বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও চিত্রাদিতে অবগুণ্ঠনের নিদর্শন বিদ্যমান আছে। পয়গম্বরের সময়ে আরব দেশে অবগুণ্ঠনের প্রচলন ছিল না। ভাল মন্দ সকল প্রকারের স্ত্রীলোকই বেশভূষা করিয়া রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেন। ইহাতে বহু কুফল ঘটায় পয়গম্বর আদেশ করিয়াছিলেন যে, সচ্চরিত্রা স্ত্রী মাত্রেই অবগুণ্ঠনের দ্বারা পরিচিতা হইবেন। ভারতবর্ষেও কিয়দ্দিবস অবগুণ্ঠন-প্রথা নিন্দনীয় হইত। মুসলমানগণের অত্যাচারে ভারতে অবগুণ্ঠনের সৃষ্টি হইয়াছিল—এ উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা মুসলমানগণ তাঁহাদিগের সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোকই আনিয়াছিলেন। লেখক মুসলমানদিগের এই কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টা করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র

হইয়াছেন। মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্বে ভারতে অবগুণ্ঠন প্রথা বর্ত্তমান ছিল, তাঁহার এ উক্তি যথার্থ বলিয়াই মনে হয়।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার বি,এল মহাশয় বলিলেন—ভারতের সর্ব্বত্র অবগুণ্ঠন প্রথা প্রচলিত নাই। মুম্বই প্রভৃতি দেশে স্ত্রীলোকগণ অবগুণ্ঠনবতী নহেন। প্রবন্ধলেখক তদুত্তরে বলিলেন যে, দাক্ষিণাত্য আর্য্যাবর্ত্ত নহে। বেদে আর্য্যাবর্ত্তের কথাই লেখা হইয়াছে। আর্য্য-সভ্যতা-বিবর্জ্জিত দাক্ষিণাত্যে অবগুণ্ঠন প্রথা না থাকা বিচিত্র নহে। স্বর্গীয় কালী-প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় অবগুণ্ঠনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তাঁহার এরূপ মত সমর্থন যোগ্য নহে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বেদে অবগুণ্ঠন বলিয়া কোনও কথা নাই। 'আবরণের' উল্লেখ আছে; ইহা অবগুণ্ঠন নাও হইতে পারে। রঘুবংশ পাঠে অবগত হই যে, তৎকালে অবগুণ্ঠন-প্রথা ছিল না। কেননা দীলিপ-পত্নী সুদক্ষিণা বশিষ্ঠ-আশ্রম গমন কালে রথ হইতে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কবরিতে মাত্র রথচক্রোত্থিত ধূলি লাগে নাই। বদনমণ্ডল ধূলি-ধূসরিত হইয়াছিল। রামায়ণের দুই স্থানে দেখিতে পাই অপরিচিত লোকের আগমন হেতু লক্ষ্মণ সীতাকে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করেন। সীতার এরূপ স্থলে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া প্রস্থানের কোনই উল্লেখ নাই। নারী সমাজে অবগুণ্ঠন লজ্জাপ্রসূত বলিয়াই আমার বোধ হয়। কিন্তু কোন্ সময় হইতে এই অবগুণ্ঠনের অবতারণা তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এ বিষয় আরও অধিক আলোচনা হওয়া আবশ্যক মনে করি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি